দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র

সুভাষ মিস্ত্রী

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০০০

প্রকাশক
স্বপ্না মিস্ত্রী
তেঁতুলবেড়িয়া, গড়িয়া
কলকাতা ৭০০ ০৮৪

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

বর্ণবিন্যাস
ওয়ার্ড ওয়ার্কস
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মা – কে

লেখকের অন্য বই :
লোকসংগীত ও গণসংযোগ

ভূমিকা

বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিবলয়েই মানুষের মনে মন্ত্র এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে এক ধরনের ভয়মেশানো বিশ্বাস স্মরণাতীত কাল থেকে সঞ্চিত হয়ে আছে। আদিম জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে মন্ত্র ব্যাপারটি ওতঃপ্রোতভাবে যেহেতু জড়িত, তাই প্রকৃতপক্ষে মন্ত্র যখন ধর্মাচারের অঙ্গ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়, তখনও সেই জাদুপ্রত্যয়ের অনুষঙ্গটা সেখানে অনুপস্থিত থাকে না।

অথচ, বিজ্ঞানের বিচারে মন্ত্র-তন্ত্রের কোনও ভিত্তিই যে স্বীকার্য নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু, মন্ত্রের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহুজনীন একটা ধারণা সর্বত্রই দেখা যায় এবং তার (কল্পিত) ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের অন্ধবিশ্বাসও অফুরন্ত! এজন্য সমাজবিজ্ঞানের চর্চা-চর্যা যাঁরা করেন, তাঁরাও মন্ত্রের অলৌকিক-বলে-প্রচারিত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবিশ্বাসী যদি হনও, তবু সমাজে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না কেউই।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক ড. সুভাষ মিস্ত্রী দক্ষিণবঙ্গের বিশেষত সুন্দরবন এলাকায় মন্ত্রযানের অভিঘাত মানুষের মনে কতটা এবং কীভাবে সেটা গড়ে উঠেছে, এই নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেছেন। নিজে দক্ষিণবঙ্গের সন্তান হবার ফলে এ নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের কাছে অন্বিষ্টভাবে তথ্যসন্ধান করাটা তাঁর পক্ষে সহজগম্য হয়েছে। সেই সমস্ত সংকলিত তথ্যকে তিনি লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের আলোতে বিচার-বিশ্লেষণ করে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমাজ-মনস্তত্ত্বকে বোঝবার ব্যাপারে যাদের গুরুত্ব বড় কম নয়।

সুভাষ যেহেতু লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও গবেষক, তাই তাঁর বিচারপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। দক্ষিণবঙ্গের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবহিত তাঁদের 'ঘরের লোক' হবার সূত্রে। মন্ত্র নিয়ে সেখানে যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করেন এবং মন্ত্র ইত্যাদি যাঁদের জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে—দুই পক্ষই তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ফলে, সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতটি খুঁটিয়ে জানা এবং বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর একটি বাড়তি সুবিধা তো আছেই।

সুভাষের এই বইয়ের পাঠকরাও সেই সুবিধার অংশীদার হতে পারবেন অবশ্যই। লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের তত্ত্বনির্ভর জটিল বিশ্লেষণগুলি যদি বিশেষজ্ঞ পাঠক ছাড়া অন্যদের কাছে সহজে অধিগম্য না-ও হয়, তাহলেও তাঁর মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তাঁরাও সেগুলির মর্মে পৌঁছতে অপারগ হবেন না বলেই মনে হয়।

মন্ত্রের যে-সব আভিচারিক দিক, সুন্দরবন-সংলগ্ন অঞ্চলের গুণিনরাই সেগুলির অছি — সে-সব ক্রিয়াকলাপগুলি তাঁরা অত্যন্ত গোপনেই লুকিয়ে রাখতে প্রয়াসী। সুভাষের কৃতিত্ব

এখানেই যে, অনেক ক্ষেত্রে তিনি সেই নিষেধের গণ্ডীরেখাকে ভেঙে মন্ত্র ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অভিচারের অল্পবিস্তর সংকেতকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। নিছক ডিগ্রি-শোভন গবেষণা যে এটি নয়, এর গুরুত্ব অনেকটাই বেশি যে, তা এর পড়ুয়ারা সহজেই উপলব্ধি করবেন। প্রায় দেড় দশক আগে সুভাষ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কথা যখন আমাকে বলেছিলেন, তখন আমার নিজেরই কিছুটা সংশয় ছিল যে রক্ষণশীল গুণিনদের কাছ থেকে তিনি কী এবং কতটা বার করে আনতে সমর্থ হবেন। কালে-দিনে আমার সেই দ্বিধা ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন হওয়ায় অবশ্য আমিই বোধহয় সবচেয়ে খুশি হয়েছি!

দক্ষিণবঙ্গের—বিশেষত সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের অনেক অব্যক্ত সমস্যা ও ব্যক্ত জটিলতার যথার্থ হদিশ এই বইয়ের মধ্যে মিলবে যে, এটুকু ভরসা অবশ্যই করতে পারি।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০০

পল্লব সেনগুপ্ত

মুখবন্ধ

'পশ্চিমবঙ্গ' ভারত রাষ্ট্রের একটি অনন্য-সাধারণ রাজ্য। প্রশাসনিক তথা ভৌগোলিক কারণে এই রাজ্যের উত্তরাংশ 'উত্তরবঙ্গ' এবং দক্ষিণাংশ 'দক্ষিণবঙ্গ' নামে প্রচলিত। এই দক্ষিণবঙ্গের 'জল-জঙ্গল' অধ্যুষিত অঞ্চল 'সুন্দরবন'। আমাদের আলোচনা এই 'সুন্দরবন'কেই ঘিরে।

'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'বাংলাদেশ'—দুটি পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকা সুবিশাল 'আঠারো ভাটি' অঞ্চল যা 'সুন্দরবন' নামে পরিচিত—সুপ্রাচীন কাল থেকেই দেশ ও বিদেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। 'সমতট' তথা 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' নামে পরিচিত এই এলাকা একদা সুসমৃদ্ধ জনপদে ও কোলাহল-মুখর নগরে-বন্দরে পরিপূর্ণ ছিলো—প্রাচীন রোমক ও গ্রীস ঐতিহাসিকগণ তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের বেড়াচাঁপা, চন্দ্রকেতুগড়, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল, দেউলপোতা, জটার দেউল প্রভৃতি স্থান এখনও সেই অতীত গরিমার প্রত্ন-অবশিষ্ট অঙ্গে ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নাগরিক চরিত্র আজকে আর নেই, বিশাল অরণ্যের তলায় লুকিয়ে আছে হারানো অতীতের গরিমা-মুখর স্মৃতি।

প্রখ্যাত সতীশচন্দ্র মিত্র, কালিদাস দত্ত, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সুধাংশুকুমার রায় প্রমুখ পণ্ডিত এই অঞ্চলের হারানো সভ্যতার উপর নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসও দুই বাংলাতেই কয়েকখানি রচিত হয়েছে। এমনকি এই সমূহ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও কৃষ্টি নিয়ে কয়েকটি উল্লেখনীয় গবেষণা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই গবেষণায় নিরত হবার এমন বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে যা প্রথমেই ব্যক্ত করা দরকার।

সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় যাঁরা কাঠ কাটতে বা মধু ও মাছ সংগ্রহ করতে প্রবেশ করেন তাঁদের জন্য উনচল্লিশ পয়সা প্রিমিয়ামের একটি 'লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি' চালু আছে—যা জঙ্গলে প্রবেশের আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রেশন ফি। এই রেজিস্ট্রেশনটি করা থাকলে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ-সাপ-কুমিরের হাতে মারা গেলে নিহত মৌলে-বাব্‌লের পরিবার বর্গ সরকার থেকে কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন। এই তিক্ত, তীব্র, নির্মম ব্যাপারটি তীক্ষ্ণ সামাজিক বিদ্রূপ হিসেবে বিশেষ ধরনের এক স্থানীয় জীবনবীমা রূপে উল্লিখিত। কিন্তু বহুক্ষেত্রে সামান্য এই উনচল্লিশটি পয়সা অনেক সাধারণ মানুষ বা বাব্‌লে-মৌলে জোটাতে না পেরে জঙ্গলে ঢুকে পড়েন পেটের দায়ে এবং তা গোপনে। এই অঞ্চলের অবশ্যই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁদের দারিদ্র্যের গভীরতা যে কোন্ কল্পনাতীত অতলকে স্পর্শ করে আছে—এই ঘটনাই তার প্রমাণ। কলকাতা থেকে সরাসরি ব্যবস্থা থাকলে এই অঞ্চলের মানুষ রাজধানী থেকে দুই-তিন ঘণ্টা পথ-দূরত্বে বাস করেন। কিন্তু সুন্দরবন আজও এমন দূরবর্তী এলাকা যেখান থেকে কলকাতা আসতে অর্ধদিবসও অতিবাহিত হয়। সমুদ্রের প্রতিবেশী হবার দরুণ সুন্দরবনের মাটি নোনা। শস্য-উৎপাদন ব্যবস্থা তাই চিরকাল ধরে প্রকৃতির শাসনাধীন। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকায় বর্তমান অবস্থার কিছুটা হের ফের ঘটলেও দু'দশক আগে পর্যন্ত আঞ্চলিক জোতদার-মহাজনদের শোষণ এবং পীড়নের দাপট সাধারণ মানুষের উপর বড় কম ছিল না।

সামগ্রিক এই পরিমণ্ডলের মধ্যে সুন্দরবনের মানুষদের দিন গুজরান হয়। এই রকম

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখানকার বিশেষ একটি সম্প্রদায়—যারা 'গুণিন' বলে কথিত, তাঁরা এই অঞ্চলের মানুষের জীবনকে কিভাবে যে নিয়ন্ত্রণ করেন সেটি অদ্যাবধি কোথাও আলোচিত হয়নি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের মধ্যে এই অনালোচিত দিকটি সুদীর্ঘ ক্ষেত্রগবেষণায় লব্ধ তথ্যের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে। গুণিনরা তাঁদের মন্ত্রের 'তথাকথিত' মাহাত্ম্যের জোরে এই অঞ্চলের মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সব কিছুরই শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাসম্পন্ন বলে এখানকার নিরক্ষর নিরন্ন মানুষগুলির বৃহৎ অংশই আজও মনে করেন। গুণিন এবং গুণিনের মন্ত্রের প্রভাব স্থানীয়ভাবে এত বেশি প্রকট যে এই ব্যাপারটির সঙ্গে মধ্যযুগে ইউরোপীয় ইতিহাসের 'ডাকিনী-বিদ্যা' যেরকম গুরুত্ব অর্জন করেছিল তার তুলনা করা চলে হয়তো বা, কিংবা এর সঙ্গে আফ্রিকার বিভিন্ন আরণ্যক সমাজে প্রচলিত 'কৃষ্ণবিদ্যা' তথা 'ভুডু'-র যে প্রবল প্রতাপ তা-ই তুলনীয়।

সুন্দরবনের মানুষের সামাজিক-পারিবারিক এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই সমস্ত গুণিনদের নির্দেশ বা বিধিবিধান বিশেষভাবে মান্য করা হয়। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সহ মধু-মোম সংগ্রহ, মাছ ধরা, কাঠ কাটা, জমি চাষ, ভাল ফসল হওয়া প্রভৃতি অর্থকরী কাজ-কর্ম থেকে শুরু করে গৃহস্থ-জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্র গুণিনেরা নিয়ন্ত্রণও করে থাকেন। তাই বর্তমান গবেষণায় এই সমস্ত গুণিনের ইতিহাস, তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তির মাত্রা, তাঁদের জাদুবিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ইত্যাদি যা সব সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তার মাধ্যমে এযাবৎ অনালোচিত একটি বিরাট সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাওয়া গেছে। গুণিনদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে মেলামেশা করতে হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভ লেখককে। তাঁদের অনিচ্ছুক মুঠি থেকে 'গোপন বিদ্যার' যৎসামান্য যা সঙ্কলন করা গেছে তারই ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই গবেষণার কাঠামো। সুন্দরবন অঞ্চলের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগটা সহজলভ্য হয়েছে অবশ্য এই অভিসন্দর্ভ লেখক জন্মসূত্রে ঐ এলাকার সন্তান হওয়ায়। নিজের আশৈশব বাহিত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা এবং লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের পাঠ নির্দেশ—এই ত্রয়ী সঙ্কলিত-সম্পদের জোরে বর্তমান গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়েছিল। আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে অনিবার্যভাবে পুনরুক্তি হয়ে গেছে কয়েকটি স্থানে—এই ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে সুন্দরবনের মানুষের জীবনচর্যার উপর যৎসামান্য যদি আলোকপাত করতে সফল হই এই অভিসন্দর্ভে —সেটাই হবে এই দীন গবেষকের সবিশেষ প্রাপ্তি।

বর্তমানে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সুন্দরবনকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। কিন্তু এর মৌলিকত্ব দ্বিখণ্ডিত হয়নি। স্বাধীনতার খড়গ মূল সুন্দরবনকে দুই বাংলায় ভাগ করে দিলেও এর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও গুণিনী বৃত্তান্তের সমসাদৃশ্য থাকায় এ-পার বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলের বিদ্যা-ব্যবস্থাকেই পাথেয় করেছি।

মূল পাণ্ডুলিপিটি টাইপ করা অবস্থায় ছিল সাড়ে পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার। নানা কারণে অতবড় পুস্তক প্রকাশ সম্ভব নয় বলে ঘষামাজা করতে হয়েছে। সংগৃহীত চার সহস্রাধিক মন্ত্র গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য আলোচনার সময় বিভিন্ন অধ্যায়ে কমবেশি একশত তিরিশটি প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সংক্ষেপ-করণের তাড়নায় গোটা মন্ত্রের 'অর্থানুবাদ' বা মন্ত্রে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দের 'টীকা' গ্রন্থভুক্ত করতে পারিনি ; এমনকি

পুরোপুরি বাদ দিতে হয়েছে অনেক অধ্যায়। যেমন—'মন্ত্র প্রয়োগকারী গুণিন এবং তাঁদের আচরণবিধি', 'বাংলা সাহিত্যে মন্ত্রের ব্যবহার', 'মন্ত্র সঙ্কলন', 'লোক চিকিৎসায় মন্ত্র ও তার প্রয়োগ-প্রযুক্তি', 'মন্ত্রে যে সমস্ত শব্দাবলী বারংবার উচ্চারিত হয়' ইত্যাদি। পরবর্তী সংস্করণের সুযোগ পেলে এগুলি সংযোজিত করা যাবে। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী স্বপ্না মিস্ত্রী।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে আয়তন হ্রাসের কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে মন্ত্রের প্রচলিত বিন্যাসরীতি অর্থাৎ "আদম গুরু প্যাকমমুর কা শিষ
খোদার আজ্ঞায় নাই বিষ" —পরিবর্তে অনুসৃত হয়েছে—

"আদমগুরু প্যাকমমুর কা শিষ খোদার আজ্ঞায় নাই বিষ।"—এইভাবে

শেষ মুহূর্তের অসাবধানতায় প্রচলিত বানানের ভুল সহ অন্যান্য ত্রুটি সহৃদয় পাঠক আশা করি নিজগুণে শুধরে নেবেন।

এই গবেষণা পত্রের জন্য ১৯৮৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আমায় পিএইচ.ডি. সম্মান প্রদানে কৃতজ্ঞ করেন। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপকের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই লিখে দিয়েছেন এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'। তাঁর সঙ্গে আমার ধন্যবাদের সম্পর্ক থাকার কথা নয়, নেই। গুরুঋণ অপরিশোধ্য। প্রসঙ্গক্রমে ড. পবিত্র সরকার ও ড. সুধীরকুমার করণ মহাশয়—যাঁরা আমার গবেষণা পত্রের পরীক্ষক ছিলেন, তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। গবেষণার সূত্রে যাঁদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়েছি তাঁরা হলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত, ড. নির্মল দাশ, ড. কাননবিহারী গোস্বামী, ড. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রয়াত ড. রবীন্দ্র গুপ্ত, প্রয়াত মাননীয় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অকাদেমি অব ফোকলোরের ড. দুলাল চৌধুরী, প্রয়াত ড. দীনেন্দ্রকুমার সরকার, ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ড. সনৎকুমার মিত্র, গোসাবা আর. আর. ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক শ্রী যুক্ত সুজিত সুর, শ্রী অরবিন্দ মৃধা (মামাবাবু), শ্রী মনোরঞ্জন মণ্ডল (দাদাভাই), শ্রী হেমন্তকুমার মণ্ডল (ভাই) প্রমুখ। এঁরা ধন্যবাদের অনেক ঊর্ধ্বে। গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বে বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গ ক্রমে সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশককে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই সুন্দরবনের গুণিনদের—যাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই এই গবেষণাকে নানাভাবে পুষ্ট করে গেছেন। আর ধন্যবাদ জানাই আমার অন্য সব প্রতিবেশীদের ও সুন্দরবনের অগণিত সাধারণ মানুষদের।

পুস্তক প্রকাশের প্রথম পর্ব থেকেই আমার নানা ধরনের অপূর্ণতা ও অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন 'পুস্তক বিপণি'র অনুপদা ও তাঁর মুদ্রণ বিভাগের সহকর্মী বন্ধুগণ। যেভাবে তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন, তা শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। এঁদের কাছে ঋণী হয়ে থাকাও সুখের।

চারুচন্দ্র কলেজ
২২ লেক রোড,
কলকাতা ৭০০ ০২৯

সুভাষ মিস্ত্রী
২১.২.২০০০

সূচীপত্র

নিম্নবঙ্গের মানচিত্র

(রেনেলকৃত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হতে আঁকা)
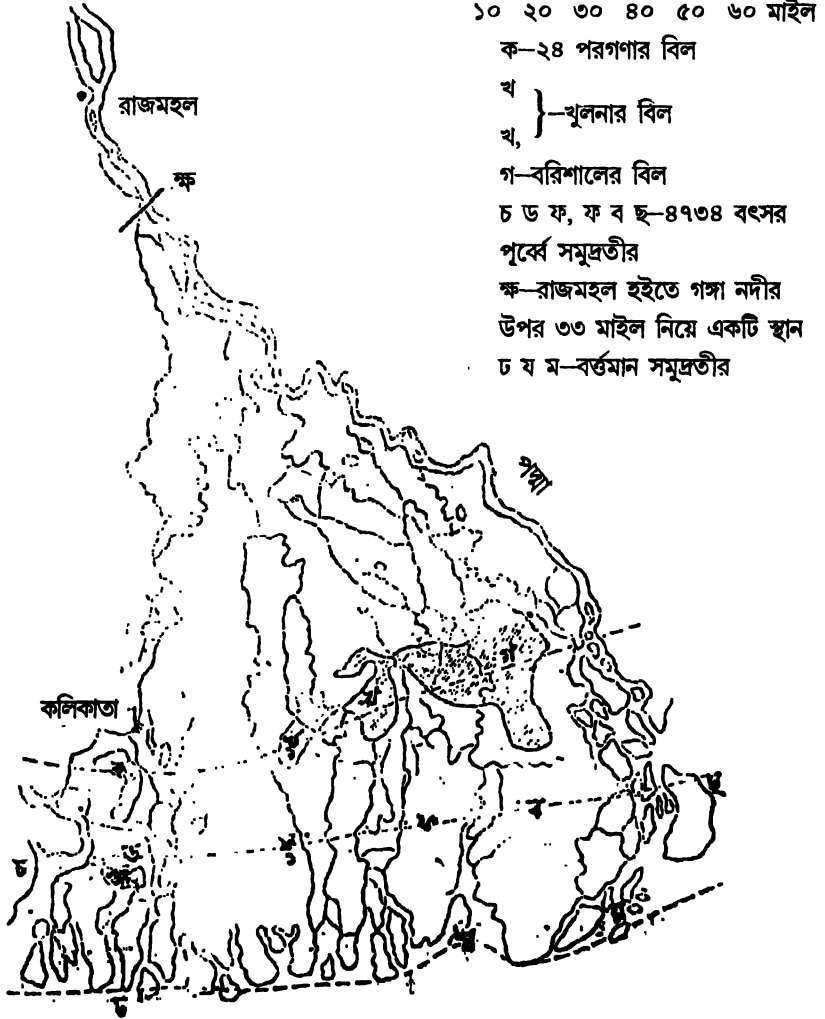
সুন্দরবন
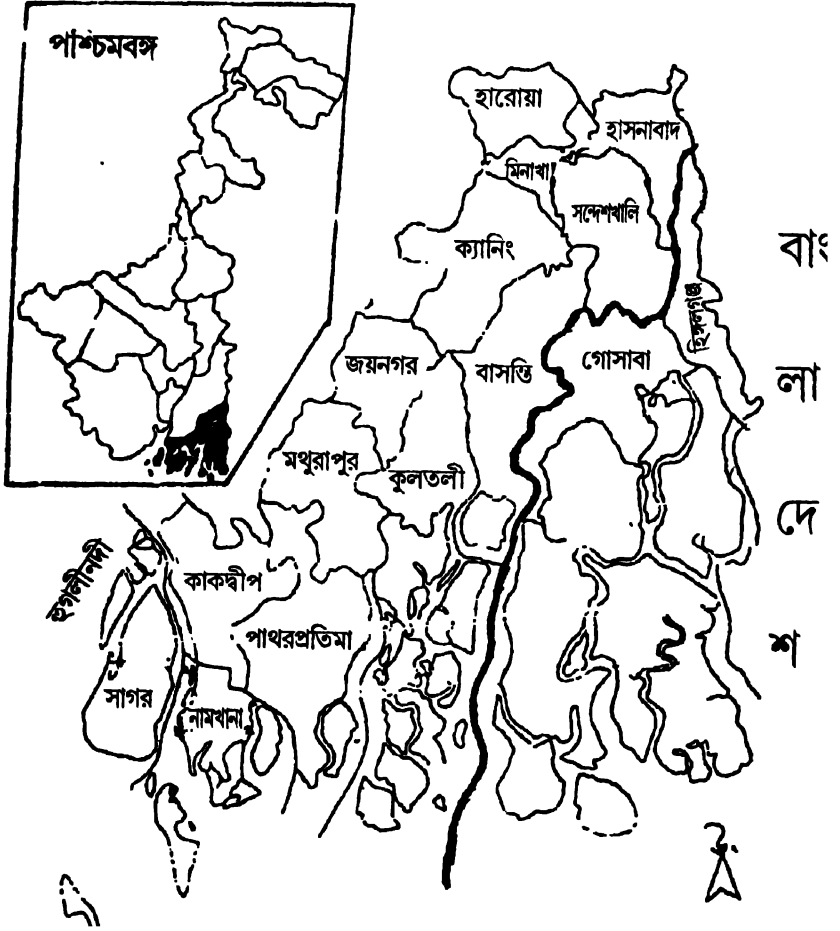
পশ্চিমবঙ্গ
হারোয়া
হাসনাবাদ
মিনাখা
সন্দেশখালি
ক্যানিং
জয়নগর
বাসন্তি
গোসাবা
মথুরাপুর
কুলতলী
হুগলীনদী
কাকদ্বীপ
পাথরপ্রতিমা
সাগর
নামখানা
বাংলাদেশ

গুণিনের মন্ত্রের খাতার পৃষ্ঠা

গুণিনের মন্ত্রের খাতার পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

১:১ সুন্দরবন অঞ্চলের ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান

পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর ব-দ্বীপ 'সুন্দরবন'। সুন্দরবন আজও তার জঙ্গল, নদী, খাঁড়ি, মানুষ, জীবজন্তু ও প্রাণীসমূহ, ভূ-প্রকৃতি সব মিলিয়ে বহুকাল ধরে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। আমাদের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি সহ কালিদাসের রঘুবংশ, মেগাস্থিনিস, দিওডোরাস, ভার্জিল, কাটিয়াস, প্লিনী, আরিয়ান, প্লুতার্ক, আলিবাস, টলেমি, ব্লালিয়াস, ল্যাগস, পেরিপ্লাস প্রমুখের কাব্য-ইতিহাস-ভূগোল-ভ্রমণকাহিনীতে এই অঞ্চলের হদিস মেলে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বঙ্গ-উপসাগরের উপকূল বাঘরগঞ্জ, যশোহর, খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগ [এই জেলা সমূহের যে অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সত্তাধীন, তারই দক্ষিণভাগ] সুন্দরবনের বিস্তৃতি। দেশবিভাগের পর আধুনিক ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশই সুন্দরবন--'পূর্বাশা' সহ ৫৫টি পলিগঠিত সৃষ্টিশীল ব-দ্বীপ দিয়ে গঠিত একশ তেষট্টি লাটে বিভক্ত--যাদের অবস্থান বাংলাদেশরাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে শুরু করে কলকাতার প্রবেশমুখ পর্যন্ত।

১৮৮০-৮৩ সাল নাগাদ জরিপের পর 'ড্যামপিয়ান হজেস লাইন' অনুসারে সুন্দরবনের উত্তরসীমা সূচিত হয়েছে ২৪ পরগণা জেলার [আয়তন ৫,২৮৫ বর্গমাইল] দক্ষিণ-পূর্বাংশ-হুগলী নদীর মোহনা থেকে যার শুরু। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে ইচ্ছামতী-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদী ও খাড়ি সমূহ। এই ভূ-খণ্ডের পরিমাণ গড়ে ৩,১৭৮ বর্গমাইল। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, কুলতলী, জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, হাড়োয়, মীনাখাঁ--এই ১৫টি থানার ১৯টি উন্নয়নশীল ব্লক। এগুলি আবার ১,০৯৩টি মৌজায় বিভক্ত।

সুন্দরবন নদী-জঙ্গল অধ্যুষিত এলাকা হবার দরুণ প্রসঙ্গক্রমে নদী-জঙ্গলের কথা এসেই যায়। ভারতবর্ষের মোট বনভূমি ২৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির হার ১৩ শতাংশ। এর সবটাই প্রায় সুন্দরবন। সুন্দরবনের 'বনভূমি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সুন্দরবনের সমস্ত ভূ-খণ্ডের দক্ষিণ পূর্বপ্রান্ত—বিয়াল্লিশ শ' বর্গ কিলোমিটার। এরই ২,৫৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের নবম এবং বৃহত্তম অভয়ারণ্য—'সুন্দবন ব্যাঘ্র প্রকল্প' বা 'সুন্দরবন অভয়ারণ্য'।

অভয়ারণ্যের উত্তরসীমায় নদী। নদীর উত্তরপাড়ে বাগনা, সজনেখালি গ্রাম এবং

সন্দেশখালি, বাসন্তী ও কুলতলী থানা এলাকার চাষের জমি। পূর্বে কালিন্দী, রায়মঙ্গল, হরিণভাঙ্গা নদী এবং আরও পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা। পশ্চিমে বিদ্যা, মাতলা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

২৫৮৫ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী বনকে দুটি অঞ্চলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ক. ওয়াইলডারনেস জোন

খ, বাফার জোন।

ওয়াইলডারনেস জোন হল ১,৩৩০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে পড়েছে মায়াদ্বীপ, ছোট হাড়দি, গোসাবা, মাতলা, গোনা, চামটা এবং বাঘমারা ব্লকের বনাঞ্চলগুলি। চামটা [১২৪ বর্গকিলোমিটার] ব্লকটি প্রিমিটিভ এরিয়া বা আদিম বনাঞ্চল রূপে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ এখানে।

বাফার জোনের পরিমাণ ১,২৫৫ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে পড়েছে নেতিধোপানী, চাঁদখালি, পাঁচমুখানী, পীরখালি, হরিণভাঙ্গা, ঝিলা এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঠুয়াজুড়ি, আড়বেশী ব্লকের বনাঞ্চলগুলি।

সুন্দরবনের চারিত্রিক অবস্থা যথাক্রমে

১. বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী চরভূমি।

২. বনাঞ্চল ও নদীবক্ষে সদা নিত্য গঠনশীল বনভূমি।

৩. বন সংস্কার করা মিঠেজলের উপযোগী উদ্ভিদ সহ নিম্নভূমির বনভূমি।

৪. নদীবাঁধ ও চড়ার বনভূমি।

৫. নোনা জলের জোয়ার ভাঁটায় নিত্য প্লাবিত বনভূমি।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুন্দরবন অববাহিকা ভূপৃষ্ঠের অবনমনে (neotectonic change) পূর্ব দিকে কাত হয়ে গেছে, এজন্য ভাগিরথী-হুগলীর স্বাদু জলপ্রবাহ কমে গেছে।

বিস্তীর্ণ এই বনভূমিতে ৬৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন সুন্দরী [যদিও সুন্দরী গাছ এখন জন্মায় না] গরাণ, পশুর, বাইন, কেওড়া, ধোন্দল, গর্জন, শাল, সোনালী, খলসী, বনঝাউ, গাব, হেঁতাল, হোগলা, গোলপাতা, তরা, ঢালচাকা, ধানীঘাস, থোড়া, চকা, গিলেলতা প্রভৃতি। মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনে কি স্থানীয় এলাকায় কি বাইরের এলাকায় এর কদর অপরিসীম। বাজারমূল্যও যথেষ্ট। এই সব গাছ নৌকা, বিম, পোস্ট, ডিঙ্গি, শ্লুয়েজ ইত্যাদি ; জ্বালানি এবং গাছের ছাল থেকে রং , ট্যানিং-এর উপাদান হিসাবে ব্যবহার হয়। এছাড়াও রয়েছে মধু-মোম, ১২০ প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি অফুরন্ত সম্পদ, আর আছে 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার', হরিণ, বন্যশূকর, বানর, সজারু, বনবিড়াল, সাপ সহ অসংখ্য হিংস্র ও নিরীহ প্রজাতীর জীবজন্তু ও ৪৫ প্রকার পাখি, জলে কুমির, কামোট, হাঙ্গর ইত্যাদি। কি শিকারি, কি মাছ-মধু-কাঠ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ সংগ্রহকারী, কি ভ্রমণ পিপাসু প্রত্যেককেই যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করেছে এই বনভূমি।[১]

জলবায়ুগত অবস্থানের দিক থেকে দেখা যায়—সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ২০ মিটার উচ্চে

অবস্থিত সুন্দরবন সমুদ্র-সান্নিধ্য এবং কর্কটক্রান্তির সামান্য দক্ষিণে থাকায় [২১°৩২--২২°৪০ উত্তর অক্ষাংশ ৮৮°০০-৮৯°০০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ] মৌসুমী বায়ুর প্রভাব আছে, এবং এই কারণে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়। জলবায়ু সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র, নোনাও বটে। মার্চ মাস থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। তখনকার তাপমাত্রা ৩৬° সেন্টিগ্রেড। জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে গড় ৮০"। শীতের তাপমাত্রা ১৪° সেন্টিগ্রেড। সমুদ্র সংস্পর্শ, বনজ এলাকা এবং মৌসুমী বায়ুর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এখানে দীর্ঘদিন গুমোট চলে। সমস্ত বনাঞ্চল এবং নদ-নদী দিনে দুবার করে জোয়ারের নোনা ও ঘোলাজলে ডুবে যায়, ভাটির টানে আবার জল নেমে যায়। ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের ভাগ থাকে বেশি।[২]

সুন্দববনের নাম 'সুন্দরবন' কবে থেকে প্রচলিত তা আমাদের ইতিহাসে লেখা নেই। তবে, সুন্দরবন নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিকদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। বিভিন্ন সময়ে বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে সুন্দরবনের অবস্থানগত ঐতিহাসিক তথ্যের স্মারকচিহ্ন খুঁজে পাওয়াও অসম্ভব নয়!

ক. আধুনিক অনুমান নির্ভর নামকরণ :

১. সুন্দরবনে সুন্দরী [Heritiera minor] নামে একপ্রকার গাছ একসময় প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। এই কাঠের রং লাল। গাছটি ভারি সুন্দর দেখতে। লাল এবং সুন্দর দেখতে বলেই এই গাছের নাম সুন্দর বা সুন্দরী বৃক্ষ। জঙ্গলে এই বৃক্ষের আধিক্য হেতু বনভাগের নাম সুন্দরীবন > সুঁদুরীবন > সোঁন্দরবন > সুন্দরবন।

২. বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস লেখক বিভারিজ সাহেব অনুমান করেন, বাখরগঞ্জ জেলার 'সুন্ধ্যানদী' বা সুগন্ধানদী হতে সুন্দরবন নাম হয়েছে। সুন্ধ্যা সুগন্ধারই অপভ্রংশ > সোঁদা নব্য ভারতীয়। পৌরাণিক বিশ্বাস যে, দেহ ছিন্ন হলে সতীর নাসিকা এখানেই নিক্ষিপ্ত হওয়ার দরুণ এই নামকরণ। সুন্ধ্যার তীরবর্তী বনভাগই সুন্ধ্যারবন > সুন্ধরবন > সুন্দরবন।

৩. বাখরগঞ্জ অঞ্চল 'চন্দ্রদ্বীপ' রাজ্যের অন্তর্গত বনভাগকে চন্দ্রদ্বীপবন বলত। অনুমান করা হয়, এই চন্দ্রদ্বীপবন থেকেই সুন্দরবন নামের উৎপত্তি হয়েছে। চন্দ্রদ্বীপবন > চান্দ্ররবন > সুন্দরবন।

৪. বাখরগঞ্জের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন থেকে জানা যায়--সুন্দরবনে একসময় 'চণ্ডভাণ্ড' নামে এক বন্য জাতি বাস করত। ঐতিহাসিকগণ চণ্ডভাণ্ড থেকে সুন্দরবনের নাম খুঁজে পেয়েছেন। চণ্ডভাণ্ড > চনবন > চুনবন > চুনরবন > সুন্দরবন।

৫. সমুদ্রের নিকটবর্তী বনরাজী সমুদ্রবন--সাধারণ মানুষ এটাই বলতেন। তবে উচ্চারণের তারতম্যে প্রকাশ পেত সুন্দরবনের পরিবর্তে সুমুন্দুরবন বা সুমুদ্রুবন। এই সুমুন্দুরবন থেকেই সুন্দরবন নামের উৎস খুঁজবার প্রয়াস পেয়েছেন অনেক ঐতিহাসিক।

৬. অসংখ্য প্রজাতির মনোরম বৃক্ষ বা সুন্দরবনভূমি [Sundry-নানা বর্ণ বা

আকারের] এবং বিচিত্র সুন্দর প্রাণীকুলের অত্যাশ্চর্য সমাহার যে বনভূমি তাহাই সুন্দরবন নামের আরেক উৎসরূপে পরিগণিত।

বাখরগঞ্জ খুলনা-যশোহর-২৪ পরগণার নিচের দিকের বিস্তৃত অরণ্য অঞ্চলের নাম নিয়ে যে ছয়টি আধুনিক অনুমান নির্ভর নামকরণের কথা উল্লিখিত হল তার মধ্যে সুন্দরী গাছ জন্মানোর প্রসঙ্গকেই বেশির ভাগ গবেষক সমর্থন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে একথাটাও কম জরুরী নয় যে, সুন্দরবনে বর্তমানে সুন্দরী গাছের সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবে কমে গেছে। কারণ নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদীগুলির সঙ্গে পূর্বে গঙ্গার শাখা-প্রশাখার সরাসরি যে সংযোগ ছিল, এখন সেই সংযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, মিষ্টি ও লবণাক্ত জলের মিশ্রিত অনুকূল পরিবেশ না গড়ে ওঠার দরুণ শুধু সুন্দরী মাত্র কেন অন্য কোনো ভালজাতের গাছও জন্মায় না।

খ. প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নামকরণ :

১. ভূ-তাত্ত্বিক বিচারে সুন্দরবনের জন্ম বেশি দিনের নয়—দুই বা তিন হাজার বছর আগে আধুনিক সুন্দরবনের বেশির ভাগই সমুদ্র গর্ভে ছিল। কিন্তু সুন্দরবনের প্রাচীন নাম সমুদ্র-সংশ্লিষ্ট ছিল না। পৌণ্ড্র দেশের দক্ষিণাংশের অরণ্য সঙ্কুল নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকা সমুহের নাম 'পাতাল' প্রদেশ' নামে কথিত। নামকরণের এই উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, গঙ্গাসাগর তীর্থের পৌরাণিক বৃত্তান্ত অর্থাৎ কপিল মুনি-সগর রাজা ও তাঁর ষাট হাজার পুত্র এবং ভগীরথের গঙ্গা আনয়নকেই সমর্থন করে। এই সময়ে এই অঞ্চলের নাম 'পাতাল প্রদেশ'. পাশাপাশি 'রসাতল', 'ম্লেচ্ছরাজ্য' প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতো।

২. হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণকাল সময় ৬২৯-৬৪৯ খৃস্টাব্দ—এর নাম ছিল 'সমতট'।

৩. নদীমাতৃক বঙ্গের ভাঁটা দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত বলে সমুদ্র কূলবর্তী দক্ষিণ-প্রদেশের নাম 'ভাটি প্রদেশ।' জোয়ারের সময় সমস্ত বনভূমি জলে ডুবে যায় এবং ভাঁটার টানে তা আবার জেগে ওঠে বলে এই নামকরণ। সপ্তদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই নামই প্রচলিত ছিল।

৪. ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুসারে জানা যায়, সেন রাজত্বের আমলে ধীবর বংশীয় সূর্য নামে ধীবর রাজা এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় সূর্যদ্বীপ। আমাদের দেশের ধীবরেরা সূর্যরাজার স্বগোত্র বলে নিজেদেরকে মনে করেন এবং এই কারণেই 'রাজবংশী' আখ্যা গ্রহণ করেছেন।

৫. মৌর্য এবং গুপ্তযুগে কুষাণযুগের পূর্ব পর্যন্ত এর নাম ছিল, গঙ্গাহৃদ, গঙ্গাহৃদি বা গঙ্গারিডি।

৬. বাংলার স্বর্ণযুগ পালযুগে এই প্রদেশের নামকরণ করা হয়, 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল'। 'ব্যাঘ্রতটির' রাজা বলবর্মা ছিলেন অতিশয় পরাক্রমশালী। ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের অপর নাম 'বকদ্বীপ'। 'বকদ্বীপ'ই ব-দ্বীপ হয়েছে। যুগ যুগ ধরে গঙ্গানদীর দ্বারা হিমালয় হতে জল-বালি বাহিত হয়ে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। বকদ্বীপই সেন রাজগণের সময় হয় 'বাগদি' বা 'বাগড়ি'। বাগদির প্রাচীনকালীন বাসিন্দারা বাগদি নামে আখ্যাত হতেন।

ব্যাঘ্রতটি শব্দ হতে বাগড়ী বা বাগদি নামের উৎপত্তি। ব্যাঘ্রতটি হলো--যে তট বা চরভূমি কিংবা প্রদেশে বাঘের অত্যাধিক উপদ্রব আছে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রতটকে এই জন্য 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' (Tiger coast) বলা হতো। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চল রাজনৈতিক ভাবে 'বাগড়ী' বা 'ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল' নামে আখ্যাত হয়েছে।

৭. মোগল যুগের প্রায় শেষপর্যায়ে এর নাম হয় 'বারভাটি বাঙ্গালা'--বারজন রাজার শাসনাধীন প্রদেশ। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গ্রন্থে বিশেষ করে 'আইন-ই-আকবরী'-তে 'ভাটি' অর্থে এই সমুদ্র-সান্নিধ্য ভাটি প্রদেশেরই বর্ণনা করেছেন।[৮]

নাম যাই থাকুক না কেন, হাজার হাজার বছর পূর্বে সুন্দরবন বর্তমান ছিল ; হয়ত পূর্বে যেখানে ছিল, এখন সেখানে নেই। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হতে গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী থেকে ভৈরব ও তারপর পদ্মায় পরিবর্তিত হলে সুন্দরবনের যে সমতট বা ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়, তা এখন অনেকটাই মরে গেছে। ভূ-তাত্ত্বিকগণ সমতটের ভূগর্ভ খনন করে নানা তথ্য আবিষ্কার করেছেন। লক্ষ্ণৌ শহরের সন্নিকটে ভূগর্ভ খনন করার সময় সুন্দরবনের বৃক্ষবিশেষ পাওয়া গেছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী প্রদেশের যে-কোনো স্থানের জলাশয় খনন করার সময় মৃত্তিকার স্তরবিভাগ প্রায় একই রকম প্রমাণিত হয়েছে। খুলনা শহরের পশ্চিম পার্শ্ব এবং কলিকাতার শিয়ালদহের নিকট খনন কার্যের ফলে মাটি, মাটির নিচের গাছের গুঁড়ির যে সমস্ত নমুনা পাওয়া গেছে তা সুন্দরবনের বলেই প্রমাণিত। সুতরাং এখনকার সুন্দরবনের সীমানার সঙ্গে এই সমস্ত সীমানা বা নিদর্শন সমূহের স্থানগত পার্থক্যের অমিল চিত্র চোখে পড়বেই। আসলে সুন্দরবনের স্থলভাগ প্রাচীনকাল থেকে নদী বা সমুদ্র কতটা গ্রাস করেছে কিংবা স্থলভাগ নদী-সমুদ্রের বুকে কতটা বিস্তারলাভ করেছে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। বরং বলা চলে—শতমুখী গঙ্গা তার সৃষ্টিশীল ভূমি গঠন করতে করতে দক্ষিণের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। সুন্দরবনও সেই অনুপাতে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান সুন্দরবনের মানচিত্রটা দেখলে মনে হবে সুন্দরবন খুব একটা বড় নয়। সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ভাঙ্গড় প্রভৃতি এলাকাগুলি এখন সুন্দরবনের বাইরের এলাকা। আজকের সুন্দরবনের মাত্র ১৫টি থানাই শুধু নয়, ২৪ পরগণা বা ২৪ পরগণার দক্ষিণ অংশই 'পৌণ্ড্রবর্ধন', 'গৌড়', 'ত্রিপুরা', 'যশোহর' প্রভৃতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং বাণিজ্য গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছিল। সুন্দরবনের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদের চিহ্ন মিলেছে প্রধানত আদি গঙ্গার তীর সংলগ্ন রাজপুর, কল্যাণপুর, ডিহিমদনমল, হোগলা, পাথরঘাটা, বারাসাত, খানিয়া, ছত্রভোগ, কাকদ্বীপ, গজামুড়ি, মগড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিতে। ঐ সমস্ত গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু যুগের মৃৎপাত্র, ধর্মীয় মূর্তি, ভগ্নাবশেষ, শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে—যার মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও একটা ধারণা করা যায়। বিপ্রদাস পিপিলাই, মুকুন্দরাম, কৃষ্ণরাম, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ কবির কাব্যেও সুন্দরবনের তৎকালীন চিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত। ১২১৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে আসে। এই সময় থেকেই বাঙালি-বণিকদের বিদেশযাত্রা এরকম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্যের

ঘাটতি পড়তে শুরু করে। তাছাড়া ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলোচ্ছ্বাস, মন্বন্তর ও মহামারী, বাঘ-কুমিরের প্রাদুর্ভাবসহ মগ-জলদস্যু ও 'হারমাদ'দের বিভীষিকারূপ আক্রমণে সমৃদ্ধ জনপদ জনহীন হতে থাকে। ক্রমে তা জঙ্গলে গ্রাস করে। তারপর মোগল, বারভুঁইয়া-প্রতাপাদিত্যের যুগ পেরিয়ে আসে ইংরেজ শাসনের যুগ। শুরু হয় সুন্দরবনের আধুনিকতম ইতিহাস।

সিরাজদৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করতে ইংরেজ কোম্পানিকে সাহায্য করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফর 'মারহাটা খাতা'র অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ড চিরদিনের জন্য নিষ্কর প্রাপ্ত হন। সেইদিনই অর্থাৎ ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর পৃথক একটি দলিলে নবাব মীরজাফর ২৪ পরগণার[৪] জমিদারি তুলে দেন লর্ড ক্লাইভের হাতে। তখন জেলার আয়তন ছিল মাত্র ৮৮২ বর্গমাইল। সুন্দরবন তখন অকর্ষিত অবস্থায় থাকায় এর একটা বিরাট অংশই এই জেলার বাইরে থাকে। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ ২৪ পরগণার জায়গীরদার হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৭৭৪ সালে তা কোম্পানির মালিকানা ভুক্ত হয়। ১৭৭০ সাল নাগাদ কলিকাতার আশপাশ অঞ্চলগুলি জঙ্গল হাসিল হতে থাকে। নেতৃত্ব দেন ২৪ পরগণার কালেক্টর জেনারেল ক্লডরাসেল। ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঠ আর নীল ও কার্পাস চাষের জন্য আবাদযোগ্য জমি এবং উপনিবেশ গড়ার মতো জায়গা। সুতরাং প্রণীত হলো পরিকল্পনা। সভ্য বুদ্ধিমান ও উন্নত মানুষের লোভ গহন আরণ্যক পরিবেশকে দ্রুত পাল্টে দেবার প্রয়াস পেতে থাকে।

১৭৮৪ সাল নাগাদ যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হিংকল সুন্দরবনের তিনটি আবাদের পত্তন করেন, তার একটি হল হিংকলগঞ্জ বা হিঙ্গলগঞ্জ। বলা চলে, এইসময় থেকেই সুন্দরবনের জঙ্গল সরিয়ে আবাদ পত্তনের কাজ শুরু। চালু হয় ইজারাদারি পদ্ধতি। চিরস্থায়ী লিজে, প্রশাসনের সক্রিয় উদ্যোগেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় অনুগত বিত্তবানদের। অরণ্যাকীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লাটে-লাটে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সব লাটের মালিক হতে সুন্দরবনে আসতে থাকেন বড় বড় জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, ব্যারিস্টার। সাথে সাথে জমির দখল ও সীমানা নিয়ে দেখা দেয় বিরোধ। ১৮২৫-৩০, ১৮৫৩ এবং ১৮৭৯ সাল নাগাদ জমি বন্দোবস্ত ব্যাপারে নতুন নতুন নিয়ম তৈরি হয়। জমি হাসিলের সঙ্গে সঙ্গে বসতি স্থাপনের কাজও পিছিয়ে থাকে না। এইভাবে ধীরে ধীরে সুন্দরবন আধুনিক রূপ নিতে থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশ শতকের গোড়ার দিকে সরকারিভাবে সুন্দরবনের বন হাসিল বন্ধ করে দেওয়া হলেও ১৯৪৭ নাগাদ ঝড়-খালি সহ কিছু এলাকায় আবাদ পত্তন হয়। আরো পরবর্তী অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে বে-সরকারি ভাবে মরিচঝাঁপি দ্বীপে বন-হাসিলের প্রয়াস নেওয়া হলে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা সে প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেন।

সুন্দরবনের জনবসতির পর্যায়ক্রম স্তর তিনটি :

ক. দ্রাবিড়, মঙ্গোল, অস্ট্রোলয়েড ও ভেডিউড [অধিকাংশ ভাষাগোষ্ঠী]

খ. নিষাদ, কিরাত ও দামিল।

গ. পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, [চণ্ডাল] সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, তপসিলী ভুক্ত হিন্দু, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান প্রভৃতি। সম্প্রদায় হিসাবে এঁরা বাগদী-বৈদ্য, ভুঁইয়া, ভুঁইমালী, চামার বা মুচি, ধোবা, হাড়ি, জেলে, কৈবর্ত্য, কাণ্ডার, কাওরা, মাহার, মাল, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্র, রাজবংশী, শুঁড়ী, তিয়র, তুরী এবং ব্রাহ্মণ, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়।[৫]

পশ্চিমবঙ্গের মোট হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ তপসিলীভুক্ত জাতি ও তপসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ের। এঁদেরকে বাংলার আদিম অধিবাসী বলা হয়ে থাকে। সুন্দরবনে এঁদেরই সংখ্যা বেশি। মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ। ১৯৮১ সালের লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী সুন্দরবনের লোকসংখ্যা ২৪, ৫১, ৮৫০ জন। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, সুন্দরবনে তপসিলীভুক্ত ৫টি এবং উপজাতিভুক্ত ৪টি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বেশি। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী তপসিলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায় হলেন :

ক. পৌণ্ড্র ৩,৬২,০৮০
খ. রাজবংশী ২৬,২১৪
গ. ব্যগ্রক্ষত্রিয় ৪২,১৪০
ঘ. কাহার ২৫,৩৪৪
ঙ. নমঃশূদ্র ৬২,৬০৩

এবং তপশীলভুক্ত উপজাতি হলেন :

ক. ভূমিজ ১০,৮১০
খ. মুণ্ডা ৩৪,১২৮
গ. ওরাঁও ১৩,৮৪৩
ঘ. সাঁওতাল ১৯,৭১৮

অবশ্য জনসংখ্যার ক্রম অনুযায়ী এঁদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

সুন্দরবনের পৌণ্ড্ররা হলেন তপসিলীভুক্ত সম্প্রদায়ের অর্ধেকের বেশি। এঁরা প্রধানত বাস করেন গোসাবা, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, মথুরাপুর, জয়নগর, কুলতলি ও ক্যানিং এলাকায়। রাজবংশীরা বাস করেন গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, সাগর, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, মীনাখাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে। ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা বাস করেন বাসন্তী, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, কাকদ্বীপ, হাড়োয়া, পাথরপ্রতিমা, সন্দেশখালি প্রভৃতি থানাগুলিতে। কাহারা প্রধানত আছেন মথুরাপুর, জয়নগর, ক্যানিং ও সন্দেশখালি থানা এলাকায়। নমঃশূদ্ররা বাস করেন প্রধানত জয়নগর, ক্যানিং, মথুরাপুর, হাড়োয়া, সন্দেশখালি প্রভৃতি থানা এলাকায়।

তপসিল উপজাতিদের মধ্যে ভূমিজরা থাকেন গোসাবা ও সন্দেশখালি থানা এলাকায়। মুণ্ডাদের বসতি প্রধানত সন্দেশখালি, গোসাবা, হাসনাবাদ ও ক্যানিং-এ। ওঁরাওরা মুখ্যত থাকেন সন্দেশখালি ও ক্যানিং থানায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত থাকেন হাড়োয়া, ক্যানিং, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, গোসাবা থানা এলাকায়।[৬] সুন্দরবনের তপসিলী জাতি এবং উপজাতিদের অবস্থানগত থানা ভিত্তিক একটি ছক দেওয়া হলো।

১ নং চিত্র

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুন্দরবনের তপসিলী জাতি ও উপজাতি ভুক্ত সম্প্রদায়ের থানা ভিত্তিক অবস্থান

থানা	গোসাবা	বাসন্তী	ক্যানিং	কুলতলি	জয়নগর	মথুরাপুর
পৌণ্ড্র	✓	✓	✓	✓	✓	✓
রাজবংশী	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ব্যগ্রক্ষত্রিয়	—	✓	✓	—	✓	✓
কাহার	✓	✓	✓	—	✓	✓
নমঃশূদ্র	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ভূমিজ	✓	✓	✓	✓	x	✓
মুণ্ডা	✓	✓	✓	✓	x	✓
ওঁরাও	✓	✓	✓	✓	—	✓
সাঁওতাল	✓	✓	✓	✓	x	x

এই ছকটির চিহ্ন '✓' সকল প্রাধান্য সূচক এবং 'x' চিহ্নগুলি ন্যূনতম অবস্থান সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

কাকদ্বীপ	নামখানা	সাগর	হাড়োয়া	পাথর প্রতিমা	মীনাখাঁ	সন্দেশ খালি	হাসনাবাদ	হিঙ্গলগঞ্জ
✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
—	—	—	✓	✓	—	✓	—	—
x	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
✓	x	x	x	x	✓	✓	—	—
✓	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
✓	x	x	—	—	x	✓	✓	x
✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

২ নং চিত্র

তপসিলীজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের থানা ভিত্তিক অবস্থান

থানা	সাগর	কাকদ্বীপ	নামখানা	মথুরাপুর	পাথব প্রতিমা	জয়নগর
১. বাগদী	✓	✓	X	✓	✓	✓
২. বৈদ্য	—	X	—	—	—	✓
৩. ভুঁইয়া	X	✓	—	✓	X	✓
৪. ভুঁইমালী	—	✓	—	—	✓	—
৫. চামার	✓	✓	X	✓	X	✓
৬. ধোবা	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৭. হাড়ি	✓	✓	✓	✓	✓	✓
৮. জেলে, কৈর্বত্য	✓	✓	✓	X	✓	✓
৯. কাণ্ডার	✓	✓	✓	X	✓	—
১০. কাওরা	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১১. কাহার	✓	X	—	✓	✓	—
১২. মাল	X	✓	—	✓	X	X
১৩. নমঃশূদ্র	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৪. পৌণ্ড্র	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৫. রাজবংশী	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১৬. শুঁড়ী	✓	✓	—	—	✓	X
১৭. তিয়র	X	✓	X	✓	✓	✓
১৮. তুরী	—	—	—	—	X	—
১৯. অন্যান্য	✓	✓	✓	✓	✓	✓

এই ছকটির চিহ্ন '✓' সকল প্রাধান্য সূচক এবং 'X' চিহ্নগুলি ন্যূনতম অবস্থান সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

কুলতলি	ক্যানিং	বাসন্তী	হাড়োয়া	মীনাখাঁ	সন্দেশখালি	গোসাবা	হাসনাবাদ	হিঙ্গলগঞ্জ
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
—	x	x	x	✓	✓	✓	x	—
✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓
—	—	✓	—	✓	✓	x	✓	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	x	✓	x	x	✓	x	—
x	x	✓	x	✓	x	x	x	✓
✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	—
—	✓	—	—	—	—	x	—	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
—	—	x	✓	—	—	✓	✓	—
✓	x	—	—	x	✓	—	x	x
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
x	—	✓	✓	x	✓	x	✓	—
✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	—
—	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

২নং চিত্রে ১৯ সংখ্যক সারণীতে 'অন্যান্য' অর্থে বোঝান হয়েছে ডোম বা ভাঙ্গড়, কোটাল, মেথর, দাই, জালো, পাটনী, বাউরী, কোচ, লোহার, ঘাসীয়ার, মালো, মহালি ইত্যাদি।

মূলত ইংরেজ আমল থেকেই সুন্দরবনে জন সমাগম ঘটতে থাকে। ওরাঁও-ভূমিজ-মুণ্ডা-সাঁওতালরা সুন্দরবনে আসেন ইংরেজ আমলেই। জঙ্গল হাসিলের কাজে এঁদেরকেই বেশি ব্যবহার করা হয়। এঁরা অধিকাংশই বিহার-রাঁচী-ছোটনাগপুরের মানুষ। বিহার-ছোটনাগপুরের পাহাড়ী অনুর্বর অঞ্চল যখন বেঁচে থাকার পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে উঠে তখনই তাঁরা সুন্দরবনে এসে আশ্রয় নেন, জঙ্গল হাসিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সমস্ত উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় এবং তপসিলীজাতি ভুক্ত সম্প্রদায় ছাড়া আর যে সমস্ত সম্প্রদায় বাইরের থেকে আসেন ও বসবাস করতে শুরু করেন, তাঁরা হলেন মেদিনীপুর-উড়িষ্যা থেকে আগত মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। এঁরা সকলেই সুন্দরবনে বসতি স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের জঙ্গল হাসিলের কাজ করে বসত গড়েছেন, বাঘ তাড়িয়েছেন, বাঁধ তুলে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন কামোট কুমির অধ্যুষিত ভয়ঙ্কর লোনা নদী সমূহ। উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মণ, আচার্য-পুরোহিত, রাজকর্মচারী এবং মুসলমান ও অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ সুন্দরবনে এসেছেন ষোড়শ শতকের দিকে—প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি খাঁ জাহান নামক একজন ধর্মপ্রচারক কপোতাক্ষের পূর্বধার দিয়ে সুন্দরবনে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়া ইংরেজ-ফরাসী-পর্তুগীজ এবং মগ-ডাচ-ওলন্দাজ প্রভৃতি হার্মাদরা তো আছেই! সম্প্রতি বাংলাদেশ রাষ্ট্র থেকে প্রত্যাগত অধিবাসী সুন্দরবনকে ভরিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন বেশি। সুন্দরবনে জনসমাগমের কারণগুলি নিম্নলিখিত সূত্রাকারে সাজানো যেতে পারে :

ক. জীবিকার তাড়নায়

খ. সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে মাছ-মধু-কাঠ-লতা-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ

গ. সস্তায় অধিক জমি সংগ্রহের আশায়

ঘ. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে

ঙ. সুন্দরবনে নদী-খাড়ি ও গভীর অরণ্যে-আত্মগোপনের মানসে

চ. শিকার ও ভ্রমণের আশায়

সুন্দরবনের গ্রাম-সমাজের কাঠামোর মধ্যে 'পঞ্চায়েতি' মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, যদিও উচ্চ-নিম্ন, কৌলিন্য-অকৌলিন্য ভেদ-নীতি ছিল। সুন্দরবনে মোগল যুগের শেষ স্বাধীন নৃপতি হিসাবে প্রতাপাদিত্যের নাম করা যেতে পারে। তাঁর সমসাময়িক কাল থেকে সুন্দরবন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রাম-সমাজের কাঠামো কেমন ছিল, তার একটি চিত্র দেওয়া হলো :

প্রশাসনিক দিক থেকে সমাজ-কাঠামোর উপরি উক্ত চিত্র দেখা গেলেও লৌকিক স্তরে আভ্যন্তরীণ সমাজ-কাঠামোর আরেকটি ব্যবস্থা অবলম্বিত হতো। বিশেষত জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এই ব্যবস্থা 'ঘর' কেন্দ্রিক। যেমন, 'রাজাঘর', 'মন্ত্রীঘর', 'কোটালঘর' ইত্যাদি। অর্থাৎ রাজাই সর্বেসর্বা। তিনি সমস্ত রকম আইন বা নীতি-নির্ধারণের মূলাধার। তাঁর নির্দেশ বা অনুমতি ব্যতীত কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। 'রাজার' যেমন বিভিন্ন শ্রেণী স্তর পরম্পরা পার্ষদ-মণ্ডলী আছেন, 'রাজাঘরের'ও তেমনি মন্ত্রীঘর, কোটালঘর, নাপিতঘর ইত্যাদি আছে। কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে শুরু করে সমাপ্ত পর্যন্ত এই স্তর পরম্পরা পালিত হয়। শৌর্য-বীর্য অর্থ কৌলিন্যে 'রাজাঘর' ন্যূনতম হলেও তাঁকে সামনে রেখে বা তাঁর আদেশ কিংবা হুকুম বা পরামর্শ নিয়েই উৎসব অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালিত হয়, এমনকি শাস্তিবিধানের রায়ও তাঁর মুখ দিয়েই উচ্চারিত হয়। এই পর্বে আধিপত্য লাভ করে 'মোড়ল' বা 'মণ্ডল' প্রথা।

লর্ড ক্লাইভের মৃত্যুর পর ১৭৭৪ সাল নাগাদ ২৪ পরগণা 'কোম্পানি' অর্থাৎ সরকারের এক্তিয়ারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনও সরকারি শাসনাধীনে আসে। আসাম, পূর্ববঙ্গ ও কলিকাতা যাবার একমাত্র পথ তখন এই সুন্দরবনেরই নদী-খাড়ি। কিন্তু সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী ও দুর্গম হওয়ায় জলদস্যুরা লুটতরাজ করত পরম সুখে। এদের উৎখাত করে উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এবং এও ভাবা হয় যে, এখানে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীদের স্থানান্তরিত করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি জরিপ ও জমাবন্দী করা হতে থাকে। এই সমস্ত জমা করা জমির মালিক স্বত্বাধিকারী হলেন 'জমিদার'। ১৭১৩ সালে '৮ রেগুলেশান এ্যাক্ট' অনুযায়ী লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ করালে জমিদারগণই ভূসম্পত্তির মূল এবং প্রথম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী রূপে বিবেচিত হলেন। সরকারের সঙ্গে চুক্তি-অনুযায়ী রাজস্ব পরিশোধ করার বিনিময়েই তাঁরা জমির ভোগ দখল পেতেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কিছু জমিদার বার্ষিক খাজনা কমিয়ে নগদ সেলামি আদায় করে অসংখ্য 'তালুকের' সৃষ্টি করেন। জমিদারের অধীনে এই তালুকের অধিপতি হলেন

'তালুকদার'। এঁরাই জমির দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী। সরকারও এই প্রথা স্বীকার করেন এবং প্রয়োজনমত নিজের সুবিধা আদায় করতেন। তালুক ছিল চার প্রকার :

ক. খারিজা।

খ. বাজেয়াপ্তী—এর অধিকারীগণকে নিজ নিজ নামে স্বতন্ত্রভাবে কালেক্টারিতে রাজস্ব দিতে হত।

গ. সামিলাৎ।

ঘ. পাট্টাই বা পত্তনি--পাট্টানির খাজনা আদায় করতেন জমিদার নিজেই।

সুন্দরবনের জমির তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী হলেন 'জোতদার', 'গাতিদার', 'হাওয়ালদার'। এঁরা তালুকদারদের মতোই সম্মান পেতেন। এঁরাই হাওলা, নিমহাওলা, ওয়াত হাওলা প্রভৃতি স্বত্ব সৃষ্টি করেন। এঁদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন যাদেরকে 'ইজারাদার' বলা হতো। এঁরা জলকর, হাটবাজার প্রভৃতি বন্দোবস্ত বা 'লিজ' নিতেন। ইজারাদারের স্বত্ব ছিল অস্থায়ী। জমিদার বা তালুকদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দোবস্ত নিয়ে সম্পত্তি ভোগদখল করতেন। 'দায়সূদী' বা 'পচানীত' ইজারা বা লিজ গ্রহণকারী মালিককে কিছু টাকা অগ্রিম অথবা ঋণ দিতেন। সুদে-আসলে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত স্বত্বভোগ করতেন। এঁরা হলেন সুন্দরবনের চতুর্থ শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী।

পরবর্তী সম্পত্তির নাম 'মৌরাসী মোকরারী' অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে স্বত্ব ভোগদখল করার অধিকার। এঁরা পঞ্চম শ্রেণীর স্বত্বাধিকারীরূপে বিবেচিত হতেন। 'লাখেরাজ' ও 'নিষ্কর সম্পত্তির' মালিকগণ হলেন ষষ্ঠ শ্রেণীর ভূমি স্বত্বাধিকারী দেবোত্তর—ব্রহ্মোত্তর--ভোগোত্তর--মহাত্রাণ--চেরানী-খানে-খোদা-পীরোত্তর প্রভৃতি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি ও এই শ্রেণীর স্বত্বাধিকারীর আওতায় আসে। এই সমস্ত সম্পত্তির জন্য 'সনদ' বা 'তাম্রশাসন' প্রদত্ত হতো। সনদ বা তাম্রশাসন হারিয়ে গেলে মালিকানা স্বত্বের অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সরকার ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের বিশেষ আইন অনুসারে লাখেরাজ সম্পত্তি পরীক্ষা করে 'তাঁয়দাদ' লিখে দিতেন। সাধারণ মানুষ এই পদ্ধতিকে 'দুয়েম কানুন' বলতেন। এই তাঁয়দাদই নিষ্কর সম্পত্তির 'প্রধান দলিল' রূপে স্বীকৃত হয়।

ধর্মীয় ও জনহিতকর কাজের জন্য আর এক শ্রেণীর স্বত্ব নির্দিষ্ট হয়। একে 'ওয়াকফ' বা 'ট্রাষ্ট' সম্পত্তি বলে। এই শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী হলেন সপ্তম শ্রেণীর। অষ্টম শ্রেণীর ভূমিস্বত্ব আধিকারীরা হলেন 'চাকরান' বা 'পাইকান'। এঁরা গৃহকর্ম সুসম্পাদনের জন্য কিংবা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চুক্তি অনুযায়ী ব্যক্তি বিশেষের জীবন কালের জন্য অথবা পুরুষানুক্রমে স্বত্ব ভোগ করার অধিকার পেতেন। চুক্তিভঙ্গ হলে জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এইভাবে দেশে জমির স্বত্বভাগের দ্বারা এক নতুন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার এইসব সামন্ত শ্রেণীর জমিদার বা তালুকদারদের মাধ্যমে কবলা-পাট্টা-কুবলিয়াত—আমলনামা-দাখিলা প্রভৃতির বুনিয়াদে খাজনা নির্দিষ্ট করে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। আমলনামা দাখিলায় জমি প্রাপ্ত অর্থে বুঝান হতো—

জমিদারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত দলিল। এই দলিলই তখনকার দিনে রেজিস্ট্রির সামিল। ১০০ বিঘা জমি হাসিল করলে জমিদার তার বিনিময়ে ৫ বিঘা জমি আমলনামা লিখে দেন এবং কিছু জমি ভাগে চাষ করার সুযোগ দেন ও বাকি জমি নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত দিতেন।[৭] এই জমি পাবার আশায় মেদিনীপুর-উড়িষ্যা-সাঁওতাল পরগণা-বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্যান্য জেলা সমূহ থেকে ভূমিহীন চাষীরা এসে ভিড় করে সুন্দরবনে। সরকারের স্বার্থ ও লোভ এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সাহসিকতা—একত্রে কুঠারের ধার হয়ে বিদ্ধ করে সুন্দরবনের অন্তস্থল। গরাণ-কেওড়া-হেঁতাল-গর্জন-বলি-গোলপাতার জঙ্গল কুড়ুলের ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। ঝিল্লি-ঝংকৃত ছায়াচ্ছন্ন প্রাচীন অরণ্য মানুষের দুর্জয় শক্তির কাছে হয় পরাজিত। জঙ্গল হাসিল জমি ঘিরে ওঠে বাঁধ। অরণ্যের অন্ধকারে এসে পড়ে আকাশের আলো। বনের ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে থেকে, বুনোঘাস. ঝোপঝাড় জঙ্গলে কাটতে কাটতে, হাতে-পায়ে হাজা ধরে যায় মানুষের। মশা-পোকা-মাকড়ের আক্রমণে শুরু হয় কলেরা—ম্যালেরিয়া—আমাশয়। সুন্দরবনের সর্বত্র এত জল—তবু পান করার মতো মিঠে জল নেই এক ফোঁটাও। সবই লবণাক্ত। কাজেই নদীর জলে তেঁতুল গুলে, সেই জল পান করতে থাকে। এর উপর নিয়ত শূলোর খোঁচা খাওয়া সহ আছে বাঘ-সাপ-ভাল্লুক-বানর ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর জলের কামোট, কুমির ইত্যাদি। এইভাবে কত যে মানুষ মরল তার হিসাব নেই। এঁরা সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করে অরণ্য নিশ্চিহ্ন করতে পারলে জমিদারদের কাছ থেকে পাবেন কিছু জমি--খাজনা দেবার বিনিময়ে, কিছু জমি পাবেন--ভাগে চাষ করাব শর্তে। কাজেই দিনরাত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে, দেশত্যাগী এবং স্থানীয় ভূমিহীন নিরন্ন মানুষেরা আরো শক্ত করে কুঠার চালাতে লাগলেন। জঙ্গল হাসিল ও নদীর বাঁধ তুলে দেবার আনুগত্য স্বরূপ সামান্য সংখ্যক মানুষ পেলেন কিছু 'পত্তনি' বা 'পাট্টা' ও কিছু ভাগের 'জমি'। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই থেকে গেলেন বঞ্চিত। এই বঞ্চিতরাই হয়ে গেলেন জমিদার-জোতদারদের বংশানুক্রমিক ক্রীতদাস। অনেক সময় আবার জমিদারি হস্তান্তরিত হলে প্রজাগণও হস্তান্তরিত হতেন, কিংবা জমিদারি বাজেয়াপ্ত হলে মূল প্রজাস্বত্ব একই আওতায় পড়ত। ফলে জঙ্গল হাসিল করা চাষীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। ১৯৫৫ থেকে জমিদারি ও মধ্যস্বত্বের সকল রকম ওজর-আপত্তি তিরোহিত হয়েছে। বর্তমানে সরকারের অধীন সকলেই সমপর্যায়ের রায়ত বা পাট্টা মূল্যের মালিক।

জমিদাররা জমির মালিক হলেও এঁদের অনেকেই জমি চিনতেন না, বা জমির সাথে কোনো সংযোগ থাকত না। তাঁদের হয়ে তাঁদেরই অনুগত কর্মচারীরা অর্থাৎ নায়েব-গোমস্তারা বন হাসিল থেকে শুরু করে ফসল ফলানো পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতেন। এঁরা পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল-আমিন, তহশিলদার, মহুরি, দাস-দাসী ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে বাস করতেন জমিদারেরই 'কাছারিবাড়ি'তে। এই কাছারি থেকেই নির্ধারিত হতো নিয়ম-কানুন, আদেশ, শাস্তি বিধান। চাষীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়ে তৈরি করলেন যে কষ্টের ফসল তা কাটার পর ওঠে কাছারি বা জোতদারদের বাড়িতে। তারপর মাড়াই-ঝাড়াই অন্তে দেখা যায় জমিদার ও ভাগ-চাষীর

ধানের ভাগের নানান রকম শর্ত। সাধারণত মোট ফসলের আধাআধি ভাগ হয়। চাষীর উক্ত ভাগ থেকেই জমিদার কেটে নেন নানান অজুহাতে নানান পাওনা। যেমন :

ক. চাষের সময় পেটে খাবার জন্য যে ধানটুকু চাষী ধার করেছিলেন, সেই ধানের দেড়াসুদ ও আসল। কারণ, বর্ষার সময় যে ধান নেওয়া হয়েছিল তা পরিশোধ করতে করতে পরবর্তী শীত মরসুমটাও অতিক্রান্ত হয়েছে।

খ. শরৎ-হেমন্তের সময় অর্থাৎ নবান্নের মুখ দেখতে পাবার পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু বেঁচে থাকার জন্য ধান ধার নিলে তার অর্ধেক সুদ ও আসল।

গ. সালা খরচা, গদী সেলামি।

ঘ. মামলা খরচা : জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হলে তার খরচ বাবদ কাটা হয়।

ঙ, রাখনি বা রক্ষিতার জন্য খরচ।

চ. বিবাহ : জমিদার বাড়িতে কারুর বিবাহ হলে তার জন্য খরচ।

ছ. জমিদার বাড়িতে কোনো ছেলেমেয়ে জন্মগ্রহণ করলে তার জন্য খরচ।

জ. ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনের বাবদ খরচা, তাদের পড়াশুনার খরচ : ভাত-খাওয়ানি।

ঝ. পুনর্বিবাহ বা ঋতু উৎসবের খরচ।

ঞ. খামার ছিলা : যে খামারে ধান ওঠে সেই খামার পরিষ্কার রাখার খরচ।

ট. খামার ঘেরা : যে খামারে ধান তোলা হয় তা ঘেরার খরচ।

ঠ. দারায়োনি।

ড. স্কুল-পাঠশালা করার খরচ।

ঢ. ঈশ্বরের বৃত্তি : জমিদার-জোতদারদের বাড়ির ঠাকুর দেবতার সেবার খরচ।

ণ. কয়ালি : যে ধান মেপে ভাগ করে দেয় তার পাওনা।

ত. শ্রাদ্ধ, জামাই-খরচা ইত্যাদি।

থ. বিভিন্ন পূজা-প্রণামী-উৎসব।

দ. চাষীর বাড়ির বিয়ে, কোনো পূর্ণকর্ম, গৃহনির্মাণ, পুকুরকাটা ইত্যাদি প্রসঙ্গের ট্যাক্স।

ধ. হিসাবান, পার্বণি।

ন. পাটানি।

প. মহুরি—তহুরি প্রভৃতি রাখার খরচ।

ফ. জমির খাজনা ও সেলামি ইত্যাদি প্রসঙ্গে 'আচওয়াব' বা 'আদায়' বিঘাপ্রতি ১ মন এবং ১ টাকা।

সুতরাং দেখা যায়, ভাগ-চাষী হয় রিক্ত, না হয় উল্টে তার কাঁধে আরোও মোটা রকমের ঋণের বোঝা চেপে গেছে। ছোট ছোট ভাগচাষীদের তো কথাই নেই—বিশেষ করে যারা ২০/৩০ বিঘা জমি চাষ করেন। যে সমস্ত চাষী একটু বেশি জমি চাষ করতেন তাদের ভাগে যৎসামান্য থাকত। তাই নিয়ে হাসিমুখে কাছারির প্রধানকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম সেরে বাড়ি ফিরতেন।

জমিদাররা ছিলেন সরকারের স্তম্ভ স্বরূপ। তাদের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক কোনোদিনই ভালো থাকার কথাও নয়। স্বায়ত্ত্ব শাসন যাই হোক, শান্তি শৃঙ্খলার নামে শোষণই ছিল

মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনও প্রজা খাজনা বা ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তার উপর যেসব অত্যাচার হতো তার স্বরূপ বিভিন্ন রকমের। আর অপরাধীদের শাস্তি মানে মৃত্যুর নামান্তর। অবশ্য কোনো কোনো জমিদার দরিদ্র প্রজার খাজনা মুকুব করে বদান্যতার পরিচয় দিতেন। তবে জমিদার ও কর্মচারীদের সর্বদা সন্তুষ্ট রাখতে হতো--দুধ-ফল, টাটকা তরকারি, মাছ, মুরগি, পাঁঠা ইত্যাদি উপহার বা 'নজরানা' দিয়ে। এমন কি জমিদার-জোতদার বা নায়েব-ম্যানেজারেরা চাষীর বাড়ি এলে তাঁর অভ্যর্থনার রীতিও ভারি অদ্ভুত রকমের। বাড়ির বুড়োবুড়ী থেকে কোলের বাচ্চা পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো খেতেন। তাঁকে বাড়ীর মেয়ে-বউ পা ধুইয়ে দিয়ে, আঁচল বা মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিতেন। সবচেয়ে সুন্দর আসন পেতে দিতেন বসতে। আর পায়ের কাছে রাখতেন প্রণামী। খাবার ব্যবস্থা থাকলে ভুরিভোজের শেষে পেতেন 'ভোজন দক্ষিণা' এবং কাছারীর জন্য 'ভেট'। শুধু তাই নয়, জমিদারদের জৈবিক লালসার ক্ষুধাও নিবৃত্ত করতেন ঘরের মেয়ে-বউয়ের ইজ্জত দেবার বিনিময়ে। বিনা মজুরিতে খেটে দেবার ব্যাপারটাও ছিল অতি আবশ্যিক ব্যাপার। এই সমস্ত অত্যাচার-অপমান-লাঞ্ছনা ও শাসন-শোষণের যন্ত্রণাই একদিন তাঁদের গৃহজীবনের স্তিমিত-সহিষ্ণুতা থেকে ছিঁড়ে আনে। দীক্ষিত করে ভয়ঙ্কর রুদ্র প্রচণ্ডের মন্ত্রে। তার ফলে বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অর্থাৎ কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার, সন্দেশখালি, গোসাবা, হাড়োয়া, ক্যানিং, মিনাখাঁ থেকে জন্ম নিয়েছে 'তেভাগা' আন্দোলন, 'ভাগচাষী আন্দোলন' কিংবা নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত 'বিপ্লবী কৃষক কমিটি'র ইত্যাদি। বিশ, তিরিশ, চল্লিশের বা পঞ্চাশের দশকের সুন্দরবনে এই ধরনের আন্দোলনের বিভিন্ন সময়ের বিভিঃ দাবিগুলি সূত্রাকারে সাজালে নিম্নরূপ দাঁড়ায়

ক. বাজে আবওয়ার-আদায়, দেড়াবার বন্ধ করা।

খ. ক্ষেত মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি।

গ. ফসলের তিনভাগের দুভাগ ভাগ চাষীকে দেওয়া।

ঘ. ভাগচাষীকে উচ্ছেদ না করা।

ঙ. ভাগচাষীর খামারেই ধান তোলা।

চ. খালবিল গোচারণ ভূমিতে সকলের সমান অধিকার প্রয়োগ।

ছ. চাষীদের উপর যে কোনও রকমের অত্যাচার বন্ধ করা।

জ. চাষীদের বকেয়া ঋণ মকুব করা।

ঝ. সুদের হার কমান।

ঞ. প্রতি একশত বিঘা ভাগের জমি চাষ করার জন্য দেড় বিঘা পরিমাণ জায়গা চাষীর ঘর বাঁধার জন্য দেওয়া।

ট. জমিদারদের আর চাষীর মধ্যে গোলমাল হলে তার বিচার করার অধিকার মাত্র জমিদারের নয়--বিচার কমিটির। এই কমিটিতে থাকবে জমিদার প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি।

ঠ. ভাগচাষীকে জমির স্বত্ব দেওয়া।

ড. জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ এবং বৃটিশ শাসনের ধ্বংস।

ঢ. ক্ষেতমজুর ও মাহিন্দার লোকেদের দিনে ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য সময় ও ন্যায্য মজুরি চালু করা [এই মজুরি ধনী কৃষকের জন্য এক রেট এবং সাধারণ কৃষকের জন্য আর এক রেট]।

ণ. চুরি-ডাকাতি-দস্যুবৃত্তি বন্ধ করা।

ত. মদ-জুয়া-ব্যভিচার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

থ. সকল বিষয়ে সকল শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত ও সচেতন করা।

সুন্দরবনের জমিদাররাই যে কেবল শাসন-শোষণের হাতিয়ার ছিলেন তাই নয়, জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে ছিলেন আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়িক মানুষ বা মধ্যস্বত্বভোগী—যারা কৃষকের দুর্দিনে ও দুর্বলতা বুঝে চক্রবৃদ্ধি সুদে-মূলে ঋণ দিতেন, ভুয়া দালালি করতেন। ফলে ঋণ কোনোদিনই শেষ হতো না। অধিকন্তু ভুয়া দলিল ও মহাজনী কাগজপত্তরের ফাঁদে চাষীর ভিটে-মাটিটুকুও হারিয়ে যেত।

জমি আবাদ হচ্ছে, ফসল ফলছে অথচ মানুষের খাবার মিলছে না। ফলে অসন্তোষ আর ক্ষোভ চারপাশে ফেটে পড়ছে। জমিদারও তৎপর হয়ে উঠছেন—তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছেন সরকার। অত্যাচার, জুলুম, পুলিশ-পিকেটিং, ১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তার, মেরেফেলা বা বাড়ি ঘর জ্বালানো তখন সুন্দরবনের মানুষের নিত্য সহচর। ওদিকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে দুর্নিবার গতিতে। এইরকম একমুহূর্তে গড়ে উঠে গোসাবা—রাঙ্গাবেলিয়া—সাতজোলিয়া নিয়ে হ্যামিলটনের সমবায়।[৮] ১৯০৯ সাল। স্কট দেশীয় হ্যামিলটন জমিদার হয়েও বুঝেছিলেন কৃষকের উন্নতির জন্য কিছু উন্নয়ন মূলক কাজ কবা দরকার, দরকার বিপ্লবী মানুষের পুনর্বাসন। তাই তিনি পেশ করলেন একটি পরিকল্পনা। বৃটিশ সরকার সেটি সমর্থনও করলেন। বিদ্যানদীর তীরে গহণ অরণ্যে ২২০০০ একর নিয়ে গড়ে উঠে 'হ্যামিলটনের আবাদ'। এখানে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম সমবায় সংস্থাগুলির একটি 'Bengal Young Mens Zamindary Co-operative Society' স্থাপন সহ জলের পুকুর, যাতায়াতের রাস্তা, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ধর্মগোলা, কৃষি সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্র, বিভিন্ন কুটির শিল্প, নৈশ বিদ্যালয়, গো-প্রজনন কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচলন করেন 'গোসাবা একটাকার নোট।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরের সঙ্গে গোসাবার 'রুরাল রি-কনস্ট্রাকশন ইনস্টিটিউ'এর সংযুক্ত করার পরিকল্পনাও করেন। তাঁর আমন্ত্রণে ১৯৩২ সালের ২৯ ডিসেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও গোসাবায় এসেছিলেন।

তুলনামূলকভাবে সুন্দরবনের অন্যান্য এলাকার তুলনায় 'হ্যামিলটনের আবাদ'-এ বাহ্যিক উন্নতি, শিক্ষার হার [১৯৩১ সালের সেন্সার অনুযায়ী সারা বাংলায় শিক্ষিতের হার ৪% আর গোসাবায় ৪৫%] একটু বেশি হলেও মূল চরিত্রের খুব একটা পার্থক্য থাকেনি। নানা ছোটখাট ঘটনার মাধ্যমে ক্রমশ হ্যামিলটন-জমিদারির আসল চরিত্র উদ্ঘাটিত হতে থাকে। প্রথমত, সমবায় থেকে যে 'দাদন' বা ঋণ দেওয়া হতো সেই ধান চাষীর ঘরে মাপাই হতো না, মাপা হতো এস্টেটের 'রাইস মিলে'। আর দাদন পরিশোধ হতো টাকায় নয়, ধানে। ফলে বাটকারার ওজনের কারচুপি করার কাজে তৎপর হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত

কর্মচারীরা। দীর্ঘদিন ধরে মুখ বুজে থাকার পর বিক্ষুব্ধ কৃষিজীবীরা ফুঁসে ওঠেন। দ্বিতীয়ত, গোসাবা—সাতজেলিয়া—রাঙ্গাবেলিয়ার বিস্তৃত খাল—যা স্থানীয় জনসাধারণ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতেন, সেই খালটিও ইজারা দেওয়া হয়। ফলে বঞ্চিত কৃষকেরা অশান্ত হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত, কৃষি চুক্তিপত্র বাতিলের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। যে সমস্ত জমিতে কৃষক বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে ধান ফলাবেন সেই চাষের খরচ চুক্তি অনুযায়ী চাষী পেলেও সমস্ত ধান দিয়ে আসতে হতো জমিদারের গোলায়। এমনকি ভূমিহীন চাষীদের যে জমি বিলি করা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল 'খাম' অর্থাৎ হ্যামিলটন এরিয়ার বাইরের জমি। ফলে কৃষি-প্রজাগণ খুব সহজেই উৎখাত হয়েছিলেন তাঁদেরই হাতে বন-কাটা জমি থেকে।

আবাদ পত্তনের আগে মুখ্যত জঙ্গলেই ছিল সুন্দরবনের অর্থনীতির প্রধান উৎস। জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণ কাঠ, মধু, মোম, মাছ, কাঁকড়া, গোল-হেঁতালপাতা, বালি, ধানিঘাস এবং বিভিন্ন প্রকার নদীর সামুদ্রিক প্রাণী। বর্তমানে এই স্থান অধিকার করেছে আবাদী এলাকা অর্থাৎ কৃষি ভূমি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দরবনের যত পরিবার আছেন তাদের মধ্যে ৯৪.৬৯% পরিবারই কৃষি নির্ভর। সুন্দরবন যেহেতু সেচের অপ্রতুল ব্যবস্থায় প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ও এক ফসলি এলাকা, সেইহেতু চাষাবাদের কাজ সারার পর জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদেই জঙ্গলে যেতে হয়। আউস, আমন ও বোরো এই তিন প্রকার ঘান উৎপন্ন হলেও মূলত সুন্দরবনে আমন ধানের চাষ হয় বেশি। এর উৎপাদন হার একরে গড় ২৪ মন। [যদিও মাপের হিসেবে বর্তমান ১ মন = ৩৭.৩২ কেজি] এছাড়া গম, বার্লি আলু এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন সবজি বিশেষ করে তরমুজ, লঙ্কা, কুমড়োই উৎপন্ন হয়।

অন্য কোনো দ্বিতীয় আয়ের উৎস নেই এমন মানুষ যারা মাত্র জমির উপর নির্ভরশীল, তাদের অবস্থা বর্তমানে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। একেবারেই ভূমিহীনদের প্রসঙ্গ যদিও স্বতন্ত্র। ১৫ থেকে ৩০ বিঘা জমির মালিক আদৌ স্বচ্ছল নয়, গরীব। আবাদ পত্তন হবার সাথে সাথে জমির দাম বেড়ে এখন আকাশ ছোঁয়া অবস্থা। তাছাড়া দীর্ঘদিন ফসল দিয়ে দিয়ে জমির স্বাভাবিক উৎপাদন শক্তি ক্রম হ্রাসমানতার দিকে। এদিকে চাষের খরচ আগের তুলনায় এখন অনেক গুণ বেড়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সুন্দরবনের সর্বত্র দো-ফসলি করা সম্ভব হয়নি ; এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়ে আনার মতো আধুনিক চিন্তাভাবনা বা বিজ্ঞানভিত্তিক সার-ওষুধ ব্যবহারের রীতি পদ্ধতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সতত সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের মহাজনের কাছে হাত পাততেই হয়। সুন্দরবনে ঋণগ্রহণ পদ্ধতি পাঁচপ্রকার :

ক. টাকা।

খ. ধান।

গ. জমি বন্ধক।

ঘ. তৈজস পত্রাদি ও গৃহপালিত পশু-পাখি।

ঙ. টাকা সহ উপরি-উক্ত তিনটি বিষয় একত্রে করে মিলিয়ে মিশিয়ে ঋণ গ্রহণ বা ঋণ

পরিশোধ। কাজেই কৃষি আর কৃষি-মজুর নির্ভর পরিবারগুলি ১ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে দুই-তিন বছরের বিভিন্ন শর্তে প্রতিশ্রুতি দেন। ধান ঋণ নিলে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিনে যে ১ বস্তা = ৬০ কেজি ধান নেওয়া হলো তা ফাল্গুনের মধ্যেই পরিশোধ করার সময় সুদে-আসলে মহাজনকে দিতে হয় দেড় বস্তা = ৯০ কেজি। আর টাকায় ১০০ নিলে মহাজনকে দিতে হয় ১৫০ টাকা। এক বছরে কিংবা এককালীন শোধ করতে না পারলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তৈজসপত্র বা গরু-ছাগল-ভেড়া-মহিষ দিয়ে ঋণমুক্ত হতে হয়। অথবা ভিটেমাটি বন্ধক দিয়ে কিংবা বিক্রি করে দিতেই হয়। তারপর যার কেউ নেই তার আছে 'বন' এই প্রবাদ বাক্য সত্য হয়ে ওঠে কৃষকের জীবনে। শামুক-গুগলি খেয়ে আর কতদিন চলতে পারে! সরকারি 'টেস্ট রিলিফের' ছিঁটে ফোঁটা কাজ কখনো জোটে, কখনো বা জোটে না। মেয়েরা কিছু-না-কিছু ঠিকে ঝি-র কাজ পেলেও পুরুষদের তাও জোটে না। বছরে বর্ষার দুইমাস এবং শীতের দুইমাস এই চারমাস বাদে সুন্দরবনে আর কোথাও কর্ম-সংস্থানের সুযোগ নেই। চারমাস বলি কেন, বলা চলে গড়ে দুই মাসই প্রত্যেক মানুষের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ থাকে মাঠে। মূলত লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বপন, বীজধান রোপণ, ধান কাটা—এই বিষয়গুলিতে খুব বেশি পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। মাঠ নিড়ান, ঝাড়াই, মাড়াই বা ঔষধপত্র দেওয়া অতটা ব্যাপক নয়। ফলে ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক এই সময়গুলিতে অধিকাংশ দিন মানুষকে বসে কাটাতে হয়। সুতরাং কাজের পরিবেশ না গড়ে উঠলে কাজ দেবে কে? এজন্য গৃহস্থ কৃষককে অনিবার্যভাবে জঙ্গলে যাবার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সেখানকার মোম-মধু-কাঠ, মাছ-কাঁকড়া, লতা-গোলপাতা ইত্যাদি খানিকটা জীবিকার সন্ধান দিতে সক্ষম রিক্ত-সর্বহারা মানুষকে।

জমি হাতছাড়া হলেও কৃষকের পক্ষে জমির স্মৃতি মুছে ফেলা কঠিন। জঙ্গল হাসিল করে দুর্গমকে ফসলের উপযোগী আবাদে পরিণত করার মধ্যে সে বা তার পূর্বপুরুষদের অমানুষিক শ্রমদানের ইতিহাসকে কখনই ভুলতে পারেনি। তাই জমিই যে কোনো মূল্যে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু জমি নামক 'সোনার পাথরবাটি'টি কৃষক জমিদারের লালসায় হারিয়েছেন একবার ; দ্বিতীয়বার হারালেন মহাজনের শিকার হয়ে। কিন্তু জঙ্গলে যাব বললেই তো আর জঙ্গলে যাওয়া যায় না! সেখানে যাওয়ার আগে চাই সরকারি অনুমোদন—'পাশ' বা 'পারমিট'। পারমিটও খুব সহজে মেলে না। নানান খড়কাটি পোড়াতে হয়। এমনকি বন থেকে ফিরেও তাদেরকে কাঠের ভাগ দিতে হয়, মোম-মধু-মাছ-কাঁকড়ার ভাগ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতে হয়। যারা টাকা-পয়সা তদবির-তদারক করতে পারে না, বলা চলে—পারমিট পাবার মতো অর্থ ও ধৈর্য নেই, তারা কোনো রকম অনুমোদন ছাড়াই জঙ্গলে প্রবেশ করেন, সরাসরি বাঘ-কুমিরের সামনে দাঁড়ান, মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করেন। বনরক্ষক-কর্মীদের এড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ সংগ্রহ করেন ; বন-ডাকাতদের মোকাবিলা করেন। বিনা অনুমতিতে যারা জঙ্গলে প্রবেশ করেন তারা ধরা পড়লে আইন-ভঙ্গের দোষে বা অনধিকারভাবে জঙ্গলে প্রবেশ করার অপরাধে শাস্তি ভোগ করেন। সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে যে সমস্ত জেলে-মউলে-কাঠুরে সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে

বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারান, তাদের পরিবারকে ২০০০ টাকা দেওয়া হয় 'টাইগার ভিকটিম সিলেকসন সেকটারের' মাধ্যমে। কিন্তু কাঠ-মধু-মাছের অধিকাংশ বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মহাজনগণ। গৃহস্থ চাষী কিংবা 'বনকরা'দের বনে যাবার আগে এদেরকে ধরতেই হয়। অধিকাংশ জমির মালিকের যেমন জমির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, তেমনি এই ধরনের ব্যবসায়ী মহাজনদেরও জঙ্গলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ, জঙ্গলের যাবতীয় একচেটিয়া কারবার গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন গঞ্জে। জঙ্গলে যাবার আগে মাস-কাবারি খুদ-কুড়ো, ঝাল-নুন-হলুদ-তেল-কাপড় ইত্যাদি এদেরই কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে সংগ্রহ করে সেগুলো বাল-বাচ্চা বাঁচাবার জন্য বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে তবেই জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব। সেখানে বাঘ-কুমির তাড়িয়ে বন-ডাকাত ও বনরক্ষকদের চোখের অন্তরালে থেকে মধু-মাছ-কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করার এক আরণ্যক জীবন।

মাছ-মধু-কাঠ ইত্যাদি বিষয়-অনুপাতে মহাজনের সঙ্গে জঙ্গলকারদের শর্ত থাকে। শর্ত দুরকম ভাবে হয়। প্রথমত, মৌখিক এবং দ্বিতীয়ত, লিখিত। মহাজন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় :

ক. টাকা।

খ. নৌকা।

প্রধান শর্ত হলো ঋণ পরিশোধ না-হওয়া পর্যন্ত অন্য মহাজন ধরা যাবে না। আর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা সম্পদ হবে চার ভাগ।

ক. মহাজনের, যার কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়, সেই মহাজনের অংশ।

খ. মউল-জেলে-কাঠুরের, যারা জঙ্গলে যায়, তাদের অংশ।

গ. নৌকার ভাগ, যার কাছ থেকে নৌকা নেওয়া হয়, সেই নৌকা-মালিকের অংশ।

ঘ. টাকার ভাগ, যে পরিমাণ টাকা নেওয়া হয়েছে, সেই টাকা-পরিমাণ অংশ।

সাধারণ গৃহস্থ-কৃষকের নৌকা বা টাকা কিছুই প্রায় থাকে না। ব্যবসায়ী বা মহাজন ধরতেই হয়। যদি সংগ্রহের পরিণাম ভালো হয় তাহলে ঋণ শোধ হতে পারে, কিন্তু সংগ্রহ কমে গেলে তখনই হয় বিপদ অর্থাৎ ঋণ থেকে যায়। এরই মধ্যে কেউ মারা গেলে উক্ত ঋণের সঙ্গে শ্রাদ্ধের খরচটাও যুক্ত হয়। এই সমূহ ঋণ সুদের সুদ হয়ে বাঘের থাবার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে চাষী-গৃহস্থের ঘাড় চেপে ধরে। জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা সম্পদের বিনিময়ে ঋণ শোধ না হলে উক্ত মহাজনের বাড়িতেই শ্রমদান করতে হয় বা মাহিনা খাটতে হয়। এভাবে জীবনের প্রায় তিনভাগ সময় জঙ্গলকারী কৃষককে 'বনডেড লেবার' বা 'বন্দীদাস'-এর মতো মহাজনের কাছে বিকতে হয়। নিজের শরীর না পারলে কিশোর পুত্র বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। ফলে আরেক বার অর্থাৎ তৃতীয়বার কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে শ্রমিকে পরিণত হলেন।

পূর্বে শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ জঙ্গলে যেতেন। বর্তমানে জঙ্গলে যাওয়া মানুষের হার শতকরা ১০ ভাগ। কারণ 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' এবং তার আইন-কানুন স্থানীয় জঙ্গল-নির্ভর মানুষের রুজি-রোজগার কেড়ে নিয়েছে। তাছাড়া এলাকার জলবায়ু বিস্ময়কর ভাবে হেরফের হওয়ার দরুণ মাছ-মধু-কাঠের ক্রমহ্রাসমানতাও জঙ্গলের প্রতি মানুষের অনীহা

সৃষ্টি করছে। পূর্বে সুন্দরবনে মানুষ আসতেন কাজ করবার জন্যে, এখন আসছেন ট্যুরিস্টরা। আর সুন্দরবনের থেকে মানুষ চতুর্থবার জমি হারিয়ে রিক্ত হস্তে যাচ্ছেন শহরের দিকে--কাজের খোঁজে।

সুন্দরবনে জঙ্গল ও কৃষির পাশাপাশি অর্থনীতির আরেক উৎস হলো 'জলকর' বা 'মাছের ভেড়ি'। ৬০-র দশক থেকে মেছোঘেরি ফিসারি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৪-৭৫ নাগাদ জাপান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুন্দরবনের বাগদা চিংড়ির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী এখানে এসে নোঙর গেড়ে বসেন। মাতলা-বিদ্যাধরী-করতল-ইচ্ছামতী-কালিন্দী-সপ্তমুখী-বিদ্যা-হেড়োভাঙ্গা-ঠাকরুণ-গোসাবা-মৌখালি-রায়মঙ্গল প্রভৃতি নদীর জোয়ার ভাঁটা খেলা চরে পূর্বে থেকে সাধারণ ঘেরি ছিল—এখন সেই সমস্ত চর সহ সংলগ্ন আশপাশ এলাকার প্রায় ৬০,০০০ একর আবাদী ধানচাষের জমিগুলোও ফিসারির আওতায় আনা হয়েছে আইন সম্মত কিংবা বে-আইনী যাই হোক না কেন, এই ধরনের ঘেরিতে দুই রকম ভাবে মাছের চাষ ও ব্যবসা চলে :

ক. নোনা জলের মাছ।

খ. একই সঙ্গে ধান ও মাছের চাষ।

ফলে এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। কেননা, ভেড়ির মালিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে লড়াই হয় তার পরিণতি পায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা হত্যা-লুণ্ঠনের মাধ্যমে। ঘেরি মালিকরা পঞ্চায়েতের সহায়তায় বা কিছু শ্রেণীর লোভী চাষীদের সমর্থনে নদীবাঁধ কেটে দিয়ে চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দেন। জমি একবার নোনা জলে ডুবলে তিন-চার বছরের মধ্যে ফসল ফলানো সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে গরিব রায়তরা ভেড়ি মালিকের সঙ্গে পাঁচদশ বছরের চুক্তিতে জমি ছেড়ে দেন। চুক্তি অনুযায়ী বাৎসরিক ভিত্তিতে চাষী বা রায়ত পান জমি বিশেষে ১০০ টাকা থেকে ১,০৪১ টাকা। চুক্তিপত্রগুলি একপ্রকার 'আমলনামা'—যা জমিদারেরা ব্যবহার করতেন। ইতিমধ্যে চাষীর মনে চাষ করার বাসনা জাগলে উক্ত জমিতে ফসল ফলাবার বা নামার অধিকার পাবেন শীত ও বর্ষার দুই-দুই করে চারমাস। চাষীদের ধারণা ছিল নোনা জলের ফিসারী করলে তিনি একই সঙ্গে বাৎসরিক কিছু টাকা পাবেন আর পাবেন পুরো ফসল। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে না হতেই বুঝতে পারেন, তিনি কি ভুল করেছেন! সেই ভুল শোধরাবার আর কোন পথ থাকে না। কারণ :

ক. নোনা জলে ডুবিয়ে দেবার ফলে জমিতে কিছু পলি পড়ায় প্রথম বছর তুলনামূলক ভাবে ভাল ফসল ফললেও পরবর্তী বছর থেকে জমি 'নোনার কামড়ে' পড়ে ফসল দিতে পারে না।

খ. এলাকার মানুষদের কর্মসংস্থানের ন্যূনতম সুযোগটুকু হারিয়ে যায়—বেকারের সংখ্যা বাড়ে।

গ. ভেড়ি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমির আয়তন কমে যায়। খাদ্য ও অন্যান্য ফসলের ঘাটতি পড়ে।

ঘ. পানীয় জল লবণাক্ত হয়ে যায়, পশুচারণ ভূমি কমে যায়, গ্রীষ্মকালীন ফসল

ফলাবার মতো জমি অবশিষ্ট থাকে না।

ঙ. বাগদা-ভেট্‌কি-ভাঙ্গন-পার্শে প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণীর মাছ রেখে ভেড়ির পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচনায় অন্যান্য মাছ বা মাছের পোনা ধ্বংস করে ফেল হয়।

চ. স্থানীয় আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ির বাঁধ ভেঙে বন্যার তাণ্ডবতা প্রশ্রয় পায়।

ফলত, সুন্দরবনের যে জমি হেঙ্কেলের আমল থেকে বাঁধ দিয়ে দিয়ে চাষোপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তা আজ বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থে পুনরায় নোনা জলে ডুবে থাকছে। আর চাষী বাধ্য হয়ে ফিসারি-মালিকের অধীনে থেকে মাছের যোগান দিতে শুরু করেছেন, নয়ত নদীতে নেমে বাগদা চিংড়ির বাচ্চা ধরে ভেরিতে ভেরিতে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দরবনের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৭, ৫৬, ৮৭১ একর। সেচ সেবিত জমির পরিমাণ ৪, ৬৫৪ একর। সুন্দরবনে সেচ হয় নিম্নলিখিত ভাবে :

ক. খাল-পুকুর থেকে ৪, ৩৭২ একর — ২টি চাষ।

খ. নলকূপ থেকে ২৮২ একর -- ৩টি চাষ।

এই জমিতে চাষ করেন এমন চাষীর সংখ্যা ২, ৩৩, ৭৭৭ জন এবং ক্ষেত মজুরের সংখ্যা ২, ৩৫, ২৫৬ জন। এঁরা ৭, ৫৬, ৮৭১ জমিতে কাজ করলে মাথা পিছু জমি পড়ে ১, ৬৮ একর। এখন দেখা যাক এই ১,৬৮ একর জমিতে কতদিন কাজ হতে পারে। সুন্দরবনের ৭, ৫৬, ৮৭১ একর জমিতে চাষ করতে বছরে ৪১, ৬২৭, ৯০৫ মানুষ দিনের কাজে লাগে। অবশ্য সেচ-সেবিত জমির হিসাব ধরলে মোট মানুষ দিন দাঁড়ায় ৪২, ১২১,৫০৫। অর্থাৎ মাথা পিছু কাজ জোটে গড়ে ৯৪ দিনের। সুতরাং ১৬৮ একর জমিতে কত দিন কাজ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

এখন মজুরির হিসাব দেখা যেতে পারে। 'সরকারি রেট' যাই থাকুক না কেন সুন্দরবনে চাষ মরশুমে দৈনিক মজুরি ১০ থেকে ১২ টাকা। ধানকাটার মরশুমেতেও একই রেট। অন্য সময় ৪ থেকে ৬ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে এই রেট ৪ থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত উঠে। আবার প্রচণ্ড কাজের সময় ঘোর মরশুমে মাত্র কাজ চলে ২০ থেকে ২৫ দিন। অর্থাৎ ধান রোয়া ও ধান কাটার মরশুমে একত্রে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ দিন-১১ থেকে ১২ টাকা রেটে কাজ পাওয়া যায়। বাকি সময়গুলিতে ৪ থেকে ৮ টাকা মজুরি। দেখা যাচ্ছে, মজুরদের জীবনের মান দুটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ মজুরির হার এবং বাৎসরিক কর্ম-সংস্থানের দিনসমূহ—কোনোটাই মানুষের জীবনকে স্বস্তি এনে দিতে পারেনি।

সুন্দরবনে যে সমস্ত কর্মী কাজ করেন তাদের শতকরা ৮৭.৫২ জন তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, ৯৩.০৭ তপসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ৪৮.৪২ জন পূর্বোক্ত দুইশ্রেণীর বাইরের মানুষ। আবার এই কর্মীদের মধ্যে কৃষি সংক্রান্ত মানুষদেরকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে বিভক্ত যেতে পারে :

ক. প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষী।
খ. মধ্যবিত্ত চাষী।
গ. বৃহৎ চাষী।
ঘ, ভূমিহীন চাষী।
ঙ. অন্যান্য শ্রেণীর চাষী।
এঁদের মাসিক আয় এবং ব্যয়ের হিসাবটা দেখা যেতে পারে :

অর্থনীতির পর্যায়	প্রতিটি পরিবারের মাসিক আয়	প্রতিটি পরিবারের মাসিক ব্যয়
প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষী	২২০.৫৪ টাকা	২২৯.৮৯ টাকা
মধ্যবিত্ত চাষী	৩৩৩.৬৪ টাকা	২৪৯.১৯ টাকা
বৃহৎ চাষী	৯২৫.৭৯ টাকা	৫৭৭.১৬ টাকা
ভূমিহীন চাষী	১২৭.২৯ টাকা	১৪৬.৮৬ টাকা
অন্যান্য শ্রেণীর	৩৫১.৮৬ টাকা	২৪৮.৮৩ টাকা

এই চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনে বহুকাল ধরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার অনুপস্থিত। যাদের নেই বা যাদের কম আছে তারা ক্রমশই আরো বেশি গরির হয়ে যাচ্ছেন, আর যাদের বেশি ছিল তারা আরো স্ফীত হয়ে উঠছেন। সুতরাং বহুদিন ধরে না-পেয়ে নিজের সম্পদ যাঁরা টিকিয়ে রাখতে পারেন নি, তাঁরা বেঁচে থাকবার চেষ্টায় ক্ষেতমজুর বা দিনমজুর হয়ে যাচ্ছেন, কিংবা জঙ্গলে যাচ্ছেন অথবা শহরের দিকে পা বাড়াচ্ছেন।

অনস্বীকার্য যে, বয়সের হিসাবে সুন্দরবনে কাজ করা মানুষের সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। যদিও সংবিধানে আছে, ১৪ বছরের বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে সরকার তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অপরদিকে বিশেষ ধরনের সামান্য সংখ্যক কর্মী ব্যতীত সাধারণত ৬০ বছরের মধ্যে কর্মীরা অবসর গ্রহণ করেন। এইসূত্র ধরে বলা যেতে পারে, ১৪ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে মানুষ কাজ করেন বা রোজগার করেন। কিন্তু সুন্দরবনের বাস্তব চিত্র এর উল্টো, বিশেষ করে শিশু-শ্রমিকের ক্ষেত্রে। তারা ৬ বছর বয়স থেকেই 'গরুর রাখালি' করে এবং মাঠে বাবার সঙ্গে কাজে 'হাতে খড়ি' দেয়। তাছাড়া মহিলা শ্রমিক তো আছেনই। তার পরিমাণ পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় মাত্র ১৫ শতাংশ কম। ৬ বছর বয়স থেকেই মেয়েরা 'ঝি গিরি' দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে।

সুন্দরবন এলাকায় জীবিকার উৎসগুলি হলো :
ক. চাষ।
খ. ক্ষেতমজুর।
গ. পশুপালন, জঙ্গলের কাজ, মাছধরা, বাগানের কাজ।

ঘ. খনিজ পদার্থ আহরণ।

ঙ. গৃহশিল্প।

চ. গৃহশিল্প ব্যতিরেকে অন্যশিল্প।

ছ. নির্মাণ কার্য।

জ. ব্যবসা-বাণিজ্য।

ঝ. পরিবহণ, গুদাম, যোগাযোগ।

ঞ. অন্যান্য কাজ।

দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির প্রথম ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষের হার শতকরা ৯০ ভাগ। অর্থনীতির প্রথম ক্ষেত্র যেখানে উৎপন্ন হয় খাদ্য এবং কাঁচামাল সেই ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষের সংখ্যা বেশি হলে অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজ সারা অসম্ভব। চাষের জমি সুন্দরবনে আর বাড়ছে না। ফলে মানুষ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি কমতে থাকে এবং সেই অনুপাতে কমতে থাকে উদ্বৃত্ত। এই অবস্থায় মানুষ বেঁচে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে উৎপাদনের হাতিয়ার বাঁধা দেয় অথবা বিক্রি করে ফেলে। ফলস্বরূপ অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে।[৯]

ইতিমধ্যে সুন্দরবন থেকে শহরে ঢোকবার বা শহর থেকে সুন্দরবনে যাবার প্রবেশ মুখগুলি বিশেষ করে হাসনাবাদ, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর প্রভৃতি জায়গায় রেল স্টেশন হয়েছে, জলপথের যোগাযোগও হয়েছে আরোও উন্নত। কলকাতা বা তার আশপাশ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের দুর্গমতা অনেকটাই কেটে গেছে। স্বাধীনতার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৩ সালে, যা 'সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ' নামে খ্যাত। এই বছরই সুন্দরবন 'ব্যাঘ্র প্রকল্পের'র মর্যাদা পায়। ১৯৭৬ গড়ে ওঠে 'ভগতপুর কুমীর প্রকল্প'। ১৯৮৭ 'জাতীয় উদ্যান'ও 'অভয় অরণ্য' রূপে স্বীকৃতি সহ ১৯৮৯ সনে সুন্দরবন 'জীবমন্ডল সংরক্ষণ প্রকল্প' ভূক্ত হয়। উদ্দেশ্য :

ক. সৌন্দর্য বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাগৈতিহাসিক, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বস্তুকে সাধারণের জন্য সংরক্ষণ করা।

খ. প্রাণী ও উদ্ভিদ শিকার, সংগ্রহ ও হত্যা নিষিদ্ধ করা।

গ. সরকার সকল উদ্যান পরিচালক ও আইনের রক্ষক। এমন কি ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট 'সুন্দরবন' নামে একটি পৃথক দপ্তর খুলেছিলেন! কিন্তু এহ বাহ্য, এত সব হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার আজও অনুপস্থিত। আমাদের ধারণা এখনও সুন্দরব 'উদ্বৃত্ত এলাকা' রূপে বিবেচিত। এর খাদ্যশস্য, জঙ্গলের সম্পদ, নদী-সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদ—সবই চালান যায় কলকাতা এবং অন্যত্র। সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সুন্দরবনেরই সম্পদ দিয়ে 'কিছু করা সম্ভব কিনা' তার চিন্তাভাবনা করার সময় বোধহয় এসেছে।

৩নং চিত্র

ক্রমিক সংখ্যা	কাজের ধরন	কত মানুষ কাজ করেন	কাজ করা মানুষের মধ্যে শতকরা হার	মোট জনসংখ্যার শতকরা হার	মন্তব্য
ক.	চাষী	২, ৬৩, ৭৭৭	৪৪.০৬	১১.৬৭	অর্থনীতির প্রথম এই ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষের সংখ্যা ৪, ৭৭, ০৭০ অর্থাৎ শতকরা ৮৯.৯২ ভাগ।
খ.	ক্ষেত মজুর	২. ৩৫, ২৫৬	৪৪.৩৪	১১.৭৫	
গ.	পশুপালন,জঙ্গলের কাজ, মাছ ধরা, বাগানের কাজ	৮,০০৭	১.৫২	০.৪০	
ঘ.	খনিজ পদার্থ আহরণ	১৯	—	—	অর্থনীতির দ্বিতীয় এই ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষের সংখ্যা ১১.০৬১ অর্থাৎ শতকরা ২.২৪ ভাগ।
ঙ.	গৃহ শিল্প	৫,০০৮	০.১৪	০.২৫	
চ.	গৃহশিল্প ছাড়া অন্য শিল্প	৫,৭৫১	১.০৮	০.১২	
ছ.	নির্মাণ কার্য	১,০৮৩	০.২০	০.০৫	
জ.	ব্যবসা-বাণিজ্য	১৪,১৫৫	২.৬৪	০.৭১	অর্থনীতির তৃতীয় এই ক্ষেত্রে কাজ করা মানুষের সংখ্যা ৪১.৬৪৫ অর্থাৎ শতকরা ৭.৮৪ ভাগ।
ঝ.	পরিবহণ,গুদাম,যোগাযোগ	৩,৮৯৫	০.৭৪	০.১৯	
ঞ.	অন্যান্য কাজ	২৩,২৯৫	৪.৪৫	১.১৮	
ট.	মোট	৫,৩০,৫৭৬	১০০.০০	২৬.৪৯	

সুন্দরবন এলাকায় বিভিন্ন কাজ-কর্মে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ও শতকরা হার

তথ্যসূত্র

১. বংশী মান্না। সুন্দরবন বাঘ অভয়ারণ্য। দেশ : ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১।

২. ঐ

৩. সতীশচন্দ্র মিত্র। যশোহর-খুলনার ইতিহাস-১ম খণ্ড। ১৯৬৩, পৃঃ--৪৫--৪৭।

এ. এফ. এম. আবদুল জলীল। সুন্দরবনের ইতিহাস। ১-৭ পৃষ্ঠা। ১৩৭৬।

৪. ২৪ পরগণার পরগণা সমূহ--১. আকবরপুর ২. আমীরপুর ৩. আজিমা বাদ, ৪. বেলীয়া ৫. বাদীরহাটী ৬. বসনধারী ৭. কলিকাতা ৮. দক্ষিণ সাগর ৯. গড়. ১০. হাতিয়া গড় ১১. হত্তিয়ারপুর ১২. খড়িজুড়ি ১৩ মানপুর ১৪. মেদনীমল্ল ১৫. মাগুরা ১৬. মানপুর ১৭. ময়দা ১৮. মুড়াগাছা ১৯. পইকান ২০. পেঁচাকুলি ২১. মাতাল ২২. সাহানগর ২৩. শাহাপুর ২৪. উত্তর ২৪ পরগণা।

এই সমস্ত পরগণার এখন ছুটি হাওড়া ও হুগলীর জেলাভুক্ত। পরবর্তী কালে নদীয়া ও যশোহর হতে অপর ২৯টি আসায় বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার পরগণা সংখ্যা মোট ৪৭টি—২৪ পরগণা নামের ইতি ঃ পল্লীবাণী, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩২৬,

৫. দুলাল চৌধুরী, দক্ষিণ রায় : বাঘ ও সংস্কৃতি (সম্পাঃ)। সনৎকুমার মিত্র, ১৯৮০, পৃঃ ৮৫-৪৪।

৬. রত্নাংশুবর্গী। সুন্দরবন, ১৯৮৪ ; A Fouch on Sundarban. Edited by Das, Mukherjee & Chowdhuary, ১৯৮১

৭. এ. এফ. এম আবদুল জলীল। সুন্দরবনের ইতিহাস। ১৩৭৬ পৃঃ ৪১১-৪১৩।

৮. কালীপদ ভট্টাচার্য। মহাপ্রাণ স্যার ডেনিয়াল ম্যাকিনন হ্যামিলটন। ১৯৫৫

৯. A Fouch on Sundarban. Edited by Das, Mukherjee & Chowdhury. ১৯৮১ ; এবং সুন্দরবনের অর্থনৈতিক সমধারাপাত ঃ সমীক্ষার একটি দিক। কানাই ভৌমিক ও জ্যোতির্ময় বসু রায়চৌধুরী। ১৯৭৭।

১ : ২ গুণিন সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও বিবর্তন

স্মরণাতীত কাল থেকেই মানুষ তার গোষ্ঠী ও সমাজে বিভিন্ন আপদে-বিপদে সমস্যায়-বিপর্যয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের শরণাপন্ন হয়েছে--যে তার দুঃখ-দুর্দশার দিনে অপরিহার্য সহায়ক স্বরূপ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে, যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে তার অসহায় বিহুল অবস্থা কাটিয়ে মনে আশা ও প্রত্যয় জাগিয়ে প্রত্যাশিত বিষয়ে কার্যকরী প্রতিকার করে দিতে পারে বলে মনে করে এসেছে। বিভিন্ন 'গুণ'-এ গুণান্বিত এই শ্রেণীর লোকেরা হলেন 'গুণিন' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ; যাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা অথবা পারস্পরিক প্রয়োজনের কথা আজও অস্বীকার করার নয়। আদিম সমাজে এঁরাই ছিলেন আদি পুরোহিত। এক একজন গুণিন যেন এক একটি 'চলমান গ্রন্থশালা'। এঁরা ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী সিদ্ধপুরুষ বলে কথিত। এঁদের কথাবার্তা, চাল-চলন, ব্যবহারিক-পদ্ধতি ইত্যাদি সর্বত্রই যেন একটা বিশেষ পবিত্র বা ধর্মীয় ভাব সম্পৃক্ত, যদিও পূজা-অর্চনা পরিচালনার ভার তাঁদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। পৃথিবীর সমস্ত আদিম এবং অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী-কোমের মধ্যেই এঁরা আছেন। নানা অঞ্চলে এঁদের নানান নাম। যেমন পুরুষ-গুণিনদেরকে শামান (Shaman, Exorcist, with Craft), মেডিসিন-ম্যান [medicine-man] আংগাকাক [angakak] ; আদিবাসী টিপরাদের অজাই, অচাই বা থেমপু ; লুসাইদের পুইতিয়ান ; খাসিয়াদের লাংদুহ ; গোরাদের কমল ইত্যাদি নামে ডাকা হয়ে থাকে। যাঁরা মহিলা-গুণিন সাঁওতালরা তাঁদের বলেন সিক্ষীদার ; ওঁরাও সমাজে খোদনী, তংচঙ্গ্যাদের [চট্টগ্রাম] মধ্যে এঁদের নাম বৈদ্য। উত্তর আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের কোনো কোনো গোষ্ঠীতে এই সম্প্রদায় কে ইফাগাও [Ifagao] এবং কলিঙ্গা [Kalinga] ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।[১] সাধারণ দৃষ্টিতে মহিলা গুণিনকে ডাইনী বা ডাকিনী বলা হয়। কিন্তু ডাকিনী বিদ্যা আর গুণিন-বিদ্যা এক নয়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় এঁদেরকে আমরা গুণিন, ওঝা, সাপুড়ে, যাজক, পুরোহিত, ওস্তাদ, জাদুকর, পীর, ফকির, গাজী, আলি, বিবি, বহুরদার, ভৈরবী, বাউলে, মউলে, গুরু, হিরালী, বৈদ্য, বেদে, বেদেনী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামে ডেকে থাকি। অঞ্চল বিশেষ কিংবা গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরা যে-নামেই অভিহিত হোন না কেন, সমাজে এঁদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা এক এবং অভিন্ন। এদিক থেকে দেখলে গুণিনরা অবস্থানগত ভাবে অঞ্চল-বৃত্তের মধ্যে হলেও মানসিকতায় এবং ব্যবহারিক পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক। ঝাড়-ফুঁক, মারণ-উচাটন, বশীকরণ, বিপত্তারণ ইত্যাদি যা মূলত এই শামান, গুণিন বা আংগাকাক কিংবা তংচঙ্গ্যাদের কাজ, তার এদেশে আদিতম উল্লেখ ও নিদর্শন মেলে অথর্ববেদে যা নিবদ্ধ পত্রের পরবর্তী নানা জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। ঋকবেদেও এর নিদর্শন বর্তমান। ১/১৯১, ২/৪২-৪৩, ১০/১৬২-১৬৩ ইত্যাদি তার প্রমাণ। বর্তমান বহুধা বিভক্ত সমাজে প্রযুক্তিগত কলা-কৌশলের চূড়ান্ত এই যুগেও গুণিনদের অস্তিত্ব এবং তাঁদের কার্যকলাপের কথা অস্বীকার

করার নয়।

প্রবাদে আছে 'আমার গুণ করেছে'। 'গুণ' অর্থাৎ enchanting, মোহগ্রস্ত করা। গুণিনের কার্যকলাপের মধ্যে এই গুণ করা বা মোহগ্রস্ত করার ব্যাপারটাও বর্তমান। 'গুণিন' শব্দটি 'গুণী' বা 'গোনা' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। এর অর্থ--সাধারণ মানুষের কাছে যা অগোচর এবং রহস্যময় ও ঘনীভূত তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা।

গুণিন = বি (সং, গুণী / গিন্)ঃ (গুণ + ইন বা ইনি)। গুণিনের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

ক. বিদ্যাবিশেষের অধিকারী, গুণবান, পণ্ডিত।

খ. গীতবিদ্যায় নিপুণ গায়ক।

গ. বিষবৈদ্য, ওঝা, ভূতের চিকিৎসক।

ঘ. মন্ত্রতন্ত্র, অভিচার পণ্ডিত।[২]

গুণিনরা হলেন একাধারে মন্ত্র বিশারদ, চিকিৎসক, গায়ক ও পণ্ডিত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিনে অকৃপণভাবে খুব কাছে এসে দাঁড়ান। বিপরীতক্রমে মানুষও তাঁদের কাছে আসে সর্ববিধ সংকট মোচনের আশায়। গ্রহণ করে বিভিন্ন ওষুধ, দ্রব্য-পদার্থ এবং মন্ত্র। পালন করে একাধিক আচার ও অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ এবং সুস্থ বা নিরাময় হবার পর বিভিন্ন ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

"ওঝা" = উপাধ্যায় > উজঝাঅ > ওজা > ওঝা। ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ হলেও সাপে-কাটা ও ভূতে পাওয়া রোগীর চিকিৎসক হিসাবে পরিচিতি আছে।

"ফকির" = আরবী শব্দ। এক অর্থ দরিদ্র, ভিক্ষুক; অন্য অর্থ দরবেশ। আল্লাহর কালাম শিখে ধর্মকর্ম করে এবং পরান্নভোজী হয়ে জীবন-যাপন করে। ফকিরদের মধ্যে কেউ-কেউ দৈবিক-ভৌতিক, প্রাকৃতিক-নৈসর্গিক আপদ-বিপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। গাছ-গাছড়া, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব তাড়ান, জিকির করেন।

"বহরদার" = বাঘ তাড়ানোর পেশাদার গুণিন। এঁরা বাওয়ালী নামেও পরিচিত। শিলাবৃষ্টি থেকে ফসলের ক্ষেত ও গ্রাম রক্ষা করেন।

"হিরালী" = পেশাদার গুণিন। শিরালী শব্দজাত। মন্ত্রের সাহায্যে মেঘ তাড়ানো, বজ্রপাত রোধ ও শিলাবৃষ্টি বন্ধ করেন।

"সাপুড়ে" = বেদের একটি অংশ। সাপ ধরেন, সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্র জানেন, শিকড় বা তাবিজ-কবজ দেন।

"বাদিয়া" = বিষবৈদ্য শব্দ থেকে জাত। সাপ ধরেন, সাপ খেলা দেখান, সাপে-কাটা রোগী চিকিৎসা করেন এবং কসরত করে নানা খেলাও দেখান। ঝাড়-ফুক, ঔষধ-কবজের ব্যবস্থা করে থাকেন।

"ডাইনী" = তদ্ভব শব্দ। মূল শব্দ ডাকিনী। পিশাচী, শিব-দুর্গার অনুচরী, মায়াবিনী, কুহকিনী রূপে খ্যাত। এরা শিশুর অসুখ-বিসুখের কারণ, সামাজিক অপকর্মের হোতা। শয়তান এদের উপাস্য দেবতা। আক্রমণ করা, উড়তে পারা ও দেহ রূপান্তরে পারদর্শী।

আগামবিদ্যা, মায়া বিদ্যা সহ অনিষ্টকারী সকল মন্ত্রের নিয়ন্ত্রক বা কর্ত্রী। সমাজ বা মানুষের শত্রু।

যে সব কারণে সাধারণ গৃহস্থ-মানুষ গুণিনদের বা ওঝাদের কাছে আসে তা সূত্রাকারে সাজালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাই :

ক. বাস্তব পরিবেশে ভাবী জয়-পরাজয়ের আশঙ্কায় বিশেষ পরিস্থিতিকে আয়ত্ত করার একান্ত সহায়ক রূপে পাবার জন্য।

খ. স্বল্পব্যয়ে, স্বল্পসময়ে, অনায়াস পরিশ্রমে ঈপ্সিত কার্যোদ্ধারের সম্ভাবনায়। অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে।

গ. প্রত্যহিক জীবনে এবং সর্বত্র সকল-রকম সাফল্য অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে।

ঘ. বিশেষ কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় চলার পথ খুঁজে পাবার আশায়।

ঙ. একান্ত অসহায় অবসাদগ্রস্ত মুহূর্তে শক্তি, সাহস ও প্রেরণার আশ্বাস পেতে ইত্যাদি।

গুণিনরা সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে এগিয়ে আসেন ও তদনুযায়ী নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন এবং এইভাবেই তাদের সঙ্গে সমাজের অপরাপর মানুষের সরাসরি সংযোগ সঞ্চার সাধিত হয়।

একজন গুণিন গুণিনী-সমস্ত-বিদ্যার পারদর্শী হতে পারেন না—সম্ভবও নয়। তবে সমাজের চোখে তাঁকে সম্পূর্ণতার পরিচয় দিতে গেলে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হতে হয় বলে গুণিনরা মনে করেন :

ক, একজন গুণিন অবশ্যই সৎবংশজাত, সৎচরিত্র এবং অভিজ্ঞ হবেন।

খ. লোভ-মোহ-মাৎসর্য যেন তাঁকে স্পর্শ না করতে পারে।

গ. মদ-মাংস-নারী সংসর্গ থেকে যথাসম্ভব নিজেকে মুক্ত রাখা কর্তব্য।

ঘ. পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও বিশেষ নিয়ম মেনে চলা উচিত।

ঙ. গুণিনকে স্বল্পাহারী হতে হবে। ভাত মুখে দেবার সময় 'হাঁ' হবে অল্প। খাবার পূর্বে প্রথম গ্রাস 'বাড়িয়ে' অর্থাৎ উৎসর্গ করে তবে খেতে হয়।

চ. চুল ও নখ রাখা এবং কাটার বিষয়েও বিশেষ বিধি রক্ষা করে চলতে হয়।

ছ. গুণিনকে সাহসী, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু, সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয় ও সংযমী হওয়া উচিত।

জ. একজন প্রকৃত গুণিন হবেন শান্ত, বিনীত, শুদ্ধাচারী এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি।

ঝ. গুণিনকে হতে হবে ঈশ্বর পরায়ণ, দানশীল ও গুরুভক্ত।

ঞ. গুণিন হবেন ধ্যানী, আশ্রমী অর্থাৎ গুরু শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে থাকতে হবে।

ট. গুণিনকে কৃচ্ছ্র সাধনে আত্মশুদ্ধ হতে হবে।

ঠ. সর্বোপরি একজন গুণিন হবেন নিরপেক্ষ।

মানব সভ্যতার আদিস্তর থেকেই গুণিনরা তাঁদের অধীত বিদ্যার সাহায্যে গোষ্ঠী ও সমাজে মানুষের সেবা বা সহযোগিতা করে আসছেন। মানুষ যখন প্রাকৃত কিংবা অতিপ্রাকৃত শক্তির কবলে পড়ে দিশাহারা হয়, উক্ত শক্তির মোকাবিলায় অসমর্থ হয়ে নিজেকে তুলনায় হীনবল মনে করে, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তখনই সে একটি বিপরীত শক্তির

সাহায্য কল্পনা ক'রে তারই মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে। সমাজে গুণিনের ভূমিকা অথবা প্রভাব কিংবা গুরুত্ব এখানেই। বর্তমান জটিল ও বহুধা বিভক্ত সমাজে যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ প্রকট, সেখানে সমাজের উপর তলার জীবনে যে শ্রেণী বৈষম্যের ভাবনা প্রকটরূপে বহমান তার পাশাপাশি এই গুণিনরা আশ্চর্যজনকভাবে একধরনের বৈষম্য-হীনতার চেতনায় প্রবুদ্ধ ও নিরপেক্ষ। তাঁদের কাছে কোনো জাতি-শ্রেণী-বর্ণ বা স্তর ভেদাভেদ নেই--যেমন নেই দুর্দশাগ্রস্তের কোনো ভেদ বা সীমা। বিপদ তো আর উচ্চ-নিম্ন বাছ-বিচার করে আসে না! একজন মুচি, বাগদী কিংবা চণ্ডালের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ অথবা উচ্চ বৃত্তি ভোগী অনায়াসে ঔষধ, মন্ত্র ইত্যাদি নিতে পারেন। জীবনে এমন সর্ব শ্রেণী-হীনতার স্বাদ অন্যত্র পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

আদিম অরণ্য-গুহাবাসী যাযাবর মানুষ যখন তাদের শিকার জীবনও শেষ হয়নি, সেই সময় থেকেই গুণিন বা জাদুকররা সমাজে বা গোষ্ঠীতে পুরোহিতের কাজ করতেন। জনগণ তথা দেশের সামগ্রিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ভার থাকত এঁদেরই উপর। এই পুরোহিত হলেন সেই ব্যক্তি যিনি যাগ-যজ্ঞ, স্তব-স্তুতি, বিবিধ অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে দৈবী বা ঐশী শক্তির সাহায্যে বা উক্ত শক্তির আনুকূল্য ব্যতিরেকে ঘটনাচক্রকে আয়ত্তে এনে ব্যক্তি বা ব্যষ্টির কামনা পরিপূর্তি ঘটাতে সক্ষম হতেন। তিনি একই সঙ্গে একাধারে গুণিন ও পুরোহিত। তিনি সব কিছুরই নির্দেশ দেন। কি করলে কি ফল পাওয়া যাবে তার বিধান দেন। তিনিই বিচার-বিবেচনা করে বলে দেন কোন বস্তু-প্রাণী-প্রাকৃতিক ঘটনা বা সংকেত মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতীক। তিনিই তুক-তাক আর নানাবিধ ক্রিয়া-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রের সাহায্যে লোকের ভাগ্য পরিবর্তন করেন, ভবিষ্যৎবাণী করে শুভাশুভ বলে দেন, ভূত-প্রেত ঝাড়ান, জটিল রোগ মুক্ত করেন, রহস্যজনক সমস্যার সমাধান করে দেন। গুণিনদের সহায়তা ভিন্ন অন্যান্য সামাজিক শক্তি যেখানে এ-সবের সমাধান করতে অক্ষম সেখানে গুণিন এবং তাঁদের অধীত বিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে সফলতা অপরিহার্যতা কিংবা স্বাভাবিক বুদ্ধিকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। বরং সময়োপযোগী এবং কার্যকরী বলে মনে হয়। সমুদয় এ-সব বিষয় আয়ত্ত করতে তাঁদের বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংযম-সাধনা করতে হয়। কখনো এঁরা রাজকর্মচারী কিংবা কোনো গোষ্ঠী বা কোমের নেতা, নয়ত মন্দির-মসজিদ-গির্জা-মঠের পুরোহিত বা সেবায়েত। এঁদের প্রধান অস্ত্র দুটি :

ক. যাগযজ্ঞ : স্তব-স্তুতি, পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে দৈবানুগ্রহ লাভের চেষ্টা বা তাদের সন্তুষ্ট করা। উদ্দেশ্য—মানব সহ অন্যান্য প্রাণীকুলকে আরও সুখময়, আরামপ্রদ ও দীর্ঘায়ু করা।

খ. ইন্দ্রজাল : আভিচারিক অনুষ্ঠান। দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকেও ঘটনা-চক্রকে নিয়ন্ত্রণে এনে অভীষ্ট সিদ্ধি। উদ্দেশ্য সেই একই—জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা। এর জন্য গুণিন তুকতাক, মন্ত্রানুষ্ঠান করেন, লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া, মাদুলি, কবচ ও বিভিন্ন বস্তু বা পদার্থ বিনিয়োগ করেন।

দেশের রাজা নির্বাচন থেকে শুরু করে নির্বাসিত রাজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা, রাজ্যাভিষেক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, রাজনৈতিক শুভাশুভ দেখাশুনা, কি যুদ্ধ, কি শান্তি অথবা শান্তিবিধান

সকল সময়ই রাজার সঙ্গে পুরোহিত ওরফে গুণিন সংযুক্ত থাকতেন। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক দিকগুলোর পাশাপাশিও ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনে পুরোহিতের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। কিন্তু এহ বাহ্য যে, সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারায় স্বাভাবিক নিয়মে যেদিন থেকে মানুষের চেতনার বদল হতে শুরু করেছে, পরিবর্তন হয়েছে বৈষয়িক অস্তিত্বের ; সমাজ নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে লেগেছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, উৎপাদন এবং বিনিময়ের মাধ্যমে ; সূচীত হয়েছে শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভাজন নীতি, সেদিন থেকেই এই বিশেষ আধিদৈবিক ক্ষমতা সম্পন্নদের মধ্যে উদ্ভব ঘটে দুটি শ্রেণীর।

ক. শাস্ত্রীয় ঃ পুরোহিত, যাজক ইত্যাদি।

খ. লৌকিক ঃ গুণিন-ওঝা, পীর-ফকির ইত্যাদি।

শুধুমাত্র মন্ত্র-প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখতে পাই, আমি যতই শুদ্ধাচারে ভক্তি সহকারে মন্ত্রউচ্চারণ করি না কেনো তার কোন ফল হবে না। কিন্তু পুরোহিত মহাশয় এসে পৈতে ছুঁয়ে একটু বিড়বিড় করলেই সর্বসিদ্ধি ঘটবে--মানুষের এই বিশ্বাসই যথাক্রমে পুরোহিত, শাস্ত্র এবং গুণিন--লোকবিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করেছে। পুরোহিতের এই প্রভাব বা প্রতাপ সকল ধর্মের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা শাস্ত্রীয় অনুশাসন যথাবিহিত পালন, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন ; পাঠ করেন সংস্কৃত মন্ত্র, এবং জাতিতে উচ্চশ্রেণীর--কুলীন বা ব্রাহ্মণ। পাশাপাশি আর এক শ্রেণীর যেসমস্ত লোক বিশেষজ্ঞদের দেখতে পাই, অর্থাৎ ওঝা-গুণিন, পীর-পীরানী এঁরা প্রয়োগ বিধির কাজে সিদ্ধহস্ত। সাধারণত এঁরা নিম্ন বা অন্ত্যজ শ্রেণীর থেকে উদ্ভুত। এঁরা একই সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করেন, বস্তু বিনিয়োগ করেন আবার আভিচারিক অনুষ্ঠানাদি করেন মানুষের মঙ্গলের জন্য। এঁদের মন্ত্র স্থানীয় ভাষায় রচিত। এই মন্ত্রের ভাষায় অশ্লীলতা প্রযুক্ত হওয়ায় শিক্ষিত অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা সুনজরে দেখেন না বা চর্চা করেন না।

অবশ্য সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের তকমা নিয়ে পুরোহিতরা যখন উচ্চস্তরে উঠে গেল তখনও গুণিনরা তাঁদের নিরপক্ষেতা দিয়ে, দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের অধীত বিদ্যা শুধু যে ধারণ করে রাখলেন তাই নয়, উচ্চশ্রেণীর পরাক্রান্ত পদ্ধতির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাহীন ব্যক্তি বা ব্যষ্টির এই বিদ্যা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে, দৃপ্ত পদক্ষেপে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এলেন। দুরধিগম্য ও তিমিরাচ্ছন্ন স্থান, গহন ও অন্তর্লোক যা সর্বসাধারণের চোখের আড়াল সেখানেই তাঁদের সাধন-প্রণালী চলতে থাকে। কিন্তু কোনো বিদ্যাচর্চা তা সে প্রকাশ্যে হোক আর অন্তরীক্ষে হোক যখন তার সুপ্ত আদর্শ মুকুলিত হয় তখন তা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্শ না-করে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ফলে বহু বিচিত্র সহাবস্থান এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার লোকায়ত ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এঁরা সমাজে একটা বিশেষ স্থান লাভ করে নিয়েছেন, যার পরিবর্তিত ও পরিণতরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে ভাবী বংশধরদের উপর আবর্তিত হয়েছে।

সুন্দরবনে যেসব জাতি বা সম্প্রদায় আছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, মাহিষ্য, কৈবর্ত্য, কাপালিক, কায়স্থ, জেলে, তাঁতি, ডোম,

বাগদী, ভূঁইমালি, মুচি, কামার, কাহার, কুমোর, ভাষা, ধোপা, মালো, তিলি, ভুঁইয়া, নাথ-যোগী, নাপিত, বৈষ্ণব, ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান, মুসলমান, মুণ্ডা, মাহালি, সাঁওতাল, মাঝি, ভূমিজ ইত্যাদি-ইত্যাদির মধ্যেও যেমন বিভিন্ন গুণিন আছেন, তেমনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁদের বৃত্তি বিভিন্ন হতে পারে, এমনকি বিভিন্ন হতে পারে তাঁদের বিদ্যা-বিনিয়োগ পদ্ধতি ; কিন্তু বিশ্বাসের মাত্রা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। যদিও জাতি ও সম্প্রদায় বিশেষ উচ্চস্তর জাতিগোষ্ঠী স্বাভাবিক কারণে সামাজিক মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা বেশি পেয়ে থাকেন। নিম্নে গুণিনদের শ্রেণী ভিত্তিক সামাজিক মর্যাদার একটি চিত্র দেওয়া হলো :

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ মর্যাদা	জাতি ও সম্প্রদায়
১.	উচ্চতম	ব্রাহ্মণ
২.	উচ্চ	কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, কামার, কুমোর, তিলি, ভুঁইয়া, তাঁতি, কৈবর্ত্য, গোপ / গোয়ালা।
৩.	নিম্ন	পৌণ্ড্র / পোদ, রাজবংশী, ধোপা, দুলে, বাগদী, ভাষা, নমঃশূদ্র, জেলে, কাপালিক, ভুঁইমালি, মাঝি, মালো।
৪.	নিম্নতম	হাড়ি, মুচি, ডোম, তিয়র, কাহার / কাওরা, শুড়ি, নাথ / যোগী।
৫.	বিভিন্ন আদিবাসী জাতি	সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহাত, ওঁরাও, ভূমিজ, মাহালী।
৬.	বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়	মুসলমান, খ্রীস্টান, বৈষ্ণব।

আবার এই জাতি বা সম্প্রদায়ের ক্রমগুলি নিম্নরূপ। বলা বাহুল্য এই ক্রম নিরূপিত হয়েছে সুন্দরবনে উক্ত জাতি বা সম্প্রদায়ের বসতির মোট জন সংখ্যার ভিত্তিতে।

প্রথম—পোদ	ষষ্ঠ—মুচি	একাদশ-তিওর
দ্বিতীয়—নমঃশূদ্র	সপ্তম—ধোপা	দ্বাদশ—মালো
তৃতীয়—বাগদী	অষ্টম—ভুঁইয়া	ত্রয়োদশ—শুড়ি
চতুর্থ—রাজবংশী	নবম—জেলে	এবং অপরাপর
পঞ্চম—কাওরা	দশম—হাড়ি	সম্প্রদায় ও জাতি মিলে বাকিরা,

অর্থাৎ উপরি-উক্ত চিত্রের যথাক্রম পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্রমিক সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত মানুষ, এঁদের মধ্যে বড় গুণিন ও ছোট গুণিন মিলে শতকরা হিসাবে প্রতি একশ জনের মধ্যে দশজন বর্তমান।

এই যে বর্ণ সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে সুন্দরবন এলাকায় এঁরা প্রত্যেকেই গুণিন বা

ওঝা, মউলে বা বাউলের পেশায় নিযুক্ত নন। মন্ত্রতন্ত্র জানা একশর মধ্যে একজন হয়ত বা গুণিন বৃত্তি অবলম্বন করেন। আসলে নোনা অধ্যুষিত এক ফসলি সুন্দরবনে নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগী বা পেশায় নিযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল। চাষী, জেলে, তাঁতি, ঘরামি, কামার, কুমোর, মাঝি, সাঁওতাল, মুণ্ডা--যে যার নিজের কাজ করার অবসরে মন্ত্রতন্ত্রের চর্চা করে থাকেন। একজন মানুষ একাধিক রকমের কাজও করেন, অর্থাৎ একজন চাষী শীত এবং বর্ষার মরসুমে তাঁদের প্রধানকাজ চাষ-আবাদ সারার পর বাকি মরসুমে সুন্দরবনের গহীন জঙ্গলে বা নদী-খাঁড়িতে মধু-মাছ-কাঠ-কাঁকড়া সংগ্রহ করতে যান, ঘরামি বা মাঝি গিরি করেন, অথবা অন্যত্র 'মুনিষ' খাটতে যান। সুন্দরবন এমন এক অঞ্চল যেখানে সারা বছর কাজ খুঁজে পাওয়া যেমন বিরল ঘটনা তেমনি আবার নিম্নবিত্ত বা শূণ্যভোগী মানুষের নিদিষ্ট কোনো কাজই নেই, কাজের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়নি। সভ্যতার ঘোমটার আঁধারটুকু আজও অপসারিত হলো না। কেবল ঐতিহ্যসূত্রে এবং ব্যবহারিক-পারিবারিক প্রয়োজনে, বাপ-ঠাকুরদারদের 'গুণ-বিদ্যা' বা গুপ্ত-বিদ্যা চর্চা ও বিনিয়োগ করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

তথ্যসূত্র

১. আবদুস সাত্তার—অরণ্যসংস্কৃতি : ধর্ম ও বিশ্বাস। পৃঃ ৫৭-৬৭, ১৯৭৭।

২. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১৯৬৭

৩. Dicrector of consus operations of West Bengal and Sikhim—১৯৭১, ১৯৮১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২ : ১ মন্ত্রের উৎস, সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

আদিম মানুষের মনে 'মন্ত্রের' উদ্ভব হয় আর পাঁচটি ব্যবহারিক সৃজনশীল শিল্প মাধ্যমগুলি যেমন নৃত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, পুরাণ-গল্প-কথা ইত্যাদি যে-কারণে সেই একই প্রত্যয়ে। অর্থাৎ, মানুষের বেঁচে থাকার জন্য শিকার-সংগ্রহের অনিবার্য অনু-ভাবনায় এবং একই সঙ্গে আত্মরক্ষার দুর্দমনীয় তাগিদে। দুর্লঙঘ্য সমুদ্র-পর্বত-মরু, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, বহু বিচিত্রময়ী প্রকৃতির নরম ও ভয়াল প্রতিমূর্তি, দেব-দানব-ভূত-প্রেত প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তি সমূহ, নানাবিধ রোগ-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতির মধ্যে একান্তভাবে টিকে থাকবার অন্যতম রসদ হিসাবে আবিষ্কৃত হয়েছে মন্ত্রের।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার কার্য-কারণ পারম্পর্যের উপর স্বাভাবিক বিশ্বাস থেকে সঞ্জাত যে যুক্তিগ্রাহ্য প্রবণতা বা সূত্র নির্গত হয়, তার উপর আস্থা জ্ঞাপন করা মানুষের চিরকালের স্বভাব। স্বভাবের এই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাই মানুষকে পরিচালিত করেছে জীবন-সংগ্রামের হাতিয়ার অনুসন্ধানে। মন্ত্রও জীবন যুদ্ধের এক ধরনের হাতিয়ার। সেই আদিম শিকার ও সংগ্রহ-নির্ভর সমাজ থেকে শুরু করে উত্তর কালীন পশুচারণ সমাজ এবং আরো পরবর্তীকালের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বা নির্ভরশীল শ্রেণীসমাজ একের পর এক পেরিয়ে আসার সময়ও কখনই মানুষ এই অমোঘ-অস্ত্রটি হাতছাড়া করেনি। বরং এর সাহায্যে সর্ব-কার্যোদ্ধার করার চেষ্টা করেছে।

সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনের স্তর পারম্পর্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধি বৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন সর্বদা ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে একই নিয়মে সংঘটিত না হলেও লুইন হেনরী মর্গান, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, ভি গর্ডন-চাইল্ড প্রমুখ দেখিয়েছেন—বন্য, বর্বর ও সভ্য এই তিনটি প্রধান স্তর পর্যায়ের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি-প্রজাতি, গোষ্ঠী-কোম ধীরে ধীরে অগ্রগমন করে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, বন্যস্তরে মন্ত্রের সূত্রপাত ঘটলেও বর্বরস্তরেই এর সমূহ বিকাশ। আদিম মানুষের ধর্মানুভূতির যে প্রধান তিনটি সূত্র অর্থাৎ জাদু-শক্তি, দৈব-শক্তি ও বস্তু বা প্রাণীর অন্তর্লীন শক্তি বা ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যয়-প্রতীতি ও আস্থা-জ্ঞাপন, তা মন্ত্রের মধ্যেও অচ্ছেদ্যভাবে বিরাজমান। শুধু আমাদের দেশেই নয়, হাজার-হাজার বছর পূর্বে রোম-গ্রীস-মিশর এবং সভ্যতার অপরাপর পীঠস্থানগুলিতেও মন্ত্রবিশ্বাসের প্রতি মানুষের নিগূঢ় আস্থাজ্ঞাপক সমর্থনের প্রমাণ পাওয়া গেছে সমাজ-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। যদিও, অতি-অবশ্যই পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অবস্থান, সভ্যতার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মন্ত্রের উৎপত্তির কারণ ও তার ব্যবহারিক-চারিত্রিক রূপের অনেক রদ বদল হয়েছে। কোনো কোনো যুগে মন্ত্রের ব্যবহার হয়েছে ব্যাপক আবার কোনো কোনো যুগে হয়তবা স্বল্প। কিন্তু মানব সমাজ থেকে নিরঙ্কুশভাবে এর বিলুপ্তি ঘটান সম্ভব হয়নি। যুগ ও

জীবনের চাহিদার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক গুরুত্বও সমান্তরালভাবে জড়িয়ে গেছে। হাজার-হাজার বছরের কালানুক্রমনে বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী-কোমের মধ্যে কত প্রকারের এবং কত সংখ্যক মন্ত্রের উৎপত্তি ও বিনিয়োগ হয়েছে তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া আজ প্রায় অসম্ভব। মন্ত্রের অপার রহস্য মহাকাশ বা মহাসমুদ্রের মতো অনন্ত, বহু বিচিত্র। যাগ-যজ্ঞ, পূজা-প্রার্থনায় মন্ত্রের মাধ্যমে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল কামনা যাই করা হোক না কেন, দৈবশক্তির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে অথবা অস্বীকার করে, দেবতাকে দোহাই মেনে সেই দেবতারই বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার নজির সত্যই দুর্লভ। শুধু জেহাদ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত নয়, দেবতা বা অনুরূপ কোনো শক্তিকে নিজের আজ্ঞাবহ হতে বাধ্য করাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অথচ শুদ্ধ ও পবিত্র থেকে কিছু কিছু বিধি-বিধান ক্রিয়া-অনুষ্ঠান পালনে ব্রতী হয়েছে মানুষ একে কেন্দ্র করে। গুরু-গোষ্ঠী অধিপতি, পুরোহিত-গুণিন-ওঝা যিনি বা যাঁরাই এই মন্ত্র-ক্ষমতার ধারক-বাহক হন না কেন, মানুষের এই ধর্ম-চেতনাকে নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব!

মন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণের পূর্বে আমরা মন্ত্র সংশ্লিষ্ট তথা প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন ধরে রাখা অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্ত্রের নিগূঢ়তম অর্থ জেনে নিতে পারি।

১. অথর্ববেদ :

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অথর্ববেদের মূল্য অপরিসীম। ম্যাকডোনেল, ভিন্টারনিৎস, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০—২০০০অব্দ নাগাদ অথর্ববেদ রচিত। তবে এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখনীয় যে, অথর্ববেদ অন্তত ১২টি শাখায় বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে বর্তমানে যা 'অথর্ব সংহিতা' বলে পরিচিত। শৌনকীয় শাখায় অবলম্বিত মন্ত্র সংগ্রহ, যার অনেক মন্ত্রই বর্তমানের ঋক-সংহিতার সঙ্গে একই পৈপ্পলাদ বলে আর একটি শাখার অস্তিত্ব ওড়িশা থেকে কিছুকাল আগে মহা-মহোপাধ্যায় দুর্গামোহন ভট্টাচার্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে আথর্বীয় সাহিত্যের বয়স অবশ্য খুব নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। হরপ্পা-সংস্কৃতির সঙ্গে তার যোগের বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে। অতএব প্রাক-আর্য আমলের এমন একটি অভিধাই এ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হওয়া শ্রেয়।[১] এই অথর্ববেদ তথা অথর্ব-শব্দের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য মন্ত্রের গূঢ় অর্থ বর্তমান।

অথর্ববেদ আলোচনা প্রসঙ্গে এর মধ্যে একই সঙ্গে আমরা দুটি প্রধান বিষয় দেখতে পাই :

ক. অথর্ববেদ বৈদিক এবং অ-বৈদিক এই দুটি সভ্যতার প্রবাহমান ধারাকে একত্রভাবে বেণীবদ্ধ করেছে।

খ. প্রাগৈতিহাসিক যুগের মূল্যবান দলিল সমূহ বহন করে নিয়ে চলেছে উত্তরকালের দিকে, যার অন্তর্লীন উপজীব্য বিষয় আজ লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের আকর।

লক্ষণীয়, বৈদিক ত্রয়ী-সংহিতায় যে সকল বিদ্যা বা শক্তির কথা বলতে চেয়েও বলা

হয়নি, কেবলমাত্র আভাষ বা ইঙ্গিত দেওয়া আছে, অথর্ববেদে তাই মুখর। অন্যান্য বেদের সঙ্গে প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুণ এই বেদকে চতুর্বেদের অন্তর্ভুক্ত হতে বহু সময় অতিক্রম করতে হয়েছে। অথর্ববেদে মূলত যা আলোচিত অর্থাৎ কুহক বা ইন্দ্রজাল, ভেষজ বিজ্ঞান--তার সঙ্গে ত্রয়ীর সার্বিক বিষয়ের মিলের চেয়ে বরং অমিলটাই বেশি। অনস্বীকার্য যে, জীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয় দিকের পরিমার্জন যদি মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়, তাহলে মানব জীবনের পক্ষে যা গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারক বিষয় সমূহে সমৃদ্ধ সেই অথর্বকে ব্যতিরেকে ত্রয়ী-বেদ-বিদ্যার সম্পূর্ণতা কখনই সম্ভব নয়। মানব জীবনের যা কিছু কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার ব্রত নিয়েছিলেন বলেই আদিম আর্য-পূর্ব ধর্মের এই বিদ্যা বা শক্তিকে সুসভ্য যাযাবর শ্রেণীর আর্যরা তাঁদের পবিত্র যাগ-যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করতে দ্বিধা করে। যদিও ভারতীয় আর্যরা সুসভ্য হবার পূর্বেই এদেশীয়দের অর্থাৎ দ্রাবিড়সংস্পর্শে এসে অথর্ব বিদ্যাকে ব্যবহার করেছে। কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, শ্রৌত, গৃহ্য-ধর্ম-সূত্র, মহাকাব্য প্রভৃতি 'বেদ' বলে স্বীকার করে নেওয়ায় অথর্ববেদ 'চতুর্বেদ'-র পংক্তিতে উন্নীত হয়।

অথর্বকে চতুর্থ বা কনিষ্ঠ বেদ বলে গণ্য করা হলেও অথর্ব-নামটি কিন্তু বেদ-পদবাচ্য নয়। এর অর্থ হলো স্থবির বা অতিবৃদ্ধ। সুপ্রাচীন কালের বৃদ্ধের জ্ঞান সম্বলিত গ্রন্থই অথর্ববেদ, যার মধ্যে আদিম-সংস্কার-বিশ্বাস বর্তমান এবং তা সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে হিন্দু-সংস্কৃতিতে ঠাঁই পায়নি। যদিও ভারতবর্ষে তুর্কী-আফগান আক্রমণের পর ইতিহাসের বিরাটতম বিপর্যয় এলে নিরূপায় সমাজপতিরা শূদ্র-দাস-শাস্ত্রকে অর্থাৎ অথর্বকে মেনে নিতে বাধ্য হন। আর্যদের যাগ-যজ্ঞ সম্বলিত ধর্ম-কুহককে অতিক্রম করে এই অথর্ববেদেরই মাধ্যমে গার্হস্থ্য-ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনের আচার-বিচার, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, রাষ্ট্র-সমাজ, গোষ্ঠী-কোম, শিক্ষা-দর্শন ও অর্থনীতির পরিচয় চিরকাল ধরেই প্রবহমান। আসলে অথর্ববেদ কুহক, মন্ত্রতন্ত্র, ইন্দ্রজাল, অভিচারের বেদ হিসেবে সমাজ বা গোষ্ঠীতে সুরক্ষিত ছিল যখন ধর্ম সম্পর্কে মানুষের ধারণা হয়েছে উন্নত। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, যাগ, বিভিন্ন শরীরতত্ত্ব, দাম্পত্য জীবন, অধ্যাত্ম তত্ত্ব ইত্যাদি যদি সাহিত্য পদবাচ্যরূপে বিবেচিত হয়, তাহলে বলা যায়, ভারতীয় বিজ্ঞান ও কলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় এই বেদেরই মধ্যে সংরক্ষিত।

অতঃপর অথর্ববেদ সম্পর্কে আলোচিত নিম্নলিখিত মতগুলি সন্নিবেশিত হলো :

ক. অথর্ববেদ বলতে 'অর্থবন' বা 'অথর্বন' বলা হয় যা জাদু-মন্ত্রের জ্ঞান বিশিষ্ট বেদ বা সংহিতা। প্রথমে 'অর্থবন' বুঝান হতো অগ্নি বা অগ্নি-উপাসক পুরোহিত-জাদুকর বা অথর্বের অর্থাৎ প্রবীণদের মন্ত্রতন্ত্র ও কুহক।

খ. অথর্ববেদের প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস' = অথর্ব + আঙ্গিরাঃ। অথর্ব এবং আঙ্গিরা নামক ঋষিদের যে সংহিতা তাই অথর্বাঙ্গিরা বা অথর্বাঙ্গিরস বা অথর্ব বেদ।

গ. 'অথর্ব' শব্দের অর্থ যেমন মন্ত্র, জাদু বা কুহক তেমনি 'আঙ্গিরা' অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগ্নিপ্রজ্জ্বালক ঋষি বা পুরোহিত। পরবর্তীকালে এর অর্থ দাঁড়ায় মন্ত্রতন্ত্র বা ইন্দ্রজাল। আবার পৃথক পৃথক ভাবে 'অথর্বন' ও 'আঙ্গিরস' দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর

ইন্দ্রজাল বা কুহক রূপে নির্দিষ্ট।

ঘ. 'অথর্বন'-এ যে সমস্ত মন্ত্রতন্ত্র সন্নিবেশিত হয়েছে তা শুভঙ্কর বা মঙ্গলময় মন্ত্র। তার বিনিয়োগ সমাজ তথা মানুষের জীবনে আসে আরোগ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি। এই সমস্ত মন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষ করে বলা হয়েছে ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার বা সুস্থ হয়ে উঠবার উপায় বা পথ।

ঙ. 'অঙ্গিরস' মন্ত্রগুলি মূলত ক্ষতিকারক। মারণ, উচাটন, বশীকরণাদি অভিচার সম্বলিত কুহক ইত্যাদি এর মুখ্য উপজীব্য। 'অঙ্গিরস' বা 'অঙ্গিরা' অংশের মন্ত্রে আছে শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, কু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ঐন্দ্রজালিক এবং এই জাতীয় লোকের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অভিশাপ ও অভিচার সমূহের অনুষ্ঠান। এই 'অর্থবন' এবং 'অঙ্গির' উভয়ে মিলে 'অথর্বন সংহিতা' অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রের বেদ বা অথর্ববেদ।

২. ব্রাহ্মণ :

বেদ বা সংহিতার পরবর্তী স্তরের গ্রন্থগুলি 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। সায়ন ভাষ্য অনুসারে ব্রাহ্মণ শব্দের আদি অর্থ মন্ত্র—অলৌকিক শক্তিযুক্ত মন্ত্র। তাঁর কাছে 'ব্রহ্ম' কলিপ্ত হয়েছে 'স্তোত্র' রূপে। যদিও, 'ব্রহ্ম' অর্থে বলা হয়েছে পরম চৈতন্য-বিরূপ বিশ্ব সত্তা। ভারতীয় দর্শনে ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ ঈশ্বর বা পরমাত্মা—যার রূপ নাই, গুণ নাই, যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বময় রূপে চিন্তিত হয়েছেন।

আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির দ্যোতক, অপ্রাকৃত শক্তি বা mana শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। ম্যানা-ম্যানিটো-ব্রহ্ম সবই নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। যাবতীয় মন্ত্রে এই শক্তিই পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রহ্ম অর্থে অলৌকিক শক্তিকে চিহ্নিত করলেও তৃতীয় পর্যায়ে ব্রহ্ম কল্পিত হয়েছেন সকল দেবের সর্ব শক্তির মূলাধার রূপে। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে ব্রহ্ম হয়েছেন সৃষ্টির পশ্চাতে ক্রিয়াশীল এবং অমোঘ মহাশক্তি।

৩. তন্ত্রশাস্ত্র :

তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ 'শক্তি'কেই 'মন্ত্র' বলেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র মতে :

"মননাৎ সর্বভাবানাং ত্রানাৎ সংসার সাগরাৎ।

মন্ত্ররূপা হিতচ্ছক্তিঃ মননত্রাণ রূপিণী।।"

অর্থাৎ মনের সমস্ত ভাবের মনন এবং সমস্ত সংসার হতে ত্রাণ করার সামর্থ্য যোগ্য মনন-ত্রাণ-রূপিণী শক্তিকে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত করা হয়।[২] আবার, 'তন্ত্র ও আগম শাস্ত্র'[৩]-র তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মন্ত্রকে বলা হয়েছে ক্রিয়া বা করণ। আর মন্ত্রজ্ঞ বা মন্ত্র বিশারদকে বলা হয়েছে কর্তা বা মন্ত্রেশ্বর। মন্ত্রেশ্বর হলেন গুরু পদবাচ্য। জীবোদ্ধার বিষয়ে গুরুর কাজ করে থাকেন। আর যে-করণের দ্বারা মন্ত্রেশ্বর রূপী গুরু জীবোদ্ধার কার্য সম্পাদন করেন তাই হল 'মন্ত্র'। অপরদিকে 'তন্ত্রতত্ত্ব'[৪] গ্রন্থে মন্ত্রকে বলা হয়েছে—শব্দব্রহ্ম স্বরূপিণী চৈতন্যময়ী কুলকুণ্ডলিনীরই স্বরূপ বিভূতি। উক্ত গ্রন্থানুসারে মন্ত্র মনুষ্য সৃষ্ট নয়, কেউ সৃষ্টি করেন নি। স্বয়ম্ভু। নিখিল অন্তশ্চারিণী বর্ণনিনাদিনী ধ্বনিস্বরূপিণী নিত্যসিদ্ধ প্রত্যক্ষ দেবতা এবং অমোঘ

শক্তি বিশেষ। এই অমোঘ শক্তি বা ক্রিয়া বা করণ এর উপর আস্থা ও নির্ভরতা মানুষের চিরকালের চিরদিনের।

আভিধানিক দিক থেকে মন্ত্র-র সংজ্ঞা নির্ণয় করা যেতে পারে।

মন্ত্র পুং মন্ত্র + অ (অচ্)-ভা—অর্থাৎ মন্ত্র হচ্ছে :

ক. গুপ্ত-পরিভাষণ, নিভৃতে কর্তব্যাধারণ।

খ, গুঢ় বিষয়, রহস্য, গুপ্তকথন।

গ. ঋক-সাম-যজু এই ত্রিবিধ মন্ত্রাত্মক বেদ বিশেষ।

ঘ. দেবতাদির সাধনার্থ তন্ত্রাদি কথিত শব্দভেদ।

ঙ. দীক্ষায় জপার্থ গুরুদত্ত বীজ।[৫]

চ. বেদের অংশ—দেবদেবীর উপাসনার উপযোগী বাক্য।

ছ. যে কোনো জীবের বা প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বিষয়ের বশীকরণ সাধক বাক্য।[৬]

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে আদিম সমাজে মন্ত্রের উৎস অনুসন্ধানে শাস্ত্রীয় অর্থাৎ বৈদিক-ব্রাহ্মণ-তন্ত্র প্রভৃতি ও আভিধানিক ইত্যাদি প্রসঙ্গে মন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত ও তাৎপর্যগত বিচারে নানাবিধ ব্যাখ্যা প্রচলিত। আমরা কোনো জটিলতার মধ্যে না গিয়েও যথাসম্ভব সমস্ত ভাবার্থ গুলিকে একত্র করে বলতে পারি : **মন্ত্র হলো—সকল জীব, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত বিষয়ের রহস্যময় অথবা উদ্‌ঘাটিত, অচিন্ত্য ও অমোঘ শক্তি যা গোপনে বা নিভৃতে অনুশীলন ও সম্পাদনযোগ্য, জপ্য, উচ্চারিতব্য, ইষ্ট-প্রতীক বা গূঢ়ার্থক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ অথচ দ্রুত অভিষ্ট সিদ্ধির পরিপূরক তথা পরিচায়ক।**

'অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং' ইত্যাদি ঋকসূক্ত থেকে সুরু করে "কার আজ্ঞে কামরূপ কামাক্ষা হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে" ইত্যাদি লৌকিক বাংলা-মন্ত্র কত-বিষয়ের কত-প্রকারের মন্ত্র যে আছে তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তকে কেন্দ্র করে মন্ত্র-র সৃষ্টি হয়েছে। আদিম কাল থেকে শুরু করে 'সভ্য' আমল অবধি যত বিষয়ের এবং যত ধরনের মন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, সমস্ত মন্ত্রকে শ্রেণীগতভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়

ক. শাস্ত্রীয় মন্ত্র।

খ. লৌকিক মন্ত্র।

বিষয় বস্তুর দিক থেকে মন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক [নিত্য-নৈমিত্তিক পূজার্চ্চনায় ব্যবহৃত], আভ্যুদয়িক [অথর্ববেদে বর্ণিত আয়ুস্য, ভৈষজ্য, শান্তি, গোষ্ঠিক, সংমাদস্য], শত্রু বা বিরোধী শক্তি নাশমূলক পর্যায়ে বিভক্ত করা গেলেও তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণ তন্ত্রশাস্ত্রের চক্রবিচারক্রমে মন্ত্রকে চারভাগে ভাগ করেছেন :

ক. সিদ্ধ বা বান্ধব মন্ত্র।

খ. সাধ্য বা সেবক মন্ত্র।

গ. সু-সিদ্ধ বা পোষক মন্ত্র।

ঘ. রিপু, অগরি বা ঘাতক মন্ত্র।

আমাদের আলোচ্য বর্তমান নিবন্ধ পত্রের উপজীব্য সমস্ত লৌকিক মন্ত্রকে চারভাগে

ভাগ করতে পারি :

ক. শুভকারক বা মঙ্গলজনক মন্ত্র। অথর্ব-সংহিতায় যে সকল মন্ত্রকে 'অথর্বন' নামে বিভক্ত করা হয়েছে।

খ. অশুভকারকমন্ত্র বা ডাইনী বিদ্যা। এই সকল মন্ত্রকে অথর্ববেদে 'অঙ্গিরা' বা 'অঙ্গি রস' শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

গ. প্রতিরোধক বা আত্মরক্ষামূলক মন্ত্র।

ঘ. নিরাময়মূলক মন্ত্র।

চতুর্বিধ উপবি-উক্ত বাংলা লৌকিক মন্ত্রকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

ক. শুভকারক বা মঙ্গলজনক মন্ত্র : ১. কৃষি ও সকলরকম উর্বরতা মূলক। ২. বৃষ্টি আনয়ন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কার্য সংঘটনের জন্য মন্ত্র। ৩. প্রেম সংঘটন বা মিলন সংঘটনের মন্ত্র। ৪. যাত্রা বা ভ্রমণ বিষয়ক, নৌকা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মন্ত্র। ৫. প্রকৃতির ভয়ঙ্করী লীলাকে আয়ত্তে আনার জন্য মন্ত্র। ৬. শিকার, মাছধরা বা সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ের মন্ত্র।

খ. অশুভ কারক মন্ত্র বা ডাইনী বিদ্যা : ১. ঝড়-প্লাবন-মহামারী ইত্যাদি পরিপোষক মন্ত্র। ২. সর্ব-বিধ সম্পত্তি ধ্বংসের মন্ত্র। ৩. রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি, বাণ মারা ইত্যাদি বিষয়ের মন্ত্র। ৪ জীবন নাশক মন্ত্র। ৫. ফসল বিনষ্টকারী মন্ত্র।

গ. প্রতিরোধক বা আত্মরক্ষামূলক মন্ত্র :

১. সাপ ও বিভিন্ন দংশন বিষয়ক মন্ত্র। ২. বিভিন্ন কাঁটা ফোটা, কেটে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ের মন্ত্র। ৩. বাঘ-ভাল্লুক, কামোট-কুমির ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ও জঙ্গল-নদী-সমুদ্র জঙ্গলে বিষয়ক মন্ত্র। ৪. ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানা, ডান-ডাকিনী ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক বা উপদেবতা বিষয়ক মন্ত্র। ৫. অপরাপর যেকোনো প্রাণী সংক্রান্ত মন্ত্র। ৬. শত্রু নিধন, সমস্ত রকমের নিরাপত্তা, বিপদ এড়ান, সম্পত্তি রক্ষার মন্ত্র। ৭ রোগ-ব্যাধি নিবারণ মন্ত্র ইত্যাদি।

আবার ৫নং বিষয় অর্থাৎ অপরাপর যে কোন প্রাণী বিষয়ক মন্ত্র সমূহকে যথাক্রমে ভাগ করতে পারি : ১. জলচর প্রাণী ২. স্থলচর প্রাণী ৩. উভচর প্রাণী ৪. খেচর প্রাণী সংক্রান্ত মন্ত্র।

ঘ. নিরাময় মূলক মন্ত্র :

এই মন্ত্রকে যথাক্রমে ভাগ করা যেতে পারে : ১. দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় মূলক মন্ত্র। ২. ক্ষত-দংশন জনিত নিরাময়ের মন্ত্র। ৩. বাণ মারা বা যে কোনো ক্ষতি কারক বিষয়ের নিরাময় সংক্রান্ত মন্ত্র।

প্রতিরোধ মূলক ও নিরাময় মূলক মন্ত্র উভয়ে প্রায় সমার্থক হলেও মন্ত্র বৈচিত্র্যের দিক থেকেই যে পৃথক তা চিত্র নং ৪ দেখে প্রতীয়মান হবে। অবশ্য এই চিত্র বা উপরি-উক্ত সমস্ত বিভাজনই শেষ কথা নয়। এইসব বিভাজনেরও একাধিক বিভাগ, উপ-বিভাগ থাকা স্বাভাবিক। সমগ্র বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখান হল।

চিত্র নং—৪

মন্ত্র
শাস্ত্রীয় / বৈদিক
লৌকিক
শুভকারক / মঙ্গলজনক
অশুভ কারক / ডাইনী বিদ্যা
প্রতিরোধক / আত্মরক্ষা মূলক
নিরাময় মূলক
কৃষি ও সকলরকম উর্বরতামূলক মন্ত্র
বৃষ্টি আনার মন্ত্র
প্রেম সংঘটন মূলক মন্ত্র
যাত্রা বিষয়ক, ভ্রমণ, নৌকা-বাওয়া ইত্যাদির মন্ত্র
প্রকৃতির ভয়ঙ্করী লীলাকে আয়ত্তে আনার মন্ত্র
শিকার, মাছধরা ইত্যাদি সম্পর্কিত মন্ত্র
দুরারোগ্য ব্যাধি
ক্ষত, দংশন ইত্যাদি
বাণ মারা বা কোন ক্ষতি-কারক বিষয়ের নিরাময়
ঝড়-প্লাবন আনার মন্ত্র
সম্পত্তি ধ্বংসের মন্ত্র
রোগ-ব্যাধি সৃষ্টির মন্ত্র
জীবন নাশক মন্ত্র
ফসল বিনষ্ট মন্ত্র
সাপ ও বিভিন্ন প্রাণীর দংশন
কাঁটা ফোটা, কেটে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ক মন্ত্র
বাঘ-ভালুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নদী-সমুদ্র-জঙ্গল বিষয়ক
ভূত-প্রেত, দানা-দৈত্য ডান-ডাকিনী ইত্যাদি রক্ষার মন্ত্র ইত্যাদি।
অন্যান্য প্রাণী
শত্রু নিধন, নিরাপত্তা বা বিপদ এড়ান, সম্পত্তি রক্ষা সংক্রান্ত
রোগ, ব্যাধি নিবারক
জলচর
স্থলচর
উভচর
খেচর

অতঃপর বিভাগীয় প্রধান চতুষ্টয়ের উদাহরণ দেওয়া হল।

শুভকারক বা মঙ্গলজনক মন্ত্র :

১. শিকার বা ঠিক মন্ত্র

আদিম মানুষের শিকার ছিল আহার সংগ্রহের প্রধান শর্ত। শিকারের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা অনেক সমস্যার সমাধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। অরণ্যচারী গুহাবাসী মানুষ সহজ-শিকারের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতেন। সেই উপায়গুলি পরবর্তী কালে শিকারের মন্ত্র হিসাবে সমাজে টিকে আছে।

প্রাগৈতিহাসের নিদর্শন অথর্ববেদ-এ পশুপাখি শিকার যদিও জীবিকার মধ্যে পড়ে না, তবুও গৃহপালিত পশুকে জন্তু-জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়াস পেয়েছেন আদিম প্রপিতামহগণ। অথর্ববেদে জাল দিয়ে পাখি ধরাবার উল্লেখ আছে [৮/৮/৫, ১০/১/৩০]। জাল গোঁজে বা 'কীলকে' বাঁধা হতো। প্রসঙ্গক্রমে আমরা আমাদের সংগৃহীত লৌকিক মন্ত্র থেকে একটি শিকারের মন্ত্র পরিবেশন করছি। একটি ঢিল বা নুড়ি নিয়ে গুণিন অভিমন্ত্রিত করে শিকারের দিকে ছুঁড়ে মারেন।

উজনে গুণি সুজনে পুরি। যেখানের জানোয়ার সেখানে মারি।
আমার গুলি জানোয়ার ছাড়া ঘাস বোন বিবি আর শাজঙ্গলীর মাথা খাস,
কার আজ্ঞে—বড়পীর নচুরির আজ্ঞে অমুকের বগলে গে লাগগে।।[৭]

২. পাখি শিকারের মন্ত্র

নূতন মেটে-খোলায় পাখির ছবি এঁকে মন্ত্র পড়েন গুণিন বা শিকারী। উক্ত পবিত্র খোলা পাখির ঝাঁক নিরক্ষণ করে ছুঁড়ে মারেন। এই ধরনের ক্রিয়া করলে সমস্ত পাখি ফাঁদ, খোঁয়াড় বা জালের মধ্যে আসবে বলে বিশ্বাস।

প্রহরি স্মরণ আমি পাতিলাম বগী। চল চল বগী চল, দক্ষিণে চল, দক্ষিণে ধর।
তিন প্রহর রাতি চর। পক্ষীধর। ধরিস তো ধরিস। না ধরিস তো
কার্তিক-গণেশের মাথা নিস।। --আকাশ বেড়িয়ে মারিলাম বাণ।
কোন কোন বাণ। রামচন্দ্রের বাণ। চলিল পবন ভরে। কার আজ্ঞে
কামরূপ কামাক্ষার চণ্ডীর আজ্ঞে। শীঘ্র শীঘ্র লঙ্কা গাছে লাগ। ডালে লাগ।
পাতায় লাগ। মর্ত্যভূমি লাগ।। মন আদরের বান আইবড় মেয়ের গর্ভে জন্ম।
আদরে সুচলে পাখি, অগ্নিশেলে মারলাম আরি ঈশ্বর মহাদেবের বলে।
শোন শোন তোরে বলি গর্ভবেদনায় নারী আসুবেদী ডাকে নারী।
এই বলে চরৎপাখি মহাদেবের বরে চলে। ছাড়ি গেলা ধর্মাদার শুনিলা নন্দন।
কার আজ্ঞা কামরূপ কামাক্ষার আজ্ঞা।।[৮]

৩. তুফান বন্ধ

নদী বা সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় আদিম মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। বৈদিক সংহিতায় 'সমুদ্র' শব্দটি প্রায়শ 'সাগর', 'জলধি' ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত, নদী-সমুদ্রে পাড়ি জমানো প্রসঙ্গ অথর্ববেদেও বর্তমান। বাণিজ্য-ভ্রমণ-শিকার ইত্যাদি যে-প্রসঙ্গেই নদী বা সমুদ্রে যাওয়া হোক না কেন, সমুদ্রের ভয়াবহ ঢেউ ভীষণ শক্তিধর পুরুষকেও উদ্বিগ্ন করে। সে কারণে সমুদ্রকে শান্ত করার প্রয়াস সেই আদিম কাল থেকে আজও প্রবহমান।

'তুফান বন্ধ' মন্ত্রটি নৌকার গুলুইতে বলে নদীর জল নিয়ে মন্ত্র সিদ্ধ করে উক্ত জল গলুই দিয়ে নদীতে ফেলতে হবে।

পা মানে গটনে কালী। তুফান ভাঙ্গায় ডালি।
দহাই বাবা বদর আলী। গাঙ্গের তুফান হয়ে যারে পানি
দোহাই মা কালী (৩ বার)।।৯

অশুভকারক মন্ত্র বা ডাইনী বিদ্যা :

অশুভকারক মন্ত্র বা ডাইনী বিদ্যাকে 'যুক্তিসম্মত অবিশ্বাস', 'শয়তান বাদ', 'ঈশ্বরদ্রোহী', 'ধর্মদ্রোহী' এবং মানুষের অহিতকারী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই ধরনের মন্ত্র যাঁরা শেখেন, শেখান বা চর্চা করেন উভয়ই সমাজের চোখে শত্রু। প্রাচীন কালে শত্রু নিধন সহ বিবিধ বিষয়ে এই মন্ত্রের চর্চা হতো। বিভিন্ন সংহিতায় শত্রুকে হেনস্থা বা পর্যুদস্ত করার জন্য কুহক সিদ্ধ অস্ত্র বা মন্ত্র ব্যবহৃত হবার প্রসঙ্গ আছে। আমরা যে অভিচার মন্ত্রটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করছি তার নাম 'শক্তিশেল বাণ'।

শক্তিশেল বাণ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করতে যে উপকরণ সমূহ লাগে তা এইরকম : বিধে মাছের সুতো বা শিরা ও কাঁটা ; বাঁশ বা বাখারির তীর ধনুক ; মাটির পুতুল ও পায়রার ডিম ; লাল ফুল।

বাঁশের ধনুকে বিধে মাছের শিরা দিয়ে ছিলা বাঁধতে হবে। তীরের ফলা হবে উক্ত মাছের কাঁটা। পায়রার ডিম পুতুলকে দিতে হবে। লাল ফুলটি তীরের আগায় রেখে পুতুলের বুকে মারলে কার্যসিদ্ধ হবে।

ফুল তুলে মারি ফুলকুমারী লক্ষ্মণের মারি বুকে।
লক্ষ্মণের শক্তিশেল বাণ পড়ে গেল অমুকের বুকে।
মার (৩বার) ফুলমার অমুকের ঘাড়ে কার আজ্ঞে শ্মশানবাসী শিবের দহাই।
মা কালীর দহাই। জয় মা।।[১০]

প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষা মূলক মন্ত্র :

১. লক্ষ্মণ গণ্ডী

প্রয়োজন-পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী লক্ষ্মণ গণ্ডীর প্রয়োগ মাত্রা বিভিন্ন হয়। রোগী, রোগীর বাড়ি কিংবা নিজ গৃহ এমন কি আত্মরক্ষার জন্য গুণিনগণও 'লক্ষ্মণ গণ্ডীর' সাহায্যে একটা প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

নিম্নে সন্নিবেশিত 'লক্ষ্মণ গণ্ডী' মন্ত্রটি সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে যাঁরা মধু-মোম-মাছ-কাঠ শিকার বা সংগ্রহ করতে যান সেইসব বাউলিয়া-মউলেগণ ব্যবহার করেন। লোকালয়ে লক্ষ্মণ-গণ্ডী প্রয়োগ করার সময় উপকরণ হিসাবে লাগে উল্কিমাটি, সাদামাটি বা আলোমাটি এবং কাপড় আঁচলার টুকরো। কিন্তু জঙ্গলের বিষয়ে স্বতন্ত্র। জঙ্গলে লাগে মাত্র চার টুকরো মাটি। সেগুলো একত্র করে মন্ত্রসিদ্ধ বা পবিত্র করে নিতে হয়। যেখানে রাত্রির যাপন করা হবে সেখানে দাঁড়িয়ে চার টুকরো মাটি বা ঢেলা চার দিকে ছুঁড়ে মারতে হবে। উক্ত টুকরোগুলি যে স্থানে পড়বে সেখানে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে যে বৃত্ত অঙ্কিত হবে সেটাই 'লক্ষ্মণ গণ্ডী'। লক্ষ্মণ গণ্ডীতে অনেক সময় অবস্থানের সীমা নির্দেশক পরিমাণ বা আয়তনের উল্লেখ থাকে। যেমন--দুই রশি, দুই বাঁক ভর, সাত গাঙ ইত্যাদি।

ধনুকের স্থলে গণ্ডী দিলেন লক্ষ্মণ। রামচন্দ্রের সাক্ষী থাকে যত দেবগণ।
সূর্যগড়ের পাশে রামের ধনুক দ্বারে উপরে বিশ্বচক্র সদয় থাক প্রহরী।
উত্তর গড়ে দ্বারী থাক পর্বত হিমালয়। পূর্ব গড়ে দ্বারী থাক আলি আল্লা।
দক্ষিণ গড়ের দ্বারী থাক দেব পঞ্চানন। পশ্চিমে থাকেন দণ্ডী কাল দণ্ড শমন।
আমার এই গণ্ডীর মধ্যি ভূত-প্রেত দানব দূত বাও বাতাস ডান-ডাকিনী
বাঘ-বাঘিনী লক্ষ্মণের গণ্ডী রেখ। গণ্ডীর বাহিরে থেকো।
কার আজ্ঞে রাম লক্ষ্মণের সীতা দেবীর আজ্ঞে আমার এই গণ্ডী জঙ্গলের একবিঘে
সাই ঘর বিড়ে সাত দিন থাকগে।।[১১]

২. তাগা বন্ধন :

গ্রামময় কৃষি-প্রধান এদেশে প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে মানুষকে মাঠ-ঘাট-জঙ্গল-মরু-পর্বত-সমুদ্র সর্বত্রই কাজ করতে হয়। ফলে সাপ-বিছা বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ বা অনুরূপ প্রাণীর সম্মুখীন হতে হয়। এদের প্রতি ভয় কম-বেশি মানুষের চিরদিনের। যেসব হিংস্র ভয়াবহ জন্তু-জানোয়ার তাদের দংশন ও আঁচড়ে মানুষের শরীরে, গৃহপালিত পশু-পাখিদের শরীরে বিষক্রিয়া সঞ্চারিত করে অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের স্তব-স্তুতিতে বা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করতে চেয়েছে মানুষ সেই আদিম কাল থেকেই। এর জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র। অথর্ববেদে এর প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যেকোনো প্রকারে সাপ ও অন্যান্য প্রাণী কামড়ালে তার বিষ ক্রিয়া সর্বশরীরে যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে তার জন্যই তাগা বাঁধা হয়। তাগা বন্ধনকে 'ডোরবন্ধন' 'মোড়ক' ইত্যাদিও বলে থাকেন মন্ত্র-চিকিৎসকেরা। রোগীর শরীরে দড়ি, সুতা ইত্যাদি বেঁধে বা ধুলোর

মোড়কে তাগা বাঁধেন গুণিন।

তাগা তাগা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।	তিন দেবতা লাগ তাগা তুই তাগ ধর।।
শতকে ভারবিষ পান কর।	মন্দে আছে সুসুরে, ডুমুরে পুকুরে
উভকার দুই পা	সুসু মোরে ডংসেছে তাগা বেঁধে ঘরে যা।।
সুজন তাগা জাতে জানি।	তাগা ছুঁলে বিষ হয়ে যায় পানি।।
ধূলার মুচটে বাঁধিলাম লাল,	বাহা যাস বিষ তুই কাল।।
বিষ হাড়ে মাংসে রক্তে নাই সন্ধি	ঘা মুছে পায়ে বিষ করিয়াছি বন্ধি।।
ডাক দে বলে ডাকোবুড়ী মিশ মিশ	ধুলার মুচটে করিলাম নির্বিষ।।
অশ্বের পাতা চোচাকল	তাগা বাঁধিলাম লোহার শিকল।।
হাড় না ফোটে মাস না টোটে	হেট ছাড়া বিষ উপরে না ওঠে।।
হেট ছেড়ে বিষ উপরে যাস	তোর অষ্ট দেবতার মাথা খাস।।

কার আজ্ঞে—ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে।।[১২]

৩. আলসে মন্ত্র

সুন্দরবনের জঙ্গল-নির্ভর মানুষ যারা মাছ-মধু-মোম-কাঠ-গোলপাতা-কাঁকড়া ইত্যাদি নানাবিধ বস্তু বা বিষয় সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁদেরকে অতি অবশ্য গহন অরণ্যে যেতেই হয়। জঙ্গলে গেলে বিভিন্ন হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সম্মুখীন হওয়াটাও আশ্চর্য নয়, বরং স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের এড়িয়ে নিরাপদে কাম্য শিকার-সংগ্রহ দুঃসাধ্য। শক্তিতে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠাও মুশকিল। তখনই মন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। 'আলসে' সক্রিয় হলে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের শক্তি শিথিল হয়ে যায়। দাঁত-নখ-জিভ-চোয়াল ইত্যাদি অকেজো হয়ে পড়ে। অথর্ব-সংহিতায়ও এই ধরনের মন্ত্র বহুল পরিমাণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সংগৃহীত আলসে মন্ত্রটি সুন্দরবনের কাঠুরিয়া-বাউলিয়াগণ হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বিশেষত বাঘ-সাপের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন বেশি। আলসে মন্ত্রের সক্রিয়তায় তারা নির্জীব হয়ে পড়লে বাউলে-মউলে-কাঠুরিয়াগণ নিরাপদ-নিরাপত্তায় উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হন।

দুর্গা পাকায় সুতো মহম্মদ বুনে জাল	সেই জালে বন্দী আমি বনের যত বাঘ
লাফে আসে লাফে বন্দ	ধাপে আসে ধাপে বন্দ
বত্রিশ কোটি দন্ত বন্দ	জিহ্বার জিহ্বা বন্দ
বন্দ করি শিব	আজ সারা দিনির মদ্ধি তুই যদি হাত-পা নাড়িস
তবে দেখিস—	কার আজ্ঞে দোহাই মা বনবিবির আজ্ঞে

শিগ্‌গির কুরে লাগগে।।[১৩]

নিরাময় মূলক মন্ত্র :

নিরাময় মূলক মন্ত্র সাধারণত রোগ-ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আকুতিতে ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রের সাহয্যে মানুষ পাশবিক ও দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে, পরিশেষে সু-শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়।

১. ভস্ম মন্ত্র

দংশনে জর্জরিত ব্যক্তির শরীরের বিষ যাতে ভস্ম হয়ে যায়, রোগী শীঘ্র আরোগ্য লাভ করতে পারে তার জন্যই ভস্ম মন্ত্র। অথর্ব সংহিতায় ভস্ম মন্ত্রের ব্যবহারের উদাহরণও রয়েছে। আমাদের আলোচ্য ভস্মমন্ত্র সর্প দংশনের বিষ ভস্মের কারণেই ব্যবহৃত হয়।

কেলে হরি কৃষ্ণকালী কালদহের কুল। ডাল থাকিতে উপরে তার মূল।।
রক্তের খরষান বয়। কৃষ্ণের স্মরণে বিষ খ্যায় হয়ে যায়।।
গঙ্গাবলে দুর্গা তুমি বড়ই লঘু বিষ খেয়ে মরিয়াছে ঘরের প্রভু।
এক চক্ষু ঝুরে তার এক চক্ষু বিষ। ভস্ম যা ভস্ম যা কালকুটা চৌ সাপার বিষ।।
নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞায়। কৃষ্ণের স্মরণে বিষ ভস্ম হয়ে যায়।।[১৪]

২. গাঁটুলি কাটা বা জলসার মন্ত্র

চিকিৎসার পরও কোনো কারণে ক্ষত বা ঘা না সারলে সাধারণত আমরা বলি 'সেপটিক' হয়েছে। এমন ধরনের ক্ষত সম্পর্কে দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। সেপটিক অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষত নিরাময় করার এমন মন্ত্র অথর্ববেদেও প্রচুর সংকলিত। আমাদের গাঁ-দেশে এখনও এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন, কোন ক্ষত বা রোগ ইত্যাদি নিরাময় না হলে গাঁটুলি বা কয়েদ করা হয়েছে। ডাইনী বিদ্যার গুণে গাঁটুলি করা হয়। একে প্রতিহত করতে বিনিয়োগ হয় 'জলসার'। নীম-নিসিন্দির পাতা সিদ্ধ জল ক্ষতস্থানে ধারা ফেলে ধুতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বলতে হবে।

শোড়া গাছের দুম দুমনী বিষের নাম পুত্ত গাঁট গাঁটুলি করিয়ে বেটা আসতে না দেয় খেয়ে।
গাঁট ভাঙ্গি গোট ভাঙ্গি লোহার শিকল চৌষট্টি গাঁটুলি ভেঙে বিষ তুই ঘা মুখেতে নিচল।
কোন বেটা গাঁড়ল ওঝা ভার করে রেখেছে বাম পার লাথি তুলে মারি তার গুরু শিরে।
আয় বিষ তুই শতেক গাঁটুলি ছিঁড়ে নেই বিষ বিষ হরির আজ্ঞে
নেই বিষ মা মনসার আজ্ঞে।।[১৫]

৩. প্রসব বেদনায় জলপড়া মন্ত্র

আঘাটা হতে কাঁসার ঘটিতে করে জল এনে তা মন্ত্রসিদ্ধ করে রোগীকে খেতে দেন গুণিন। এমন কি সেই জল মাঝে মাঝে গায়েও মাখতে হয়। এইরকম করলে রোগীর

প্রসব জনিত বেদনার উপসম হয়।

বাদি ভেদি সর্ব খেদি দমে করি ভর দমে দমে আসকেতে জগৎ সংসার।
দম শক্তি নিদম পাহাড় এই দমেতে মরে মন সবাকার।
শক্তিতে শক্তি মিশে কত শক্তি পরাজয় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড বশ হয়।
অভিরাম গোঁসাই এর দণ্ডবাত মিথ্যে নয়। এই দণ্ডবাত ষাট হাজার পাষাণ গলে যায়।
দহাই অভিরাম গোঁসাই এর দহাই (৩বার)।।

ব্রহ্মা ব্রহ্মা জাল ব্রহ্মা হল বেতার কাল
আমি গরুড় চরণ ধেয়েন করি ফাঁপ ফুলো শুল ব্যথা পুঁছে মারি
ওরে ব্যথা বসে যা খারে রক্ত রক্ত খা ওরে ব্যথা।
যদি নড়িস চড়িস কালীর নাম স্মরণ করিস।
ওরে ব্যথা চেয়ে দ্যাখ কালীর চরণে ভস্ম হয়ে থাক।
কার আজ্ঞে দহাই মা কালীর আজ্ঞে অমুকের ব্যথা ভস্ম হয়ে যাকগে।
দোহাই তোমার (৩বার)।।[১৬]

লক্ষণীয় মন্ত্রে মন্ত্র-চিকিৎসক বা গুণিন কোনো না কোনো বিশেষ দেবতা কিংবা উপদেবতা ও অপদেবতা অথবা গুরুকে স্মরণ করে, কখনও আজ্ঞা মেনে, কখনও বা দোহাই দিয়ে ব্যক্তির শঙ্কা-সমস্যা মোচন করেছেন, কখনও বা রোগীর রোগ নিরাময়-এর জন্য দৈবশক্তি কিংবা অনুরূপ কোনো বিশেষ শক্তিকে নিয়োজিত করছেন, আজ্ঞাবহ করছেন। এই ধরনের কাজে একজনের হিতার্থে অন্যের অমঙ্গল হলেও সে-অমঙ্গলের জন্য গুণিন দ্বিধান্বিত নন। মন্ত্রবিদগণ সেই শক্তিকেই ডাকেন যারা তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে এবং তিনি যাদের আনুকূল্য লাভ থেকে কখনো বঞ্চিত হন না। উক্ত শক্তির কাছে রোগীর হয়ে কিংবা ব্যক্তি বা ব্যষ্টির হয়ে গুণিন যাবতীয় বক্তব্য পৌঁছে দেন। পরবর্তী যা করার সব উক্ত শক্তি বা দেবতাই করবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উপকরণ-উপাদান প্রয়োজন পড়লেও মন্ত্র শক্তি যে মূল সে বিষয়ে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

তথ্যসূত্র

১. পল্লব সেনগুপ্ত। অথর্ববেদের উৎস সন্ধানে। দৈনিক বসুমতী, শারদীয় সংখ্যা ১৯৩২।
২. গোপীনাথ কবিরাজ। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত—১ম। ২২৪ পৃষ্ঠা, ১৩৭৬।
৩. ঐ। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগদর্শন । ৩—৪ পৃষ্ঠা। ১৯৬৩।
৪. শিবচন্দ্র বিদ্যার্নব ভট্টাচার্য। তন্ত্রতত্ত্ব, ১৩৮৯।
৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ।
৬. রাজশেখর বসু। চলন্তিকা।
৭. মহাদেব মণ্ডল। পিতা—মৃত পাঁচুগোপাল মণ্ডল। বয়স-৪৫। গ্রাম + ডাকঘর-তারানগর। থানা—

গোসাবা, জেলা--দক্ষিণ ২৪ পরগণা। তপসিলী সম্প্রদায়, কাশ্যপ গোত্র। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা। মাসিক আয় ৪০০। পেশা--কৃষি। তাঁর কাছে মন্ত্র সংগ্রহের শেষ তারিখ ২৪.৩. ১৯৮৭।

৮. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৯. ঐ।

১০. ঐ।

১১. নগেন্দ্রনাথ বর্মন। পিতা--মৃত গঙ্গাহরি বর্মন। বয়স--৭২। গ্রাম + ডাকঘর--হরিশপুর। ভায়া--গোসাবা। জেলা--দক্ষিণ ২৪ পরগণা। তপসিলী, কাশ্যপ গোত্র। মাসিক আয় ২৫০। পেশা--গ্রামীণ ব্যবসা ও চাষাবাদ। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা। তাঁর কাছে মন্ত্র সংগ্রহের শেষ তারিখ ১৩. ১২. ১৯৮৪।

১২. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। পিতা--মৃত শৈলেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ৬৩ বছর বয়স। গ্রাম পাঠঘরা। ডাকঘর--যোগেশগঞ্জ। থানা--হিঙ্গলগঞ্জ। জেলা--উত্তর ২৪ পরগণা। তপসিলী সম্প্রদায়, কাশ্যপ গোত্র, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা। পেশা--দোকানদারী। মাসিক আয়--৫০০। তাঁর কাছে মন্ত্র সংগ্রহ করি ১২. ১১. ১৯৮৪ তারিখ।

১৩. পঞ্চানন কয়াল। পিতা--মৃত অধীরচন্দ্র কয়াল। ৫৫ বছর বয়স। গ্রাম--মাধবকাটি। ডাকঘর--যোগেশগঞ্জ। থানা--হিঙ্গলগঞ্জ। জেলা--উত্তর ২৪ পরগণা। তপসিলী। কাশ্যপ গোত্র। পড়াশুনা--অষ্টম শ্রেণী। পেশা--চাষাবাদ ও চিংড়িমাছ ধরা। মাসিক আয় ৪০০। তাঁর কাছে মন্ত্র সংগ্রহ করি ৩০. ৫. ১৯৮২ তারিখ।

১৪. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

১৫. নগেন্দ্রনাথ বর্মন। প্রাগুক্ত।

১৬. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২ : ২ মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও গঠন রীতি

ঋগ্বেদের ১০/৭১/৪ সংখ্যক সূক্তে বলা হয়েছে--কেউ কেউ ভাষাকে দেখেও দেখেনি, কেউ শুনেও শুনে না। আবার কারও কারও কাছে ভাষা নিজেকেই প্রকাশ করে। প্রশ্ন হলো ভাষা কি? এক কথায়, মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টি। এই ভাষা ব্যাপারটা এক দিনে আসেনি। মানুষের সামাজিক-প্রবৃত্তির তাড়নায় তথা প্রয়োজনের তাগিদে ভাষার উদ্ভব ও বিকাশলাভ করে। আদিম মানুষের কাছে বিভিন্ন সংকেত বা ধ্বনি সমষ্টি ছিল মুখ্য উপজীব্য। পরবর্তীকালে যখন ভাষার যথার্থ রূপ গড়ে উঠতে থাকে, তখন তার মোহময় শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে হতে সেই অনভিব্যক্ত ভাষায় ব্যবহার করতে শিখে ধ্বনিতরঙ্গের দোলা, সুরের উত্থান-পতন বা ঝোঁক. এমন কি ছন্দের কারুকাজও। আর তখন থেকেই কাজে অ-কাজে দৈবশক্তি তথা বস্তু বা প্রাণীর অন্তর্লীন শক্তিকে নিজের অনুকূলে পাবার আকাঙ্ক্ষায়, হিংস্র শক্তি ও শত্রুকে প্রতিহত করবার জন্যে ঝাড়-ফুঁকে, মন্ত্রে-ছড়ায়-গানে ছন্দকে টেনে বুনে বাক্‌শিল্পের আদি রূপের বিকাশ ঘটাতে থাকে। প্রাচীন মানুষের কাছেও ধ্বনি বা ছন্দ-ঝংকার সোম-সুরার মতনই মোহকর ছিল। আমাদের অধ্যাত্ম ইতিহাসে এবং সাহিত্য ইতিহাসের প্রথম থেকেই এইভাবে বাক্‌পথে মানব-মনীষার যাত্রারম্ভ হয় বাক্‌পথাতীতের অভিমুখে।[১]

ভাষার মুখ্য সম্পদ শব্দ বা শব্দভাণ্ডার। শব্দভাণ্ডারের গুণেই ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। যে-ভাষার শব্দভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ সে ভাষা তত শক্তিশালী। ভাষা বিজ্ঞানীরা আমাদের ভাষাকে মৌলিক এবং আগন্তুক এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। মৌলিক বলতে ভারতীয় আর্যভাষা হতে আগত সংগৃহীত ভাষা সমষ্টি, এবং আগন্তুক বলতে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়-সোমীয়-ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভৃতি শাখান্তর হতে আগত ও সংগৃহীত ভাষা সমষ্টি। বাংলা শব্দ জগত এই দুই শাখারই মিলনে-মিশ্রণে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। ভাষার এই বিভিন্নতা দেখা দেয় মানব গোষ্ঠীর বিভিন্নজাতি-উপজাতির সংমিশ্রণের জন্যই। বাংলা লৌকিক মন্ত্রের ভাষায়ও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে অনিবার্যভাবে ঠিক এইরকমই নানাবিধ জাতি-উপজাতি, আঞ্চলিক তথা প্রাদেশিক ভাষা উপস্থিত। সুন্দরবনের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও গঠন রীতি আলোচনার সূত্রপাতেই তাই ভাষা প্রসঙ্গে এটুকু সবিনয়ে নিবেদন করা গেল।

সুন্দরবন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশ-পরিমণ্ডলে অবস্থান করলেও, বর্তমান নিবন্ধ-পত্রের বিষয় পরিপ্রেক্ষিতে যতগুলি মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে তার সবগুলিই হলো বাংলা ভাষায় রচনা। অবশ্য মন্ত্রর তারতম্য অনুসারে, স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত-আরবী-তুর্কী-হিন্দী-ওড়িয়া প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত হয়েছে। আমাদের দেশ দেশি এবং বিদেশি শক্তির দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরে শাসিত হবার ফলে শাসকের ভাষা শাসিতের ভাষায় কিংবা বিপ্রতীপভাবে শাসিতের ভাষা শাসকের ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণ হয়ে গেছে।[২] বাংলায় রচিত এমনই সংমিশ্রিত ভাষার

কাঠামোতে মন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় যে তার স্থানে স্থানে হয়ে উঠেছে দারুণ দুর্বোধ্য ও অসঙ্গতিহীনতায় পূর্ণ। মন্ত্র যেন একটির পর একটি শব্দ সাজিয়ে অসংলগ্ন ছন্দবদ্ধ বা ছন্দহীন কিছু বাক্যালাপ কিংবা শব্দ-উচ্চারণ। মন্ত্রজ্ঞদের কাছে নিশ্চয়ই এসবের নিজস্ব একটা অর্থ আছে--থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু সে-সবের অর্থ আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়। মন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ মন্ত্রকে 'আদিমন্ত্র', 'বীজমন্ত্র', 'মহামন্ত্র', 'ঋষিবাক্য' ইত্যাদি বলে থাকেন। এমন সব বিশেষণ মন্ত্রের গুরুত্বকে অনেকখানি কৌলিন্য দিয়েছে সন্দেহ নেই, এবং সেই সঙ্গে এর সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চারিত শব্দ বা শব্দধ্বনির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শক্তি, মন্ত্র প্রয়োগকারী বা যার উপর মন্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই উভয়েরই ইচ্ছা শক্তির প্রক্রিয়া। দেব বা দেবকল্প অতিমানবীয় শক্তির প্রক্রিয়া ইত্যাদি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তার রহস্যময় কুজ্ঝটিকার আবরণ উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি, বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেড়েছে। উদাহরণ নেওয়া যাক :

ক. চাপড় সার : সাপের মন্ত্র

ওঁ খণ্ডে হাচুনী মুণ্ডে দা   ক্যানে কু গুল
পত্রে শুনিলাম মা---   মো যাইয়ে করবো কিশো
মারি চাপড় নাহি বিষ ওঁ।[৩]

সাপে কাটলে রোগীর বাড়ি থেকে গুণিন বা ওঝাকে ডাকতে পাঠানো হয়। গুণিন রোগীর বিবরণ শোনা মাত্রই সংবাদদাতার বুকে 'তিন চাপড়' মারেন। এবং পূর্ব উক্ত মন্ত্র পাঠ করেন। শেষ চাপড় অবশ্য বুক থেকে তুলে ব্রহ্মতালু বা মাথায় মারেন। 'চাপড় সার' প্রয়োগে দূর থেকেই রোগী বিষ মুক্ত হবে বলে গুণিন মনে করেন।

'চাপড় সার' করার পরও বিষ যাতে ক্ষতস্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে সেজন্য গুণিন বা ওঝা নিজের কাপড়ের খুঁটে গিঁট দিয়ে রাখেন বিশেষ মন্ত্র পাঠ সহ 'ফুঁ' দিয়ে।

খ. জল সুদুর : ভূত বিষয়ক মন্ত্র

কাঁসার জলপূর্ণ ঘটি অভিমন্ত্রিত করে সেই জল আমের পল্লব দিয়ে ছিটিয়ে রোগীর গায় দিলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে বলে সুন্দরবনের গুণিন সম্প্রদায় মনে করেন।

গঙ্গে চৈব গোদাবরী সরস্বতী ইন্দুকা সিন্ধুকা   বৈরী সং সান্তিলিনি করুণায় গান
ঘিং পুষ্পঘনিং শ সূর্য্য মম জগৎকরী   সন্ধে ভূতা পথো ক্রোধা পবনতঃ
পতি ভূসি কারা সং ক্ষত্রিকরা   ব্রহ্মানিং মাশানিং সস্তা ফলস্বি
ধনিশি নিযং ঐ সূর্য্য সহ সুঅংশে   বৈজৈরান্ত জগৎ পিপত্তি অস্ত কম্পা
মানভত্তা ত্রিণ ত্রিশৎ দিবাকরা।[৪]

এই সংস্কৃত মিশ্রিত মন্ত্র ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব জাত অবশ্যই। এ প্রসঙ্গে বাংলা মন্ত্রে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের মধ্যমভাগে।

উপরি-উক্ত 'চাপড় সার' ও 'জল সুদুর' মন্ত্র-এ সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। বাংলা লৌকিক মন্ত্রে এই রকম উদাহরণ আকছার পাওয়া যায়। বলা যেতে পারে, বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংমিশ্রণতাই বাংলা লৌকিক মন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে লৌকিক মন্ত্রের জটিলতা বা দুর্বোধ্যতা বেড়েছে বই কমেনি। এর

কারণগুলি নিম্নলিখিত সূত্র অবলম্বন করে অনুসন্ধান করা যেতে পারে :

ক. মানুষের মনে মন্ত্রের রহস্য সৃষ্টি করে নিজেকে (গুণিন) মান্য রূপে প্রতিষ্ঠা পাবার পথ কায়েম করা।

খ. একটি সুপরিকল্পিত পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল রচনা করা।

গ. মন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস উৎপন্ন করা, দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ঘ. সহজে সবাইকে মন্ত্রের ভাষা বুঝতে না দিয়ে সামঞ্জস্যহীন শব্দ ব্যবহারে হেঁয়ালির আবরণ দেওয়া।

ঙ. শ্রুতি থেকে বিস্ফরণ বা স্মৃতি-বিভ্রমের কারণে মূল শব্দের পরিবর্তে বিকৃত উচ্চারণ বা অসংলগ্ন শব্দের প্রয়োগে মিলিয়ে দেওয়া।

চ. গুণিনেরা সাধারণত স্বল্প-স্বাক্ষর, অর্ধ-শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হওয়ায় কালক্রমে, আদি-সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে যথার্থ রূপে ধরে রাখতে পারার অক্ষমতা।

ছ. প্রদেশ, অঞ্চল বা ভাষাভেদে শিষ্যান্তর হতে হতে মন্ত্রের সংযোজন, বর্জন, পরিমার্জন ইত্যাদি প্রবণতা।

জ. মন্ত্রকার অর্থাৎ ওঝা-গুণিনদের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না-পারা ইত্যাদি।

এইসব কারণে শাস্ত্রীয় মন্ত্রে বৈদগ্ধ্য, কবিত্ব বা বৈভব বাংলা লৌকিক মন্ত্রে অনুপস্থিত। কারণ :

ক. লোক মন্ত্রকারদের মধ্যে মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষির প্রতিরূপ সম্ভাবনা অপ্রত্যাশিত।

খ. যুগের জীবনবোধের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসে সঠিক পদবীক্ষণের অসামঞ্জস্যতাই তাঁদের দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে আমরা লৌকিক মন্ত্রকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করতে পারি :

ক. একপদী মন্ত্র

খ. পয়ার ছন্দে রচিত মন্ত্র

গ. ত্রিপদী ছন্দে রচিত মন্ত্র।

ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মন্ত্র।

ঙ. গদ্যে রচিত মন্ত্র।

বিভাজনের এই মাত্রা আরও প্রসারিত হতে পারে। অবশ্য লৌকিক মন্ত্রকারদের মন্ত্র রচনা করার সময় গঠন-বিন্যাসের প্রকরণ সংগ্রহ দৃষ্টি-মন পড়ে থেকেছে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় কাব্য-সাহিত্যের গভীরে। তাঁর সেখান থেকেই ছন্দ, ধ্বনি, অলংকার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন। এইসব পরিশীলিত বিষয় আদি স্তরে অ-কল্পনীয়। তাই আজও যে-সমস্ত মন্ত্র সৃষ্টি হচ্ছে, তার অধিকাংশই পয়ার-ত্রিপদী-অমিত্রাক্ষর এবং শব্দ চয়নে দুর্বোধ্যতার ঝোঁক অনেকটাই কম। অবশ্য একথা মানতেই হয়, মানুষ কোনো কালেই ছন্দের মোহময় ঝঙ্কারকে উপেক্ষা করতে পারেনি। পারেনি বলেই মন্ত্রের ব্যবহার সাপেক্ষে আবার নিম্নলিখিত ভাগাভাগি দেখতে পাই :

ক. কয়েকটি শব্দ সহযোগে গঠিত মন্ত্র।

খ. দুটি ছত্রের মন্ত্র।

গ. একটি স্তবকের মন্ত্র।

ঘ. দীর্ঘমন্ত্র।

ঙ. মিশ্রমন্ত্র। অর্থাৎ একই মন্ত্রের মধ্যে পয়ার, ত্রিপদী, গদ্য প্রতিটিই বর্তমান।

জঙ্গল বিষয়ক, ভূত বিষয়ক ইত্যাদি বিশেষ রকমের কিছু মন্ত্রের কথা ছেড়ে দিলে অধিকাংশ মন্ত্রই কাব্য আঙ্গিকে রচিত—বিশেষ করে পয়ারে, তাই তার ব্যবহারিক ভাঙানি যাই থাকুক না কেন। উদাহরণ

ক. একপদী মন্ত্র :

১. চিন্তকান্ত দন্ত কাঁচা আরে তু গিরা ছায়া।।[৫]

২. খিরমেরু ত্রিশূল মাল হররে ব্রহ্মাকপালে কালকূট সাপের বিষ।[৬]

উপরি-উক্ত মন্ত্র দুটি সাপে কাটা রোগ-চিকিৎসার 'রাইবলি ঝাড়ন' পর্বের মন্ত্র। একথা ঠিক যে, এখানে সামঞ্জস্যহীন শব্দ ব্যবহারে দুর্বোধ্যতা রয়েছে। কিন্তু খুব সহজেই গুণিনদের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, আনুগত্য স্থাপনের জন্য, সর্বোপরি মন্ত্রের কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও অর্থ গোপন রাখার জন্য হেঁয়ালির চাদর ঢাকা দিতে হয়েছে মন্ত্রের গায়ে। আসলে, অবিশ্বাসী, সন্দেহ বাতিক লোকের সঙ্গে ওঝা-গুণিনদের কাজ কারবার চলে না, চলা সম্ভব নয়। তাঁদের সতর্কবাণী—মন 'খাঁটি' না করলে মন্ত্র ক্রিয়া করে না, ভ্রষ্ট হয়। 'আগে মন কর খাঁটি' তার পরেই নেবে 'মাটি'।

প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি হেঁয়ালি জাতীয় মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি—

ক. চুটকি সার : সাপে কাটা

উত্তরেতে মেঘ করেছে মেঘ চাইতে পানি হল।
খা খা খা চাইতে অমুকের অঙ্গের বিষ মল।।[৭]

খ. চালান মন্ত্র : আতালকুর্সি, বনের দপে

কা বা কা বর্ব্বে কা
ফি কা আমি কা
মাল খাল খুয়ে দূর পাল্লায় যা।।[৮]

গ. চাপড় সার : সাপে কাটা

রক্তের চাপু-চাপু পরনেতে কাই।
কামড়াতে খেলি সাপা চাপড়েতে নাই।।[৯]

ঘ. স্মরণ মন্ত্র : আপন সারা

ইদার স্মরণং যাহা চাই তাহা পাই।
যদি খাই বিস্মরণং
আল্লা মহাদেবেরই দহাই।।[১০]

খ. পয়ার ছন্দে রচিত মন্ত্র :

ক. গড়বন্দী : কুকুর কামড়ান

খোপড়া খোপরী আইছি জানি।
অমুকের কাণ্ডের কুকুরির বিষ হয়ে গেল পানি।।[১১]

খ. উড়ান চাপড় : সাপে কাটা

ওরে বিষ ঠাঁই ওরে বিষ নীলা।
ওমুকের অঙ্গের যেইঠি খাইলু সেইঠি মিলা।।[১২]

গ. ব্রহ্ম চাপড় : সাপে কাটা

আমি গুরু প্যাকমম্বর কা শিষ।
খোদার আজ্ঞায় নাই বিষ।।[১৩]

ঘ. আলসে মন্ত্র : মৎস্য শিকার

হাত পা মুড়মুড় ন্যাংগুড় পেতে বস।
আমার ঝাঁক বরাবর আর না তুমি এস।
না নড়ে হাত না নড়ে পা না নড়ে ঘাড়ের শির।
এক ঝাঁক জুড়ে আছে এক লাখ আশি হাজার পীর।।
কার আজ্ঞে আল্লা উপী নপী খুপীকার আজ্ঞে।
তু যেখানে আছিস সেখানে পড়ে থাক গে।।[১৪]

উপরি-উক্ত বিভিন্ন মন্ত্রে যথাক্রমে ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা যায় বিহার-ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা-ময়ূরভঞ্জের কিংবা মুসলমান মন্ত্র-গুরুর কাছে বাঙালি শিষ্যের মন্ত্র শিক্ষার কারণ।

গ. ত্রিপদী ছন্দে রচিত মন্ত্র :

সাপে কাটা : ঝাড়ন

মনসা মায়ের পতি মন্ত্র ঝাঁকে হরষিতি
ঘন ঘন দিয়া হুহুংকার।
হাত বুলাতে বিষ মল রক্তের সঞ্চার হল
যত বিষ হয়ে গেল ছারকার।
শুনিয়া দেবীর বাণী যত বিষ হয় পানি
পাচন সঞ্চারে উড়িয়া পালায়।
করিতে হুহংকার ধ্বনি শুনে বিষ রণিঝনি
নামিয়া আসল তার পায়।।
ফের নাকি চাপড় চাই হাত বুলাতে বিষ নাই
যত বিষ পুঁছে মারিলাম পায়।
আর যদি থাকে বিষ ঝারিয়া করিলাম নির্বিষ
তাহা হলি বিষ উড়িয়া পালায়।।

ভার বাণ কুপ বাণ কাটি উঠান ছাড়িয়া আঁটি
নামে বিষ করে সাঁই সাঁই।
পঠতে মিশিয়া গেল হরি হরি হরি বল
নাই বিষ আর নাই নাই নাই।।
নাই বিষ বিষ হরির আজ্ঞে
শিগঘিরি করে ছাড়গে।।[১৫]

ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মন্ত্রে :

জান কয়েদ : রোগ চিকিৎসা

অহল্যা, চন্দ্র গুরুমুখী জান হে চন্দ্রা রাখ
রাখহে জীবন। সরল চন্দ্র ভোগ করে ওঠে
রাহু অঙ্গে বুলায়। চারি চন্দ্র ভেদ। যে বা
জন জানে মনে মনুষ্যগণ, দেবতা জারে মানে।
অমুকোর বেড়ে ফেল্লাম লোহার জাল।
সাত রাত সাত দিন কামরূপ কামিক্ষে হাড়ির ঝি
চণ্ডীর আজ্ঞে। আমার এই জান কয়েদ
একমাস অমুকের কণ্ঠে শিগ্রি থাকগে।।[১৬]

ঙ. গদ্যে রচিত মন্ত্র :

গদ্যে রচিত বাংলা লৌকিক মন্ত্রগুলি যথেষ্ট অভিনবত্বের দাবি রাখে। কিছু মন্ত্রে কমা, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি যতি চিহ্নের ব্যবহার আছে, আবার কিছু মন্ত্রে এ-সবের কোনো বালাই নেই। ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল[১৭] নগেন্দ্রনাথ বর্মন[১৮] প্রমুখ আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন—বেদ-পুরাণ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য উভয় ভাবেই রচিত। ওখানে অবশ্য কমা, পূর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি আছে। প্রাচীন ভূর্জ্জপত্র, পুঁথি, পাঁচালি মুনি-ঋষিগণ যেভাবে লিখতেন আমাদের মন্ত্রবিদ্‌রাও সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। তাঁদের কথা হলো—আগে শ্রুতি, তারপর স্মৃতি, অবশেষে লেখনী। অপরদিকে মন্ত্র এক দমে বা নিশ্বাসে সম্পূর্ণ করবার বিধি-নিয়ম গুণিন সমাজে প্রচলিত। এতে নিজেদের প্রভাব অন্যের কাছে আরও প্রকট হয়। তাঁদের মতে—দম ফেলে ফেলে বা নিশ্বাস ছেড়ে মন্ত্র বলার নিয়ম অনেক সময় চলে না। এরকম করলে মন্ত্রের 'বাঁধন' ছিন্ন হয়, নষ্ট হয় যাবতীয় আট ঘাট। তাই 'আজ্ঞে'-'কালাম'-'তালাক'-'দহাই' দেবার সময় গুণিনগণ দীর্ঘ 'ফুঁ' দেন। এবং তখনই দম বা নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ হয়। এইসব বিধি-বিধানের জন্যই কমা, পূর্ণচ্ছেদ দেবার নিয়ম পূর্বেকার মন্ত্রে ছিল না, ছিল না ছন্দের মিল। এখন সবই হচ্ছে। কেউ কেউ মন্ত্র সংস্কার করে মিল-ঝিল, কমা-পূর্ণচ্ছেদ বসাচ্ছেন। আমরাও মন্ত্র চিকিৎসকদের মন্ত্র উচ্চারণের সময় দেখেছি, তাঁরা একটির পর একটি টানা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন—কি পদ্য-ছন্দের মন্ত্র কি গদ্যে লেখা মন্ত্র—

থামবার অবকাশ না নিয়েই। নিছক গদ্যে রচিত মন্ত্র সংখ্যায় খুবই অল্প। এগুলি সম্ভবত ছড়া রূপ থেকে পরবর্তী কালে গদ্য রূপ পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্র খাতায় লেখবার সময় মন্ত্রের কারবারীরা ছড়া-পয়ার বা অন্য যে কোনো ভাবে লেখা কাব্য-মন্ত্র সবই গদ্যের আদলে লেখেন। এতে এক নিমেষে বা এক নিশ্বাসে মন্ত্র পড়বার সুবিধা হয় বলে গুণিনরা মনে করেন। এই পদ্ধতির আরও একটা কারণ--মন্ত্র সমূহ অন্যকে না বুঝতে দেওয়া। দৃষ্টান্ত :

ক. হেচড় : ভূত-প্রেত তাড়ান

শিব শিব শিব দোহাই তোমার বড় বড়
শ্মশানে মশানে নাচে গৌরী আনমনি
করেন ধ্বনি শ্মশানে মশানে তুমি তুমি
যে ব্রাহ্মণী ভূত
যোগিনী টুলকুনী শিবের ঘরণী আমি
তোর অধমে ভয় হারিণী ভয় তারিণী
হে মা বন্দী করি আমি তোমার
দেবানি পাতালে নাগবন্দী সাক্ষী তুমি
দেবগণ ভূতগণ তফাৎ হয়ে থাকগে
সময় দিব ততদিন পর্যন্ত থাকগে
চন্দ্রসূর্য সাক্ষী থেকো শিবের জটা
দুর্গার আজ্ঞে হর পার্বতীর আজ্ঞে

বীর না শয়তান ধন্বন্তরী জাযারক
দেখে কালী কৈবল দাহিনী মশানে তিনি
যে ব্রাহ্মণী ভূত প্রেত দানব দত্তা শাখিনী
ডাকি মা তোমার রক্ষা কর তুমি
তুরাও মা জননী আমার এই ভূত প্রেত
কার্তিক গণেশের মাথা খাও স্বর্গের
আমার এই গড়বন্দ আমার এই হাকে
এই হেচড় গড় বন্দি রাত দিন যত পর্যন্ত
আমার এই হেচড় যদি লঙ্ঘন হয়
কেটে ভূমিতলে যায় কার আজ্ঞে শিব
শিব শিব দহাই তোমার।।[১৯]

মন্ত্রটিতে কোথাও কমা-পূর্ণচ্ছেদ-সেমিকোলন বা যতি চিহ্নের ব্যবহার হয়নি। অধিকন্তু গুণিনদের অনুনয়-বিনয়ের মনোভাব লক্ষ্য করার মতো। মন্ত্র পড়তে পড়তে মন্ত্র প্রয়োগকারীদের এইরকম অনুনয়-বিনয় করে কাঁদতে দেখেছি, আবার শাসন-তর্জন-গর্জন বা রুদ্র মূর্তিও দেখেছি। একটি রোগের জন্য একটি মন্ত্রের মধ্যে অথবা পরপর কয়েকটি মন্ত্রে এই দুইরকম মনোভাব ব্যক্ত হতে পারে। এর গভীরে নিম্নলিখিত দুটি প্রত্যয় বর্তমান :

ক. মন্ত্রের যে অংশে অনুনয়-বিনয় বা তোষামোদ ইত্যাদি থাকে গুণিনের সেই অংশেই ঈশ্বরানুগত্য, ধর্মীয় সংপৃক্ততা, যজ্ঞীয় পবিত্রতা অনুসৃত হয়।

খ. মন্ত্রের যে অংশে তর্জন-গর্জন-শাসন ইত্যাদি থাকে সেই অংশে গুণিন ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ নিজস্ব শক্তিতে ঘটনা চক্রকে নিয়ন্ত্রণে আনবার চেষ্টা করেন। 'ক' অংশে গুণিনের আনুগত্য এবং 'খ' অংশে গুণিনের আত্মবিশ্বাস উভয় মিলেই হয় গুণিনের চিকিৎসা। রোগীর রোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্র বিনিয়োগ বিধি অনুসারেই ক্রমপার্বিক ওঝা-গুণিনদের এই রকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হওয়াটা বিচিত্র নয়।

খ. বাণ মারা : ক্ষত, দংশন বিষয়ক

'বাণমন্ত্র'

কেঁশের তীর ও ধনুক বানিয়ে বাণমন্ত্র প্রয়োগ করেন মন্ত্র চিকিৎসক। রোগীকে কেউ 'গাঁটুলি' করলে কিংবা ক্ষতস্থান 'নষ্ট' করে দিলে বিপরীত গুণিন প্রতিরোধ মূলক বাণ মারেন।

রম্ন ঝম্ন দুটি বুনি জলে ভাসে। দৃষ্টি মারি
বান পাহাড়ে খসে।। কুথা হইতে আইলি
চেটা জ্বালাও ত জ্বলী। রাম সীতের বাণে
তোরে দিব নর বলী।। পঞ্চনদী বাণে
তোরে দিব ছারখার। তিন তক্কে নয় বাণ
জুড়ি একেবারে মা কালীর স্মরণে তোরে
পাঠাইব যমের ঘর।।[২০]

বাংলা লৌকিক মন্ত্রের অন্যতম আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো—সংস্কৃত মন্ত্রের প্রয়োগার্থক বিশিষ্ট অন্ত্যশব্দ [৬৬ পৃষ্ঠায় 'জল সুদূর' মন্ত্রে আমরা দেখেছিলাম], অর্থাৎ নমঃ স্বহা, ফুট, দৃং, যট ইত্যাদি বাক্যাংশ কিংবা 'ং', 'ঃ', 'ঁ' প্রভৃতি ধ্বনি এর যত্র তত্র ব্যবহার। ওঁ, হ্রীং, ক্লিং, রিং, জং, লং ইত্যাদি ধ্বনি বা শব্দাংশের সাহায্যে মন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শব্দ শক্তির বিপুল প্রভাবের কথা বলা হয়ে থাকে। শব্দ ব্রহ্ম রূপে কল্পিত। তার একটি নিজস্ব শক্তি আছে। সেই শক্তিকে মানুষ অস্বীকার করতে পারেনি কোনোদিন। কিছুটা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে যে ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করা হোক না কেন, এর অন্য কারণও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুণিনদের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব বাড়িতেই যেতে হয়। মন্ত্র চিকিৎসক যদি অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন শ্রেণী থেকেই উঠে আসেন তো তাঁর পক্ষে বিত্তশালী বা অভিজাত রোগীর রোগ চিকিৎসা করতে যাবার সময় বিশেষ ঠাট বরাত করতেই হয়। এই সূত্র ধরেই মন্ত্রকার বা মন্ত্র চিকিৎসকেরা মন্ত্রকে তার লৌকিকতার লক্ষণকে অতিক্রম করে অভিজাত করতে চেয়েছেন, উন্নীত করতে চেয়েছেন শাস্ত্রীয় তথা বৈদিক কৌলিন্যে। এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যও তাঁদের কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।

ক. আদিতে মন্ত্রকারদের সম্মুখে অনুকরণযোগ্য বিগ্রহ বলতে ছিল বিভিন্ন বেদ-উপনিষদ, তন্ত্র-শাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র, রামায়ণ-মহাভারত, গীতা-ভাগবত প্রভৃতি—মূলত যা সংস্কৃতে লেখা। সুতরাং বাংলা ভাষার জননী সংস্কৃত কিনা এই তর্কে না গিয়ে বলা যায় সংস্কৃত তথা 'দেব ভাষার' প্রভাব মন্ত্রকারদের অনুকৃত নূতন প্রয়োগের মাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে।

খ. মন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য বাংলা শব্দের শেষে অথবা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যথেচ্ছা ং ঃ ঁ ধ্বনি যোগ করে বা সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সংস্কৃতায়নের মাধ্যমে জাতে ওঠবার অক্ষম প্রয়াস সাধিত হয়েছে মাত্র। সাধারণের এতে বিশ্বাসের ঘাটতি হয়নি কোনোদিন।

গ. সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণে গাম্ভীর্যতা অটুট থাকে এবং সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধা আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে লোক-মন্ত্রকারগণ উপেক্ষা করতে পারেননি। যদিও পরবর্তীকালে মন্ত্র-প্রয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিকৃতিতে সংস্কৃতর শুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। সাধু ও চলিতের সংমিশ্রণে ঘটেছে।

ঘ. মন্ত্র-সাধনার সঙ্গে তন্ত্র-সাধনা যুক্ত করে মন্ত্রের অভিনবত্বকে বাড়ানো হয়েছে। বৈদিক-পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতির ধারার সঙ্গে সর্বত্র না হোক অনেকাংশে সাদৃশ্য যুক্ত

হওয়ায় সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের বদল হয়েছে।

ঙ. প্রায়শ যেটা ঘটে থাকে--কোনো পণ্ডিত গুরুর শিষ্য হয়েছেন নিরক্ষর ব্যক্তি, বিপরীতক্রমে নিরক্ষর বা অর্ধশিক্ষিত গুরুর শিষ্য হয়েছেন পণ্ডিতজন। এসব ক্ষেত্রে শিষ্য ইচ্ছে করলে মন্ত্র সংস্কার বা শুদ্ধ করে নিতে পারেন না। প্রাথমিক অবস্থায় মন্ত্রপাঠ সমাজভুক্ত সকল মানুষেরই অধিকার থাকলেও কালক্রমে তা গোষ্ঠী প্রধান, কোম বা বিশেষ সম্প্রদায়ের এক্তিয়ারে আসে। আমাদের আদিম প্রপিতামহদের সময় থেকেই মানুষ বিশ্বাস করে এসেছে মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ অর্থাৎ গুরুর কাছ থেকে যেমন ভাবে পাওয়া গেছে ঠিক তেমনিই এবং মন্ত্রের আনুষঙ্গিক ক্রিয়ানুষ্ঠান যথাযথ প্রতিপালিত হলে যে কোনো রকমের অসম্ভব বিষয় আয়ত্তে আনা সহজ। মন্ত্র শিক্ষার সময় গুরুর নির্দেশ থাকে মন্ত্র ঠিক যেমনটি আছে তেমনটি লিখতে হবে বা পড়তে হবে। কোনো রকম সংশোধন করা নিষেধ। শিষ্য ব্যতিরেকে তৃতীয়-কারুর কানে যাতে না যায় সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়। ব্যতিক্রম ঘটলে এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে। সুতরাং সংস্কৃত-প্রবণতা অথবা ভুল কিংবা বিভ্রান্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই গভীরতর শিকড় বিস্তার করেছে বাংলা লৌকিক মন্ত্র সাহিত্যে। উদাহরণ :

ক. উড়ান মন্ত্র : সাপে কাটা

ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রীং বাণী। ঘা চাইতে বিষ পানি।।
ওঁ হ্রীং হং ফট স্বাহা। তিন চাপড়ে বিষ পালা।।
কার আজ্ঞে মা মনসা অস্তিক মুনি জরৎকারুর আজ্ঞে। অমুকের অঙ্গেরে
বিষ পানি হয়ে যাক গে।।[২১]

খ. নাসার মন্ত্র

আকের বনে আকোর করিতে জে হে জা না এ হো করিতে
তা কোর বংশে না হয় অরী সে দন্তকৃসং
না শিব গরসং গুচারু গং
ভতীভূতং যে মাং জানে নং বিদ্য প্রকাশিতে
চতুর্থ গ্রামের ব্রাহ্মণ পাকতা ভবপস্তি
যদি বিদ্বা না সিদ্ধাতে আনন্ত চতুর্থ গ্রামনং ব্রহ্ম পাতকী
ভবতী অমুকের নাসা রক্ত পড়া ভাল হয়ে যা।।[২২]

মন্ত্রটিতে নাকের রক্তপাত ও ক্ষত সারাতে ব্যবহৃত হয়। মন্ত্র পড়বার সময় চিকিৎসক নিম-হেন্নার ডাল দিয়ে রোগীর কপালে থেকে নাকের নীচ পর্যন্ত ঝাড়িয়ে আনেন।

গ. উড়ানমন্ত্র : গামছা মোড়া : সাপে কাটা

কালী ঝিলিমিলি পদ্মকহারী। দুইতে কলু আধার।।
সাতভার পদ্মফুলে তুলিতে নাগ ঘর। শণ্ডিলা রীর বালা।।

হরিহরঃ ব্রহ্মা সমরী বিষ।। অমুকের অঙ্গ হইতে গেল পাতাল।।
কার আজ্ঞা বিষ হরির আজ্ঞা ওঁ রিং রিং রিং ফট স্বাহা।।[২৩]

উচ্চারিত বাক্যের শ্রুতিমাধুর্য দানের জন্য কিংবা তার অর্থকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলবার অভিপ্রায়ে সকল রচনাকারকেই বিশেষ কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। লোকমন্ত্রকারগণও এই তত্ত্ব-তালাসের খোঁজ রাখতেন। তাঁরা মন্ত্রের ধ্বনি মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য যেমন যত্নবান হয়েছেন তেমনি অলংকার প্রয়োগের কুশলতাও দেখিয়েছেন। সাধারণত মন্ত্রে অলংকার হিসেবে বিভিন্ন অনুপ্রাসের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন :

ক. দাঁতের ব্যথা ঝাড়ানো

চন্দ্র কাঁচা সূর্য কাঁচা কাঁচা আদিমূল। অন্ত কাঁচা দন্ত কাঁচা কাঁচা আড়ি চুল।।
অমৃত্যে সরস ভারি সাম্যতে দেই পায়! ফুরিয়ে গেছে যৌবন আরবার ফিরে আয়।।
ওমা খাঁকী খাঁকী নেন্দা এক বলে বারে। সহস্রনলে ভরে হরি নামের হিরে আমার শরীরে।।
মরশীদের গুণে না লাগে ঘুন না লাগে ফিরে।। দহাই মরশীদের দহাই—সাত দহাই মরশীদের।।
আল্লাহি আল্লা জনে যে না করি। সেই বেটার মাথা খাবি।।

আমার এই মাটি পড়ায় অমুকের দন্তরস্য ভালো হয়ে যায়।[২৪] উপকরণের কথা মন্ত্রের শেষেই বলা হয়েছে। এইরকম দৃষ্টান্ত বহু আছে।

খ. কান্নে ঝাড়ানো :

কানি রানী দুই বুনি কানী যাবে ঘরে, কানি রয়ে বনে,
কান্নের কটরমটর বামনের নাড়ি। যারে খোকার কান্নে আরেক বাড়ি।।
কার আজ্ঞে কানি রানীর আজ্ঞে যারে যা খোকার কান্নে ভালো হয়ে যাকগে।।[২৫]

গ. হাত চালা : সাপে কাটা

বাম হস্তের তালু মাটিতে অবস্থান করে সাত বার নিম্নের মন্ত্রপড়ে ফুঁ দেন গুণিন। রোগীর শরীরে বিষ যতদূর বিস্তারলাভ করেছে হাত ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে। 'হাতচালা' মন্ত্র প্রয়োগ করার মসয় গুণিন উক্ত হাতে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল রাখেন। 'হাতচালা' মন্ত্রের সাহায্যে, বিষ কতটা শরীরে বিস্তারলাভ করেছে তা বুঝা যায়। ফলে মন্ত্র বিনিয়োগ ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদি প্রয়োগ করতে সুবিধা হয়।।

হাতচাণভি হাত চলে— অচল চলে সচল চলে
মনসা চলে মহাদেব চলে।। ভূত চলে মাটি চলে
গঙ্গা চলে যমুনা চলে এ হাতে বিষ চলে।।
চল চলরে হাত তাড়াতাড়ি চল— দোহাই তোমার রাম সীতার দোহাই লাগে
মা মনসার আজ্ঞা লাগে।[২৬]

মন্ত্র কেবলমাত্র জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মন্ত্রও রূপ কথার মতো গল্প শোনায়, অনেক সৃষ্টি তত্ত্বের খবর পরিবেশন করে, অজানা রহস্যের সন্ধান দেয়। এই অভিসন্দর্ভে সংগৃহীত এমন বহুসংখ্যক মন্ত্র আছে যেখানে বিশেষ ধরনের কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। সাধারণত এই শ্রেণীর মন্ত্রগুলি দীর্ঘ হয়ে থাকে। এগুলি আখ্যান-কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়। দীর্ঘ মন্ত্র সুর করে বাদ্য যন্ত্রের সহযোগে পরিবেশন করেন গুণিন। মন্ত্রাবয়বের মোড়কে এখানে সুসামঞ্জস্যভাবে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের কথা, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা এমন কি মঙ্গলকাব্যের বিষয়ও। দৃষ্টান্ত :

মন্থন মন্ত্র : সাপে কাটা

মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করার পর রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে অথবা নিম-হেন্নার-জাল বুলিয়ে মন্ত্রপড়েন গুণিন বা ওঝা। মন্ত্রটি তিনবার বা সাতবার পাঠ করা হয়।

মন্থনে মাতিল গোঁসাই কিবা কবে কথা। মন্থনে উপাজিল বিষ হস্তি মামূড় মাথা।।
সেই বিষ মহাপুরুষ খায় এক থাল। বুক বেয়ে পড়ে তার গোটা গোটা নাল।।
না দিল কার্তিক, গণপতি, দুর্গা, না দিল কোল। কালিনী বিষের জ্বালায় হরে নিল বোল।।
কি করি চারপাঁচ দেবতা মোরা বসিয়ে। এই বিষ থলি করে নিয়ে যাব হর-গৌরীর কাছে।।
কি কর কি কর মামী বসে আছ হেলে। বিষ খেয়ে ঢুলছে মামা সাগরের কূলে।।
কি শুলি নারদ ভাগ্নে গার্দি গেছে মন। কেমন করে দেখিলি মোর আদুর দুটি স্তন।।
আপন মাথা খাওরে মামী কার্তিকের মাথায় হাত। বিষ খেয়ে ঢুলছে মাথা শিবশঙ্কর নাথ।।
এই কথা শুনে রানী বাসরেতে গেল— বাসরেতে গিয়ে রানী এলাইল চুল।
চুল বেয়ে পড়ে তার নানা জাতি ফুল।। এস এস নারদ ভাগ্নে বাটার পান খাও।
এতেক নারদ ভাগ্না
তাঁর আজ্ঞা পায়
শিগ গিরে সমাচার পদ্মার কাছে যাও।। কি কর দিদি বসে আছ হেলে।
ঢেঁকির পৃষ্ঠে সহর হয়ে পদ্মার কাছে যায়
বিষ খেয়ে ঢুলছে মামা সাগরের কূলে।। কি শুনলি নারদ ভাইরে গর্দ্দি গেছে মন।
কেমন করে দেখিলি আদুর দুটি স্তন।। আপন মাথা খাওরে দিদি কার্তিকের মাথায় হাত।
বিষ খেয়েছে মামা ত্রিদেশের নাথ।। এসরে নারদ ভাইরে বস একটুখানি।
গোটা কতক নাগ আমি ডাক দিয়ে আনি।। আড়াই নাগ পড়াই নাগ আ নলা বয়ড়া।
যাহার পৃষ্ঠে জন্মেছিল নলার খাগড়া।। হরি নাম বর চিতে
তারপর আইল নাগমতি কেউটে তারপর আইল নয়া ঢোস বোড়া

তারপর আইল নাগ জল বোড়া।। তারপর আইল নাগ তেঁতুল পড়া।
তারপর আলি নাগ বিগ্‌দেবড়া।। তারপর আইল নাগ লাউনাড়া।
তারপর আইল নাগ চন্দনবোড়া।। তারপর আইল নাগ রক্তবোড়া--
এই অষ্টনাগ নিয়ে পদ্ম বাণু জিয়াইতে গেলো। নাই বিষ নাই বিষ বলে বুকেতে চাপড় মারিল।।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হর পাশমোড়া দিল। রাম রাম বলে ভক্ত উঠিয়া বসিল।।
শিঙ্গাতে ডম্বুর গান গাইতে লাগিল-- নমঃ শিবায় নমঃ (ওবার)।।[২৭]

দীর্ঘ মন্ত্রগুলির বিশেষত্ব এই যে এগুলি একাধারে কাহিনীমূলক এক্‌ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী, লীলা-প্রসঙ্গে নানাবিধ ঘটনা ইত্যাদি মন্ত্রের মাধ্যমে মন্ত্রচিকিৎসকগণ পরিবেশন করেন। বলা চলে, পুরাণ প্রসঙ্গকে এইভাবেই লালন করেন। এক্ষেত্রে লোকমন্ত্রকারগণ বেদ-পুরাণ ধরেই যে মন্ত্র রচনা করেন তা নয়, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসূত্র কিছু জানা এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জারক রসে মিশিয়ে নিজের মতন করেই রচনা করেন। প্রয়োজনে সংযোজন করেন লৌকিক বা আঞ্চলিক দেব-দেবী, গুরু-গোঁসাই অথবা প্রভাবশালী কিংবা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বকে। অবশ্য ব্যক্তি-প্রসঙ্গ-মন্ত্র নিতান্তই স্বল্প। দীর্ঘমেয়াদী রোগ সারাতেই দীর্ঘ মন্ত্র প্রয়োগ করেন ওঝা-গুণিন। চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী যেমন রোগ নির্ণয় করে রোগীকে রোগের ক্রম অনুযায়ী ঔষধ দেন ডাক্তারবাবু এখানেও একই পদ্ধতিতে মন্ত্র চিকিৎসক বা গুণিন রোগের ক্রম অনুযায়ী ধীরে ধীরে ব্রহ্মাসার, ছুটকিসার, চাপড়, স্মরণ, তাগা, বাণসার, মন্থন ইত্যাদি পেরিয়ে এসে দীর্ঘতম মন্ত্র বা ঝাঁপান মন্ত্রের দিকে অগ্রসর হন। গুণিনের কাছে এই ধরনের মন্ত্র খানিকটা শল্য-চিকিৎসার মতো।

ব্যবহারিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ডাক্তারি শাস্ত্রের মতো একটি অসুখে একই নামের একাধিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়—ঔষধ, ট্যাবলেট, ইনজেকশানের মতোই। সমস্ত ওঝা-গুণিন একই উপলক্ষে একটি বা একই প্রকারের মন্ত্র প্রয়োগ করবেন তা না-হতে পারে। অন্য স্থানের অন্য গুণিন উক্ত একই রোগের জন্য ভিন্ন মন্ত্র প্রয়োগ করেন, করতেই পারেন। বিশেষ বিষয়ের জন্যই বিশেষ ধরনের মন্ত্র।

অপরদিকে ভূতের বিষয়ে উপসর্গ জনিত চিকিৎসায়, বাণ কাটার সময় একাধিক মন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটান মন্ত্র-চিকিৎসকগণ। 'আজ্ঞে দেওয়া' বা 'দোহাইমানা' অংশটুকু বাদ দিয়ে কিংবা রোগের নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে, বর্তমান অসুখের নাম সংযুক্ত করে, এমন কি আসা পিছু 'দু-কলি' বাদ দিয়ে মন্ত্র প্রয়োগ করেন।

লক্ষ্য করার বিষয়, একই অসুখের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলগত পার্থক্য থাকার দরুণ একই মন্ত্র বিভিন্ন ভাষায় সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মন্ত্রগুলি যখন ভিন্ন ভাষাভাষীর শিষ্য বা গুরু মারফৎ আরেক ভাষাভাষীর মধ্যে প্রবেশ করে তখনই ঘটে মনের ভাষার সংমিশ্রণ। কিন্তু যে অঞ্চলই হোক না কেন উদ্দেশ্য সর্বত্রই এক। পার্থক্য শুধু প্রয়োগ রীতিতে।

কিছু সংখ্যক মন্ত্র আছে যা প্রয়োগ করার সময় ছবি বা চিত্র আঁকতে হয়। মন্ত্রের সঙ্গে

ছবি বা চিত্র অঙ্কনের রীতি আদিম কাল থেকে প্রচলিত। শিকারজীবী পুরা মানুষদের আশা ও বিশ্বাস যে ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র ও জাদু দিয়ে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সহজেই শিকার সংগ্রহ সম্ভব। তাই তারা প্রার্থনা ও মন্ত্রের সঙ্গে উপকরণ হিসেবে বিভিন্ন পশুর চিত্র ও মূর্তি এঁকেছেন। এঁকেছেন বর্শাবিদ্ধ শিকার, শিকারের উপকরণ, ফাঁদ-খোয়ার ইত্যাদি। অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে শিকারীর যা আশা বা প্রার্থনা তারই রূপ। ছবি আঁকার এই প্রথা মূর্তিপূজা, সাকার উপাসনা, তন্ত্র. জ্যোতিষ বিদ্যা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে লৌকিক মন্ত্রকে বরং মর্যাদা দান করেছে। মন্ত্রে চিত্র ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধানে বলা যায় :

ক. চিত্র দ্রুত জাদু শক্তির ক্রিয়ার কারক।

খ. মন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

গ. অপহৃত দ্রব্য কোথায় তার সম্ভাব্য সন্ধান চিত্রে ফুটে ওঠে।

ঘ. রোগের মূল কেন্দ্র চিহ্নিত করা।

ঙ. চিত্রের সম্মোহনী প্রক্রিয়ায় জন সমাজকে প্রলুব্ধ করা।

চ. চিত্রের সাহায্যে চিত্রাতীত লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

উদাহরণ হিসেবে 'দর্পণ দেখা' মন্ত্রটির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। কাঁচা তিল তেল দিয়ে সিঁদুর গুলে একটি লাল কাঠের ফ্রেমের আয়নায় 'ওঁ' লিখে তার নীচের চিত্রটি আঁকেন গুণিন বা রোজা। অতঃপর চিত্রের উপর আঙুল ছুঁয়ে মন্ত্র পাঠ করেন। পরিশেষে তিন তুড়ি দিয়ে আয়না দেখে ফলাফল জ্ঞাপন করেন।

কাঁচা কাঁচা তিল কানি ঝিকিমিকি করে।
সেই তেল আয়নায় দিয়ে পড়ুক কোঃ।
কার আজ্ঞে দোহাই ধর্মের আজ্ঞে (৩বার)
সেই তেল আয়নায় দিয়ে মহারম্ভ জ্বলে।।
যে বেটা নিয়ে গেছে মাল ধরগে যা ধর্ম্মের পো।।
যেখানে আছে মাল দেখা যাক গে।।[২৮]

সর্পদংশন ইত্যাদি চিকিৎসায় এমন বহু মন্ত্র সংগৃহীত হয়েছে যেগুলি বৈশিষ্ট্যগত বৈচিত্র্যে কাহিনী প্রসঙ্গে পুরুষ জননাঙ্গ, মাতৃযোনী, মৈথুন জাতীয় শব্দের ব্যবহার আধিক্যে আদি রসাত্মক বা অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। দংশন-চিকিৎসায় এগুলি 'সারমন্ত্র' 'ঝাঁপান' ইত্যাদি নামে কথিত। মোটা দাগের, প্রত্যক্ষ, আদি রসাত্মক শব্দ ব্যবহারে সমৃদ্ধ এই ধরনের মন্ত্র উচ্চারণ করার সময় বিশেষ ধরনের বাদ্য অর্থাৎ শাঁখ-ঘণ্টা-উলুধ্বনি-শ্রীখোল ইত্যাদি বাজান হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এই সময় কাছাকাছি থাকতে দেওয়া হয় না। রোগীর শব কাছ থেকেই বৈদ্য বা গুণিন 'সার মন্ত্র' বা

'ঝাপান মন্ত্র' সুর করে গেয়ে যান। তিনি কখনও হাততালি দেন, কখনো বা বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করেন। এই ধরনের মন্ত্র বিনিয়োগ সাড়ম্বরে করতে হলে গুণিনের একাধিক সহযোগী বৈদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেন তথাকথিত অশ্লীল শব্দ ব্যবহার বা আদিরসাত্মক অবতারণা করা হয়, তার উত্তর দান প্রসঙ্গে গুণিন বলেন--রোগীর স্নায়বিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বা কাম উত্তেজনা আনয়নে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার বা আদিরসের অবতারণা করা হয়। দারুণ যন্ত্রণায় নিস্তেজ দুর্বল হয়ে যাওয়া রোগী যখন নিজের জীবন সম্পর্কে অনিশ্চিত ভরসায় প্রহর গুনতে থাকেন তখনই নিম বা হেন্নার ডাল দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে আদি লীলারসের কাহিনী ব্যক্ত করেন বিষ-বৈদ্য। উদ্দেশ্য পূর্বেই জেনেছি--রোগীর স্নায়বিক শক্তি প্রদান। যদি রোগী একটু শক্তি বা উত্তেজনা অনুভব করে তো তাকে খাওয়ানোর জন্য পথ্য ইত্যাদি দেবার সুযোগ হয়। কারণ; পেটে বল না থাকলে দুর্বল রোগী আরও দুর্বলতর হয়ে পড়বে। গুণিনদের মতে--প্রত্যেক জীবের কাম উত্তেজনা সেই মুহূর্তে তাকে অমোঘ শক্তিশালী করে তোলে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও পরমায়ু বর্ধিত করে। ওঝা-গুণিনদের শুধু সেইটুকুই প্রয়োজন। এই ধরনের মন্ত্র নিদেন কালেই প্রয়োগ করেন গুণিনেরা। একে 'অশ্লীল' বা আদি রসাত্মক না বলে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। যুগ জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই এই ধরনের মন্ত্রের ঐতিহাসিক তথা সামাজিক ও ধর্মনৈতিক তাৎপর্য বর্তমান।

আজ এ সম্বন্ধে মতদ্বৈত নেই যে, আমাদের প্রতিটি পূজা-পার্বণ-উৎসব বা কর্ম-মাহাত্ম্যের পিছনে উদ্দেশ্যই হলো অটুট স্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ আয়ু, প্রভূত সম্পদ, অপর্যাপ্ত ভোগোপকরণ সহ নিরুপদ্রব ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন। কি ঐহিক কি পারত্রিক কিংবা ইহকাল-পরকাল সর্বত্রই ভোগ ও প্রার্থনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৌরাণিক সকাম উপাসনা বা বেদিক যাগযজ্ঞ তথা কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যও মূলত ভোগমুখী। তান্ত্রিক ধর্মাচরণের মধ্যেও যুগপৎ ভুক্তির ও মুক্তির প্রতিশ্রুতি বর্তমান। একটু অনুধাবন করলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব বেদের পূর্বোত্তর ভাগ মিলিয়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের যে দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয় তাই তন্ত্রের একমুখী সাধনার মধ্যে অন্বিত। লোকসমাজও বিশেষ করে আদর্শগত ও আচারগত দিক থেকে সম্পূর্ণ রূপে তন্ত্রের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। তন্ত্রে পঞ্চ 'ম'কার অর্থাৎ মৎস্য-মাংস-মদ্য-মৈথুন সাধনার কথা আছে। মুদ্রা যদিও পার্শ্বচার-বীরাচার-দিব্যাচারের সাধনক্রম যথাক্রমে তামসিক-রাজসিক-সাত্বিক ভেদে উপকরণ ও প্রক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য আছে, তা সাধারণ জীবের স্বাভাবিক আকর্ষণ দাবিয়ে রেখে, এড়িয়ে নয়। খানিকটা অনুকুল ভাঁটির স্রোতে গা ভাসিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছবার প্রয়াস তান্ত্রিকতার মূল বৈশিষ্ট্য রূপে পরিগণিত। তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কার সাধনার শেষ স্তরটি মৈথুন। অর্থাৎ জীব-সাধারণের দৈহিক মিলনজাত যে পরম সুখানুভূতির উৎসার হয় তা পার্থিব দেহগত চরম-আনন্দের বস্তুটিকে অবলম্বন করে দেহাতীত দিব্য-আনন্দের পথে পদক্ষেপ। শাস্ত্র ও সিদ্ধ পুরুষগণ ব্রহ্মানন্দ কি বস্তু তা বুঝতে এবং বোঝাতে গিয়ে দেহের প্রতি রোমকূপকে যোনি কল্পনা করে তাতে অসমলিত সঙ্গমসুখের উপমা দিয়েছেন। শিবলিঙ্গ-গৌরীপটের আরাধনা এবং আদর্শের মধ্যে নিছক যৌনাচার আছে কি? মূল্যধার চক্র থেকে জাগ্রতা কুলকুণ্ডলিনী

যতক্ষণ না ষট্‌চক্র ভোগ করে সহস্রারে পরম শিরেব সঙ্গে মিলিত ও একাত্ম না হন সে পর্যন্ত সাধনার পূর্ণতা কোথায়? সর্বত্রই মিথুন-ভূত-জীবনেরই ইঙ্গিত। কারণ, শান্তি ও আনন্দের স্বরূপ বুঝতে হলে জাগতিক বুদ্ধিব কাছে মৈথুন সংকেত ব্যতিরেকে অন্য কোনো সহজ প্রত্যয় মানুষের কাছে অজানা। স্বরূপে রূপকে যেভাবেই হোক জীবন পর্যায়ে, আনন্দ থেকে ব্রহ্মানন্দ বুঝতে এই জাতীয় ইঙ্গিত বা শব্দ প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আশ্চর্যজনকভাবে এইসব মন্ত্রে দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা নেই বললে চলে।[৩০] উদাহরণ ·

ঝাপান :

হেদেরে বিযেতে বড়া ভাঙব তোব দাঁতের গোড়া
শুনিল ধোপার ঝি তোরে আর বলিবা কি
কেন বা গালি দেহ মোর। ঠাপের বড় জ্বালা
বিষের বড় জ্বালা বিষেতে কাতর মানুষ হইল মরা।
আইল মনসা দিযে খায় বর রক্তের সাগরে বিষ হাড়ে করে ভর।
লখিন্দর মরেছে তায় বিষ আসে নারী লোক যত হাসে ততবিষ খসে।
ঠাপের চোটে বিষ ধুতরা হয় ধুতরা হইয়ে বিষ হইল ক্ষয়।
বিষহরির স্মরণ বিষ ভস্ম হয়ে আয় নেই বিষ, বিষ নেই মা মনসার আজ্ঞায়।[৩১]

বাংলা লৌকিক মন্ত্রের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'আজ্ঞা স্মরণ' বা 'দোহাই দেওয়া'। যেকোনো বিষয়ের যেকোন মন্ত্রেরই এ-একটা অপরিহার্য অঙ্গ। মন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় স্মরণ, আজ্ঞা, দোহাই দেওয়া হয় :

ক. বিভিন্ন পৌরাণিক অথবা লৌকিক, আঞ্চলিক দেব-দেবী।

খ. মুসলমানদের আল্লা-খোদা, পীর-পীরানী, নবী, পয়গম্বর, ফকির-গাজী প্রভৃতি।

গ. গুরু-গোঁসাই-মুরশিদ।

ঘ. প্রভাবশালী অথবা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও মহারাজা।

ঙ. অন্ত্যজশ্রেণীর বিশেষ নারী ও পুরুষ।

চ. বিভিন্ন পীঠস্থান ও সংশ্লিষ্ট দেব দেবী।

ছ. ইতর প্রাণী সমূহ ইত্যাদি।

মন্ত্রকারদের বিশ্বাস হলো, মন্ত্রের সঙ্গে যদি ঐশী শক্তির আনুকূল্য থাকে তাহলে মন্ত্র অবশ্যম্ভাবী রূপে ফলপ্রদ হয়। মহাদেব মণ্ডল[৩২] বলেছিলেন—সাধারণ মানুষ ভক্তি এবং ভালোবাসা দিয়ে তিল তিল করে যে দেবদেবী বা ঐশীশক্তি সম্পন্ন বিগ্রহ রচনা করছে, নিত্যনৈমিত্তিক শান্তি-স্বস্তি বা প্রার্থনায়-ধ্যানে-জ্ঞানে-মননে সেই তাঁদেরকেই আহ্বান- স্তুতিই তো মন্ত্র। প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার কান্না হাসির দোল দোলান যে সুতীব্র বোধ তাকে প্রত্যয়িত প্রস্ফুটিত করতে হলে স্মরণ-আজ্ঞা-দোহাই দেওয়া আবশ্যক যে। গুণিন বা বৈদ্য কখনো দেবতাকে অনুনয়-বিনয় করছেন, কখনো করছেন আজ্ঞাবহ, কখনো দেবতার বিরুদ্ধেই করছেন জেহাদ ঘোষণা, আবার কখনো তিনি বিষ ও রোগকে দেখাচ্ছেন ভয়, কখনো তাদেরকেই করছেন অনুনয়-বিনয়, কখনো মন্ত্র-চিকিৎসক নিজেই কাঁদছেন বা

নৈর্ব্যক্তিক কোনো শক্তিকে শাসন করছেন। চেতনার এই সত্যানুভূতিতে মন্ত্রকে করেছে আরও প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ। মন্ত্রচিকিৎসার এই স্তরগুলো সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই :

ক. একদিকে রোগী ও গুণিন মিলে পরিচিত মানবলোক।

খ. অন্যদিকে বহুশ্রুত কিন্তু অপরিচিত দেবলোক।

গ. মাঝখানে পৌরাণিক ইতি বৃত্তান্ত এবং কখনো কখনো নিছক ইহলোক।

ফলে যেসব লোককথা, পৌবাণিক কথা মন্ত্রগুলির মধ্যে এসেছে, সেগুলি কখনো সঠিক সুনিয়ন্ত্রিত কাহিনীসূত্রে রচিত, কখনো এলোমেলো অর্থহীন শব্দ-বন্ধনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাহিনী সংযোজিত।

লৌকিক মন্ত্রের ধর্ম, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ধর্মাবলম্বী গুণিন-বৈদ্যের মন্ত্রে মুসলমান-পীর-ফকিরের কথা থাকবে না, কিংবা মুসলমানী মন্ত্রে হিন্দু দেব-দেবীর প্রসঙ্গ অনুপস্থিত থাকবে—এমন বাধ্যবাধকতা কোথাও নেই। মুসলমানী মন্ত্রে আল্লা-খোদা, পীর-পরগম্বরের পাশাপাশি হিন্দু-দেবদেবীর অবস্থান নিঃসংশয়রূপে সহজ স্বাভাবিক। এখানে জাত-পাতের গোঁড়ামি নেই। 'পীরের জলপড়া'র ১৪৯ পৃষ্ঠা মন্ত্রটি শীর্ষনামে পীর এই শব্দ ব্যতিরেকে মন্ত্রের আর কোথাও মুসলমান দেব-ধর্ম প্রসঙ্গ নেই। যদিও নিজস্ব ধর্মাবলম্বীদের একান্তভাবে নিজস্ব কিছু মন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই আছে। এই দিক থেকে মন্ত্রকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. এক হেড়ে। খ. দুই হেড়ে।

'এক হেড়ে' মন্ত্রগুলি হলো কেবলমাত্র একই ধর্মের দেব-দেবীকে নিয়ে এবং তাঁদের স্মরণ-আজ্ঞা-দোহাই দিয়ে রচিত পরিবেশিত মন্ত্র সমূহ। যেমন :

ক. মুসলমানী মন্ত্র :

বাণকাটা ঃ সাপে কাটা রোগ চিকিৎসা

বিচমিল্লা আলেক রহমান
পাতাল কুরচি বন্দ করি আতকুরাণ।
আওলে আওলে সাত আসমান ওরে
সাত আসমান
সাতমুর্শিদ আওলে ওরে সাত আসমান।
পান করাও বা ঘের কে আড়ী
জোলা বাপির পাতাড়ি
থু থু মারে
ছুছু করে
দাদা আদুম দাবি হাওয়ালায়
এলাহা ইল্লিলাহ মহম্মদর রসুল
আল্লা আল্লাহ খোদা
দহাই মাদার (৩বার)।।[৩৩]

খ. হিন্দু ধর্মাবলম্বী গুণিনের মন্ত্র :

গড়ুর হুংকার : সাপে কাটা

পূর্বে ছিলাম মাগো এড়াই দেবীর আসনে
মর্ত্যভূমি পাঠাইলেন কিসের কারণে
মর্ত্যভূমি পাঠাইলেন যত দেবগণ
গো-হত্যা ব্রহ্ম-হত্যা আদি পাপ করে যে বা জন,
তাহাকে ধরিয়া এড়াই করিল ভক্ষণ
তাহার কামড়ে বাছা বত্রিশ বরণ।
বত্রিশ বরণের বিষ ঝাড়েন কোনজন—
বত্রিশ বরণের বিষ ঝাড়ে পঞ্চানন।

মহাদেবের মন্ত্র মাগো আমি কিছু জানি কালিয়া কালকূটির বিষ ছুঁয়ে করলাম পানি।
আমি ঝড়ার কালিয়ার সাপের বিষে উপায় বল মাগো উপায় হবে কিসে।
রথে আরোহণ মা চলিলেন পথে রোগী ভাল করতে চলিলেন ধবল শংখ হাতে।
শিব বাজায় খর-ডম্বুর গৌরী বাজায় মল অমুকের অঙ্গের বিষ নাই হরি-হরি বল।
নাই বিষ নাই বিষহরির আজ্ঞে ছাড়রে ছাড় বিষ শিঘ্রি করে ছাড়গে।।[৩৪]

'দুহেড়ে' মন্ত্রে একাধিক ধর্মের দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে স্মরণ-দোহাই-আজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণ :

জঙ্গলবন্দ :

শ্রীরামচন্দ্র চলন বনবাসে সঙ্গে লয় সীতা অরণ্যেতে কুঁড়েঘর পাতার ছাউনি
আমার এই মালের ডাক-হাঁক ভোর বেড়ে করলাম গণ্ডী।
আমি লক্ষ্মণ গুণমণি আমার এই গণ্ডীর মধ্যে রাত ভোর দিন ভোব
যে দিবি পা আল্লার আহান্দে জ্বলে যাবে তার গা।
পশ্চিমে বন্দম আল্লার নবী, দমের মসজিদ দক্ষিণে বন্দম জহর আউলী
পূর্বেতে বন্দম শ্যামমরতোজা আলী উত্তরে বন্দিলাম মা বরকত জননী
আমার এই মালের ডাক-হাঁক-ভোর বেড়ে গোড়বন্দির মধ্যে যে দিবে পা
দোহাই তোর আল্লার নবী মা বরকতের মাথা খা।।[৩৫]

সুন্দরবন অঞ্চলে যে সমস্ত ওঝা-গুণিন, ফকির-রোজা মন্ত্র-চিকিৎসা করেন তাঁরা সবাই যে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তা নয়। মুসলমানও আছেন। আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সম্প্রদায় গত ভাবে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও তাঁদের লৌকিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঐকমত্য দেখতে পাওয়া যায়। আসলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে এখনও অনেক হিন্দু-আচার-রীতির প্রভাব বর্তমান। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব রূপান্তরিত হয়েও তাঁদের ধর্মীয় চেতনায় আত্মগোপন করে আছে—এ সম্পর্কে তারা অনেক ক্ষেত্রেই অসচেতন। হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্ম দীক্ষা গ্রহণের ফলে নবদীক্ষিত মুসলমানগণের পক্ষে বংশ পরম্পরায় অর্জিত হিন্দু-সংস্কার-বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের দেশে যতদূর সম্ভব সুফী বা পীর-দরবেশগণের জীবনাদর্শ অষ্টম শতাব্দী হতে আসতে শুরু করে। প্রথমে তাঁরা সিন্ধু-প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়।[৩৬] তাঁদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় [১২০১-১২০৪ অব্দ] তুর্কী আক্রমণ ও জয়ের [শাহ জালালের (১২৯৭—১২০৪) সময়] সঙ্গে বাংলায়ও ইসলামী ধর্ম বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়। তখন থেকেই হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী আর এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানের এই মিশ্র সংস্কৃতিকে 'পীর সংস্কৃতি' বলা হয়ে থাকে।[৩৭] পীর-ফকিরেরা আপদে-বিপদে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, মানুষও এঁদের শরণাপন্ন হয়েছে। এঁরা সাধারণ মানুষের কাছে 'অবতার মহাপুরুষ'। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সকল-রকম বিপদ-আপদ-আধি-ব্যাধি দূর করেন,

বহুবিধ কামনা-বাসনা পূরণ করেন, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের শ্রদ্ধা-ভক্তি পান। সুন্দরবন অঞ্চলে এখনও যে সমস্ত ফকির-দরবেশ বা ওঝা-গুণিন দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা এঁদেরই উত্তরসূরী। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি থেকে অপরের পরস্পর পরিপূরক হয়ে বাস করবার ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটেছে, তেমনিই মুসলমান গুণিনের শিষ্য হযেছে হিন্দু। আবার হিন্দুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে মুসলমান। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর একে অপরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে, মুসলমান শিষ্যের বাড়ি হিন্দু অথবা হিন্দু গুরুর বাড়ি মুসলমানের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। বাংলা লৌকিক মন্ত্রেও এই সমন্বয়ী মনোভাব স্পষ্ট। অধিকাংশ মন্ত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর উল্লেখ, প্রভাব-প্রতিপত্তি হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত একনিষ্ঠ গুণিন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে কখনও-কখনও নিজ ধর্মের ও মতের উল্লেখ করেন যদিও, বর্তমান দিনে একজন শিষ্য একজন গুরুকে নিয়ে তুষ্ট হতে পারেন না। একাধিক বিষয়ের উপর অভিজ্ঞ গুরুর সন্ধান করে তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এজন্য প্রথম গুরুর কোনো মর্যাদা হানি হয় না। বরং তিনিই 'মন্ত্রগুরুর' সম্মান পান। আসলে সামাজিক প্রয়োজনে একজন গুণিন একাধিক বিষয়ের মন্ত্র শেখেন এবং চিকিৎসা করেন। যে গুণিন ভূত ঝাড়াতে পারেন, সর্পাঘাতের রোগী ঝাড়াতে পারেন, সুস্থ প্রসব করাতে পারেন বা অন্যান্য রোগীব চিকিৎসা একলাই করতে পারেন, তাঁর সামাজিক মর্যাদা তো হবেই। তাছাড়া নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হিসাবে দাঁড় করাবার নিয়ত প্রয়াস একাধিক গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণের অন্যতম কাবণ।

লৌকিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন উভয় ধর্মের ঐকমত্য রয়েছে তেমনিই ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেও এই একতা দেখতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে স্মারণ-উচাটন-বশীকরণ-আভিচারিক ক্রিয়া ইত্যাদি ইন্দ্রজল বা কুহকবিদ্যার প্রয়োগ-পরিচয়-বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে তেমনি কোরাণ-শরীফেও।[৩৮] অন্যান্য শাস্ত্রীয় আচার-আচরণগুলি উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন হলেও গুণিনী বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি আচার-আচরণ একই। অবশ্য প্রদেশ-পরিবেশগত বিভিন্নতা অনেক সময় প্রয়োগ বিধি অর্থাৎ মন্ত্রের সঙ্গে মাদুলি-তাবিজ-কবচ-শিকড়-বাকড়-লতা-পাতা ইত্যাদি বস্তু বা পদার্থ প্রয়োগ এক রকম নাও হতে পারে। তবে অধিকাংশ মন্ত্রই বাংলা ভাষায় লেখা। মুসলমান প্রভাবিত মন্ত্রে অপেক্ষাকৃত উর্দু-আরবীর টান একটু বেশি। তাবিজ-কবচ লেখা হয় উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষায়। লেখার সময় সাধারণত লাল কালি ব্যবহার করেন উভয় সম্প্রদায়েরই গুণিন। তালপাতা, কলাপাতা, তুলোট কাগজ, রুটি, পান, বেল, বট প্রভৃতি পাতায় লেখা ও তাবিজ-কবচ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

আমরা এই নিবন্ধপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে মন্ত্র প্রসঙ্গে ক. হিন্দু প্রভাবিত মন্ত্র, খ. মুসলমান প্রভাবিত মন্ত্র, গ. হিন্দু ও মুসলমান উভয়ধর্ম সম্প্রদায় প্রভাবিত মন্ত্রের আলোচনা করেছি। বিশেষ করে সুন্দরবনের মোট জনসংখ্যার অতিক্ষুদ্র একটি অংশ মুসলমান হওয়ায় আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষায় মুসলমান গুণিনের অনুপস্থিতি স্বাভাবিক কারণেই চোখে পড়বে। অবশ্য মুসলমান গুণিনের কাছে শেখা হিন্দু গুণিনের মন্ত্রের

সংখ্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রই তিনটি উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ হতে দেখা যায়।

ক. আত্মরক্ষার তাগিদে,

খ. নিরাময় প্রকল্পে,

গ. মারণাদি অশুভ প্রয়াসে।

সমাজে মানুষের জীবনকে আরও সুখময়, আরামপ্রদ ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তির পথে অন্তরায় ঘটায় যে বা যারা তারা সমাজের চোখে শত্রু বলে বিবেচিত। শত্রু একাধারে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি সম্পন্ন জীব ও প্রাণী হতে পারে, হতে পারে ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব, দেবতা, এমনকি মানুষ নিজেও। এরা পরস্পরকে ঈর্ষা, বৈরীভাব, ঘৃণা, কর্তৃত্ব করার স্বার্থচিত পদক্ষেপে জীবনের পথকে করে তোলে বন্ধুর। এইভাবে সমাজে কার্যত, দুটি বিশেষ শিবির হয়ে যায়—ক. শত্রু প্রপীড়িত, খ. শত্রু। এরা উভয়ে উভয়কেই কোনো শক্তিমান মানুষের সাহায্যে বা ওঝা গুণিনের দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। প্রতিহত করতে চেয়ে বিষয় ভেদে, ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়ানুষ্ঠান ও মন্ত্র বিনিয়োগ করে। শত্রুর ভয়প্রদ ক্ষতিকারক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা মূলক প্রচেষ্টার দ্বারা প্রথম পক্ষ যখন প্রত্যক্ষ কিংবা অলক্ষ্যে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হচ্ছে বিভিন্ন অভিচার উপ-প্রক্রিয়া সমেত, ঠিক তখনই একইভাবে একই উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষও নিজের আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। এখানে সাফল্য, আরোগ্যলাভ কিংবা ব্যর্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করে গুণিনের শক্তির উপর। কারণ দীক্ষাগ্রহণ তথা শিষ্যত্বলাভের পর গুণিন বা ওঝা 'ব্রহ্মশক্তি' বা মন্ত্রশক্তির অধিকারী হন। সেই শক্তির প্রভাবে বিধিবদ্ধ সংযম ও সাধনার দ্বারা তাঁর কাছে বীর্য-বীরত্ব-বিজয়, সত্য-শক্তি-শৌর্য, দেব-পিতৃ-মিত্র, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, জীবন-মৃত্যু সবই একাকার হয়ে যায়। সুতরাং সমাজে মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে গুণিন এবং তার মন্ত্রশক্তি। কাজেই যে গুণিন বা ওঝার মন্ত্রের যত বেশি শক্তি সেই-ই তত বেশি জয়ী হবে।

নিরাময় মূলক মন্ত্রের সাহায্যে রোগ-ব্যাধির আরোগ্য সহ কাজে সাহস-শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার যেমন হয় তেমন শত্রু বিতাড়ন ও শত্রুর শক্তিহরণ করে নিজের উদ্দেশ্যসাধন, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বীর সময় মানসিক শক্তি বৃদ্ধি, শারীরিক কুশলতা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। নিরাময় মূলক মন্ত্রের সাহায্যে পাশবিক ও দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শুভশক্তির আত্মপ্রকাশ ও জয়লাভ ঘটে। গুণিনেরা নিরাময় মূলক মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় আভিচারিক ক্রিয়াদির সঙ্গে তাবিজ-কবজ ইত্যাদি দ্রব্য বা পদার্থ বিনিয়োগ করেন। মানুষ বিশ্বাস করে সেই সব জিনিস ধারণ করে, গুণিনের বিধি বিধান মান্য করে। অনেক সময় আত্মরক্ষা মূলক মন্ত্র এবং নিরাময় মূলক মন্ত্র একের সঙ্গে অপরের মেশামেশি হয়ে যায় ; পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ যে মন্ত্র আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই মন্ত্রই গুণিনগণ প্রয়োজনের শাসন না মেনে নিরাময় মূলক উদ্দেশ্যে বিনিযোগ করেন। আসলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তো নিরাময় কিংবা নিরাময়ের আয়োজনই হলো আত্মরক্ষার তাগিদে!

অপরদিকে, মারণাদি অশুভ মন্ত্রের সাহায্যে গুণিনেরা নিজ নিজ সম্পত্তি তথা যজমানের সম্পত্তি রক্ষা করেন। এর জন্য অপরের ক্ষতি কিংবা মৃত্যুও যদি হয় তবে তা করতে পিছপা হন না গুণিন। এটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। শুধু সম্পত্তি রক্ষা নয়, শত্রু নিধন, আয়ু হরণ, রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি প্রভৃতি নারকীয় কাজ অলক্ষ্যে থেকে সম্পাদন করেন। এই শ্রেণীর গুণিনের সংখ্যা নিতান্তই কম। সমাজের চোখে এঁরা নিন্দনীয় হলেও সমাজেরই বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ এঁদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। যেকোনো প্রকারে হোক নিজের ভালোর জন্য অন্যের ক্ষতি করাই হলো অশুভকারক মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এর ক্রিয়া-শক্তি মানুষের জীবন-ধন-সম্পত্তি পর্যন্ত স্পর্শ করে বলে বিশ্বাস।

মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও গঠনরীতি প্রসঙ্গে বৈদিক ও লৌকিক মন্ত্রের কয়েকটি সূত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি :

বৈদিক মন্ত্র	লৌকিক মন্ত্র
১.ক. মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উদ্দিষ্ট পরিচয় জ্ঞাপক তথ্য-সমাহারে সমৃদ্ধ	ক. আর্যপূর্ব সভ্যতায় লোকায়ত মানুষের সৃষ্টি।
খ. মন্ত্র অবয়বে ছান্দোসিক প্রত্যয় সুস্পষ্ট	খ. বৈদিক মন্ত্র এবং লৌকিক মন্ত্র একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত।
গ. মন্ত্র পাঠ ও প্রয়োগের পূর্বে বিধি-পূর্বক সকল দেব-ধর্মকে স্মরণ ও প্রণাম করতেই হয়।	গ. শ্রেণী ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ লৌকিক-আঞ্চলিক দেব-দেবী, গুরু, প্রভাবশালী ব্যক্তি মহারাজা, অন্ত্যজ নারী-পুরুষ, ইতর প্রাণী ইত্যাদির পরিচয় মেলে।
ঘ. মুখ্য বীজ একটাই—প্রণব ও ওঁকার।	ঘ. মন্ত্রপাঠ ও প্রয়োগের পূর্বে প্রার্থনা বা স্মরণ-বন্দনা আঞ্চলিক না হলেও গুণিনরা প্রয়োজনে আপন সারা ইত্যাদি করেন।
ঙ. গদ্য এবং পদ্য উভয়ভাবে রচিত।	ঙ. গদ্য-পদ্য উভয় রীতিতে রচিত।
	চ. কামনা পূর্তির নিবেদন, কাকুতি-মিনতি, শাসন-তর্জন-গর্জন করা, দিব্বি দেওয়া ইত্যাদি হয়।
	ছ. যজমানের প্রার্থনা, দেবতার প্রশস্তি, দেবতাকে আজ্ঞাবহ করা ও দেবতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা প্রভৃতি থাকে।
২.ক. মন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট ও বোধগম্য।	ক. মন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্ট বা বোধগম্য নয়, হেঁয়ালির আবরণে ঢাকা থাকে। অর্থহীন অসমাঞ্জস্য শব্দের আধিক্য, অশ্লীল বা আদি রসাত্মক শব্দের ব্যবহার থাকে।

খ. সংস্কৃত বা দেব ভাষায় রচিত।	খ. বাংলা ভাষায় এবং অন্যান্য প্রাদেশিক বা উপভাষায় রচিত।
গ. পুষ্টি ও আভিচারিক সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসৃত এবং তা যথাবিধি শাস্ত্রচারে।	গ. তন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।
	ঘ. পুষ্টি ও আভিচারিক সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসৃত তবে লৌকিক ভাবে।
	ঙ. যুগের জীবন বোধ অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশিত।
৩. ক. ধর্ম-ব্রত-পূজা-পার্বণ ও দশবিধ-সংস্কার সাধনের জন্য রচিত।	ক. আভিচারিক কার্যাদির পুষ্টি সাধনে রচিত।
খ. মন্ত্রের কবিত্ব, বৈভব, বৈদগ্ধ্য বিদ্যমান	খ. এখনও প্রাচীন এবং বিশেষ-বিশেষ লোক সমাজে প্রচলিত।
গ. দেব-দেবীর লীলা-কাহিনী বর্ণিত।	গ. গ্রামীণ লোক-সমাজ, সম্প্রদায় বা উপজাতির পূজা-পার্বণ-ব্রত ও সামাজিক-পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানে, নানাবিধ রোগ-চিকিৎসা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।
	ঘ. সর্বজনীন দেব-দেবী সহ আঞ্চলিক দেব-দেবী এবং পীর-পীরানীর কথা বর্ণিত।
৪.ক. যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান, পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যানুষ্ঠানাদিতে ক্রমিক ধারা অনুসৃত।	ক. বেদ-পুরাণের শৈল্পিক কাঠামো অনুসৃত।
খ. শান্তি-স্বস্তি, কামনা-বাসনা প্রভৃতি বিনিয়োজিত ইহকাল-পরকালের ভোগ ও প্রার্থনা একই মন্ত্রে গ্রথিত।	খ. ইহকালের গুরুত্বই প্রকটিত।
গ. ভুক্তি ও মুক্তির বা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে অন্বিত।	গ. কর্মকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দান প্রসঙ্গে জীবনের সকল রকম নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে মন্ত্র স্বীকৃত।
ঘ. কাজ করো, ফলের আশা করিও না —অর্থাৎ কর্মফলকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে।	
ঙ. পরিশেষে পরম ব্রহ্মে লীন অর্থাৎ শূন্যতার কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত— 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'।	

৫.ক. মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণই এর ব্যবহারক ও সংস্কারক।	ক. বিশেষ সম্প্রদায়, সম্প্রদায়-প্রধান বা কিছু সংখ্যক মানুষ এর সংরক্ষক ও ব্যবহারক।
খ. পূর্বে সকল শ্রেণীর মানুষের পাঠ করার অধিকার অস্বীকৃত হলেও বর্তমানে স্বীকৃত।	খ. গুরু ও উত্তরাধিকার সূত্রে মন্ত্র অর্জনেব অধিকার প্রাপ্ত।
গ. শুদ্ধাচারের বিধি অবশ্যই পালনীয়।	গ. লোকমন্ত্রের অধিকার অনধিকার ভেদ বর্তমান।
৬.ক. প্রাত্যহিক জীবনাচারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ অনুপস্থিত।	ক. আচারে প্রয়োগে সর্বত্রই শুদ্ধাচার প্রতিপালিত হয়।
খ. সামাজিক, আঞ্চলিক মানসিকতার প্রসঙ্গে অনুপস্থিত।	খ. গভীর জীবনবোধ ও বাস্তব জীবনানুভূতি থেকে উদ্ভূত।
	গ. সামাজিক মনন ও পরিস্থিতির গভীর প্রত্যয়ে প্রভাবিত।
	ঘ. দৈনন্দিন জীবন চর্চায় অকৃত্রিম, অন্তর্লীন ও প্রত্যক্ষ।

গুণিনেরা যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার বা বিনিয়োগ করেন, সুন্দরবনের সামাজিক-অর্থনীতিব ক্ষেত্রে কতটা প্রমাণসিদ্ধ তা 'ফাংশানাল ইউনিট মোটিফেমর' সাহায্যে দেখা যেতে পারে। ক্লোদ লেভিস্ত্রোস-র 'স্ট্রাকচারাল অ্যানথ্রপোলজী' [১-২ ; ১৯৭৭, ১৯৮০] এবং পিয়ের ও এলিকোঙ্গাস-মারান্দা রচিত 'স্ট্রাকচারাল মডেলস ইন ফোকলোর অ্যাণ্ড ট্রান্সফর্মেশ্যানাল এসেম' [১৯৭৮] অনুযায়ী ফাংশানাল ইউনিট সম্পূর্ণ আঙ্গিকে কেন্দ্রিক। মন্ত্রেব অন্তর্গত বিভিন্ন উপকরণ পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ কি সম্পর্কে আবদ্ধ আঙ্গিকগত বিশ্লেষণের সাহায্যে উক্ত বিশেষ সম্পর্কগুলিকে প্রাথমিক ভাবে বিচার করে উপকরণ গুলিব গুরুত্ব পরম্পরাক্রমে স্থিরীকৃত সম্ভব।

ফাংশানাল ইউনিটের প্রকরণ দুটি—ক. ধ্বন্যাত্মক একক। এর চিহ্ন '+' খ. ঋণাত্মক একক এর চিহ্ন '—'

গুণিনের মন্ত্রে যদি '+' অর্থাৎ ধ্বন্যাত্মক একক বেশি পরিমাণ সক্রিয় থাকে তবে মন্ত্র যার উপর প্রযুক্ত হয়েছে তার কাছে মঙ্গলকর। যদি '—' বেশি করে সক্রিয় থাকে তবে তার পক্ষে ক্ষতিকারক। উভয়ই মন্ত্রের বিশেষ উপকরণ বা চরিত্র ও ক্রিয়া।

অতঃপর কয়েকটি মন্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথমে 'ভূত ঝাড়বার' মন্ত্র।

ক. অগ্নিবাণ :

বাণবাণ অগ্নিবাণ বলে দেবী দিল ডাক স্বর্গে ছিল সরস্বতীবাণ লক্ষ্মীবাণ কাটা
গেল বাণ ধান উর্দ্ধশাসে বাও বাতাস খলখল কেটে ফেলে খড় মাঠে ফেলে বাণ
হাসে বিশ্বামিত্র বাণ লয়ে কালীপদে দিল দেখা শয়তানের সঙ্গে দেখা ঠিক দুপুর বেলা
ওরে বেটী তোরে ব্রহ্মার অগ্নিতে পুড়িয়ে মারি ছাড় ছাড় অমুকির দেহ ছাড় এক্ষুণি

যদি না ছাড়িস তো শিবের বুকে পা
কার্তিক গণেশের মাথা খা অং ত্রি অং
মা এই বালকের দিকে চা তোর
হবিধর্ম্মের আজ্ঞা দোহাই মাকালী।

--নগেন্দ্রনাথ বর্মণ।

অগ্নিবাণ প্রয়োগ করা হয়েছে ভূতগ্রস্ত রোগীর উপর। এখানে চরিত্র ও ক্রিয়ার যে ফাংশানাল একক তা হলো ঃ

রোগীর ভাল হওয়া = '+' = ভূত চলে যাওয়া
ভূতের বাণ বিদ্ধ = '--' = রোগী সুস্থ।

'+'	'--'
১. বাণবাণ অগ্নিবাণ ২. দেবী দিল ডাক ৩. স্বর্গের সরস্বতী, লক্ষ্মীবাণ কাটা গেল ৪. বাণধায় উর্ধ্বশ্বাসে, বাও বাতাস কাটে ৫. খড় মাঠে ফেলে ৬. কালীপদে দেখা ৭. শয়তানের সঙ্গে ঠিক দুপুর বেলা দেখা ৮. ধর্মের আজ্ঞা দোহাই মা কালী	১. ব্রহ্মোরে অগ্নিতে পুড়িয়ে মারি ২. না ছাড়লে শিবের বুকে পা ৩. কার্তিক গণেশের মাথা খা

∴ এখানে ধ্বন্যাত্মক একক বা চরিত্র ও ক্রিয়া = '৮'
ঋণাত্মক একক বা চরিত্র ও ক্রিয়া = '৩'
তাহলে, '৮' (+) < ' ৩ ' (--)
লেভীস্ত্রোস ও মারান্দার গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী এর পরিণতি হলো :
$F(x)^{৮} < F(y)^{২}$
F = ফাংশানাল ইউনিট
x = ধ্বন্যাত্মক চরিত্র ও ক্রিয়া = রোগীসুস্থ = একক সূচক '৮'
y = ধ্বন্যাত্মক চরিত্র ও ক্রিয়া = ভূত চলে যাওয়া = একক সূচক '৩'

খ. নিদ্রালী মন্ত্র :

স্বর্গের ধন মর্ত্যের মাটি
হায় রাম কি হল।
ইন্দ্র মাটি সিন্দের চোর।
নিদ পড়েছে গাছের পাতায়।
শুয়ে থাকে বসে জাগে
আর গাইনে না করে রা
হাড়ি ঝিয়ের আজ্ঞা চণ্ডীর পা
সাপিনীকে লাগিল দাঁতে কপাটি।।
ঘা মুখে বিষ মল।।
নিদ পড়েছে অঘোর ঘোর।।
নিদ পড়েছে হেঁগাল মাথায়।।
মোর নিদিটি তাকে লাগে।।
মো পা জমরারের কালিকা মা।।
কুম্ভকর্ণের স্মরণে নিদ্রা যায় নিদিটি দেয়া।

--নগেন্দ্রনাথ বর্মন

চোর চুরি কবতে যাবার সময় গৃহস্থকে 'নিদ্রালী মন্ত্র' দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। এই চোব 'সিদকাঁটা' চোব [চোরের সুযোগ '+' = গৃহস্থদের অকল্যাণ '–']

'+'	'–'
১ স্বর্গেব ধন	১. মর্ত্তের মাটি
২ সাপিনীকে লাগিল	২. দাঁত কপাটি
৩. ঘা মুখে মল	৩. বিষমল
৪. ইন্দ্রমাটি	৪. সিন্ধের চোর
৫ নিদ পড়েছে গাছের পাতায়, হেঁগাল মাথায়, শুযে বা বসে থাকা অবস্থায়	৫. অঘোর ঘোর।
৬ না করে রা	
৭. হাড়ির ঝির আজ্ঞা, চণ্ডীর পা, কুম্ভকর্ণের স্মরণ।	

+ ৭ < - ৫ বা ৭ (+) < ৫ (-)

অর্থাৎ পূর্বের সূত্র সূচক এর গাণিতিক পরিণতি হবে $F(x)^{৭} < F(y)^{৫}$

গ. স্ত্রী বশীকরণ . ফুলপড়া মন্ত্র :

তিন লোকের শোভা পারিজাত ফুল দেবতা গর্ন্ধব তাতে সদাই রাতুল।।
হেন ফুল আনিলাম আপনার ঘরে। অর্ধ্বাঙ্গিনীর হাতে দিলাম রতি স্মরণ করে।।
ফুল দেখে ভুলে গেল আমার রমণী। পোষা হল আমার পোষ সুরঙ্গিনী।।
আমার ফুল পড়া দিলাম উমুকার মাথায়। জগৎ ঈশ্বর আর নরসিংহের আজ্ঞায়।।
দোহাই মদন ফুল পড়া শিঘ্র লাগত।

—মহাদেব মণ্ডল।

মন্ত্রটিতে অভিমন্ত্রিত ফুলের সাহায্যে একজন পুরুষ একজন রমণীকে বশীভূত করতে প্রয়াসী। এখানে পুরুষের কামনা-বাসনার প্রতীক হলো অভিমন্ত্রিত ফুল = '+' এবং রমণীর হাতে উক্ত ফুল দেওয়ার অর্থ রমণীর মনহরণ = '–'

'+'	'–'
১. তিন লোকের শোভা পারিজাত ফুল	১. হাতে দিলাম
২. ফুল আনিলাম আপন ঘরে	২. ফুল দেখে ভুলে গেল
৩. রতি স্মরণ	৩. উমুকার মাথায়
৪. রমণী পোষা হলো	৪. ফুলপড়া শিঘ্র লাগ
৫. ফুল পড়া দিলাম	
৬. জগৎ ঈশ্বর নরহরির আজ্ঞা। দোহাই মদন	

∴ ৬ (+) < ৪ (-) বা + ৬ < - ৪

অর্থাৎ আগেকার সূত্রসূচক অনুসরণ করলে এর গাণিতিক পরিণতি দাঁড়াবে
$F(x)^{৬} < F(y)^{৪}$

ঘ. মারণ-উচাটন : বাণ মারা মন্ত্র :

বাণ বাণ মহাবাণ স্বর্গে উৎপত্তি
ওরে ধর্ম তুই রইলি সাক্ষী
অং আং লং বং স্বাহা
শত্রুর অঙ্গে প্রবেশিলি বাণ
স্বর্গচ্যুত হবে স্বর্গের দেবগণ
মহাদেব স্মরণে বাণ ছাড়িলাম আমি
আমার পিছনে যে শত্রু তারে করিব ছাই
কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড বাজিল আকাশ
এই বাণ যদি ব্যর্থ হয় দোহাই ত্রিভুবন
কার আজ্ঞা রামলক্ষ্মণ মহাদেবের আজ্ঞা।।

—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

'+'	'—'
১. বাণ বাণ মহাবাণ	১. তারে করি ছাই
২. মহাদেবের বরে বাণ ছাড়িলাম	২. কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড, বাজিল আকাশ
৩. ধর্ম তুই রইলি সাক্ষী	৩. অঙ্গে বাণ প্রবেশিল
৪. আমার পিছনে যে শত্রু	
৫. দোহাই ত্রিভুবন	
৬. রামলক্ষ্মণ মহাদেবের আজ্ঞা	

∴ ৬ (+) < ৩ (-) বা + ৬ < - ৩

পূর্বের সূত্রানুযায়ী এর গাণিতিক পরিণতি হবে : $F(x)^{৬} < F(y)^{৩}$

ঙ. কাটি ঘা : ব্রহ্মা চাপড়ি :

এক চম্পা সহস্র ফকড়ি
বিষ নাই আর উপরে
কার আজ্ঞায় মা মনসার আজ্ঞায়।।
মারিলাম ব্রহ্মার চাপড়ি
বিষ নাই আর ভিতরে

—পরেশচন্দ্র হাউলী

'ওঝা' রোগীর গায়ে 'ব্রহ্মা-চাপড়ি' মন্ত্র পড়ে চাপড় মেরে সাপের বিষ ভস্ম করেছেন। এখানে ব্রহ্মা চাপড়ি ক্রিয়া করলে রোগী সুস্থ = '+' এবং বিষ ভস্ম = '—'

'+'	'—'
১. এক চম্পা	১. ব্রহ্মা চাপড়ি
২. সহস্র চাপড়ি	২. বিষ নাই
৩. মারিলাম	
৪. বিষ নাই উপরে	
৫. বিষ নাই ভিতরে	
৬. মা মনসার আজ্ঞা	

∴ + ৬ < - ২ বা ৬ (+) < ২ (-)

লেভীস্ত্রোস ও মারান্দার গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী এর পরিণতি হবে : $F(x)^{৬} < F(y)^{২}$

চ জঙ্গলেব মন্ত্র চালান

চলে যাও সাপ সাপিনী বাঘ বাঘিনী ভূত
প্রেত দানব দূত যক্ষ আদি পথের কাঁটা
খোঁচা পথের সাপ বনেব বাঘ তোমার
পঞ্চ ভাই। পথ ছেড়ে দাও মহাদেবেব কাছে
যাই মহাদেবের কাছে যে কবিবে ঘা
শিক্ষে তার গুরুর মাথায় পাকলেব বাম
পা। কার আজ্ঞে ঈশ্বব মহাদেবেব আজ্ঞে
আমার এই কালামে বাঘ সাপ কামট কুমির
দানব দূত যোগিনী সংখিনী পীর যক্ষ আদি
দূরে চলে যা।।

—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

বাউলে জঙ্গলে গিয়ে নিরাপদে কাজ সম্পাদনে বাঘ-কুমির-সাপ ইত্যাদি হিংস্র জীব-জন্তুকে দূরে পাঠিয়ে দেন চালান মন্ত্রের সাহায্যে। এখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের দূরে গমন অর্থে বনকরাদের সুবিধা = '+' এবং পশুদের চলে যাওয়া = '-'

'+'	'–'
১. চলে যাও	১ সাপ-সাপিনী, বাঘ-বাঘিনী, ভূত-প্রেত, দানব-ভূত যক্ষ, পথের কাঁটা খোঁচা ইত্যাদি।
২. পথ ছেড়ে দাও	২. তার শিক্ষাগুরুর মাথায় পাকলের বাম পা
৩. মহাদেবের কাছে যাই	৩. বাঘ-সাপ কামট-কুমির, দানব-ভূত, যোগিনী-সংখিনী, পীর-যক্ষ দূরে চলে যা।
৪. মহাদেবেব কাছে যে করিবে ঘা	
৫. ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞা	
৬. এই কালাম	

∴ + ৬ < – ৩ বা ৬ (+) < ৩ (–)

অর্থাৎ পূর্বের সূত্র সূচক অনুযায়ী এই মন্ত্রটির গাণিতিক পরিণতি হবে :

$F(x)^{৬} < F(y)^{৩}$

উপরে যথাক্রমে ভূত চালকের 'অগ্নিবাণ', চোরের সিঁদ কাটার জন্য "নিদ্রালীমন্ত্র", স্ত্রী বশীকরণের 'ফুলপড়া', মারণ-উচ্চারণের 'বাণমারা', কাটি-ঘার 'ব্রহ্মচাপড়ি' এবং জঙ্গলের 'চালান' মন্ত্রের আঙ্গিকগত বিশ্লেষণে দেখা গেল সুন্দরবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রগুলি প্রমাণ সিদ্ধ।

গুণিনেরা যে সমস্ত মন্ত্র পাঠ ও প্রয়োগ করেন সেই সমস্ত মন্ত্র পাঠের সময় একটা

বিশেষ ছান্দিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাল ও মাত্রা। সাধারণ বিচারে এই ছান্দিক অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য মন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রায় একই হলেও 'বন্দনা-প্রার্ণনা-আহ্বান' জাতীয় মন্ত্র, সর্প দৃষ্ট রোগী 'ঝাড়ন' মন্ত্র, 'সম্মোহনী' বা 'বশীকরণ ইত্যাদি মন্ত্রে দোলায়িত ভাব বর্তমান। দোলায়িত ভাবটা সাপের গমনের মত বঙ্কিম, কিম্বা বলা চলে-- নিস্তরঙ্গ পুকুরে একটা ঢিল ছুঁড়লে তার ঢেউগুলি যেমন একটা দোলা দিয়ে পুকুরের তটরেখা চুম্বন করে ঠিক তেমনি। মন্ত্রপাঠের এই ছান্দিক গতিকে রেখা চিত্রের সাহায্যে অঙ্কন করা যেতে পারে।

গুণিন যত দ্রুত উচ্চারণ করবেন ততই মন্ত্রের গতি 'ক' থেকে পরবর্তী ঘ পর্যায়ে আসবে।

বিষয়টিকে একটু পরিষ্কার করা যায়। অনস্বীকার্য প্রত্যেকটি মন্ত্রের বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটি দৈর্ঘ্য আছে। এই দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মন্ত্রকে কয়েকটি অংশে ভাগ করলে দেখতে পাব, এক একটি পাঠের উচ্চারণ ভঙ্গি, শব্দের তীব্রতা ও শব্দ-উচ্চারণের গতি নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মেনে চলে।

ধরা যাক একটি মন্ত্রের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি। একে নিম্নলিখিত তিনটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

ক. প্রথম বা পূর্ব অংশ = $\frac{১}{৫}$ ভাগ খ. দ্বিতীয় বা মধ্যম অংশ = $\frac{৩}{৫}$ ভাগ গ. শেষ বা সমাপ্তি অংশ = $\frac{১}{৫}$ ভাগ।

লক্ষণীয়, মন্ত্রের প্রথম বা পূর্ব অংশ পাঠের সময় যথাক্রমে উচ্চারণভঙ্গি শব্দের তীব্রতা এবং শব্দ উচ্চারণের গতি স্বাভাবিক পাঠের মতো থাকে। এই প্রথম অংশেই ব্যক্ত হয় মন্ত্রটি কি উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ হচ্ছে বা বিষয়ের মন্ত্র।

মন্ত্রের মধ্যম অংশে উচ্চারণের ভঙ্গি কিছুটা অস্পষ্ট হয়, শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু উচ্চারণের গতি ওঠে চূড়ান্ত পর্যায়ে। মন্ত্রের এই অংশেই থাকে মূল বক্তব্য।

মন্ত্রের শেষ বা সমাপ্তি অংশে মধ্যম অংশের তুলনায় উচ্চারণ ভঙ্গির সামান্য উন্নতি ঘটে। এই সময় শব্দের তীব্রতা ক্রমশ বেড়ে যায় ও 'উচ্চারণের গতি 'ফুঁ' দেবার সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে। এই অংশেই থাকে 'দোহাই দেওয়া' বা 'আজ্ঞা' ইত্যাদি বিষয়গুলি।

অবশ্য এই তিনটি অংশই সমস্ত মন্ত্রের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিতভাবে সত্য রূপে গণ্য নাও হতে পারে। বিশেষ করে যে মন্ত্র 'দোহাই' দিয়ে শুরু হয় তার ক্ষেত্রে নয়। আবার প্রথম অংশ মধ্যম অংশে বা মধ্যম অংশ প্রথম অংশে আবৃত্ত ও হয়। সংখ্যায় এই জাতীয় মন্ত্র খুবই স্বল্প। এরকম হলেও বুঝতে হবে উক্ত মন্ত্রটি মূলমন্ত্র নয়, একাধিক মন্ত্র থেকে সংগৃহীত প্রক্ষিপ্ত বা মিশ্র প্রকৃতির। গুণিনরা এই রকমভাবে একটি মন্ত্রের মধ্যে অন্য আর একটি মন্ত্রের পংক্তি সংযোজন বা বর্জন করে নেন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী। 'ভূতঝাড়ন', 'বাণকাটা' ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় গুণিন বিষয় ভেদে এই রকম গ্রহণ-বর্জন করে নেন। প্রযোজনে লিখে রাখেন। পরবর্তীকালে সেটি তাঁরই শিষ্য অবিকৃত পাঠ ও প্রয়োগ করতে প্রয়াসি হন।

তথ্যসূত্র

১. সুকুমার সেন। ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৭৮, ১৯৮৩

২. সুভাষ মিস্ত্রী। 'আবাদের ভাষা . সুন্দরবনের শব্দভাণ্ডার'। 'সমাজশিক্ষা', ৩২ বর্ষ ১০, ১১ সংখ্যা। ১৯৮৮

৩. দিব্যচরণ মৃধা। বাবার নাম—মৃত অক্ষয়চন্দ্র। বয়স ৪৯। গ্রাম-রামনগর, ডাকঘর—কে, আব বাজার, থানা—গোসাবা, জেলা—দঃ ২৪ পরগণা। তপসিলী (পৌণ্ড্র); কাশ্যপ গোত্র। চতুর্থ শ্রেণী। পেশা কৃষি। মাসিক আয় ৫০০। তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র সংগ্রহেব শেষ তারিখ ১৩-১১-৮২।

৪. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)। পিতা মৃত লক্ষ্মণচন্দ্র। বয়স—৬৮। গ্রাম-কচুখালি ৩ নং ডাকঘর—কচুখালী, থানা-গোসাবা। তপসিলী। কাশ্যপ গোত্র। পঞ্চমশ্রেণী পেশা-কৃষিকাজ। মাসিক আয় ৪০০। ১৮-১০-১৯৮৪

৫. নগেন্দ্র নাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

৬. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৭. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)। প্রাগুক্ত।

৮. শিবপ্রসাদ মৃধা। বাবা ঃ মৃত হরিপ্রসাদ। বয়স—৬৫। গ্রাম + ডাকঘর—বাঁকড়া ডোবর। থানা—হিঙ্গলগঞ্জ, জেলা —উত্তর ২৪ পরগণা। চতুর্থ শ্রেণী। পেশা—কৃষি। মাসিক আয়—৫০০। ১৮-১০-১৯৮৪

৯. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই) প্রাগুক্ত।

১০. দিব্যচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

১১.যুগলকৃষ্ণ মণ্ডল। পিতা—মৃতবিজয়কৃষ্ণ। বয়স ৬০। গ্রাম + ডাকঘর—রূপমারী। থানা—হাসনাবাদ। জেলা—উঃ ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় শ্রেণী। তপসিলী। কাশ্যপ গোত্র। পেশা—কৃষি। মাসিক আয় ৫০০। ৪-১১-১৯৮২।

১৩. ঐ

১৪ নগেন্দ্র নাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

১৫ পবেশচন্দ্র হাউলী।

১৬ নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

১৭. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

১৮ নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

১৯ ঐ।

২০.ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২১. দিব্যচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

২২. ঐ।

২৩. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২৪. নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

২৫. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২৬. লক্ষ্মীকান্ত হাউলী। পিতা · মৃত হ্বিপদ হাউলী। বয়স—৫৫। গ্রাম—বামনগব ডাকঘর—কে. আর—বাজার। থানা—গোসাবা। জেলা—দঃ ২৪ পবগণা। চতুর্থ শ্রেণী। তপসিলী সম্প্রদায়। কাশ্যপ গোত্র। পেশা—কৃষি। ২৪-১০-৮২

২৭. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২৮. মহাদেব মণ্ডল। (মাদাই), প্রাগুক্ত।

২৯. দিব্যচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

৩০. হরিপদ চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গের বাংলা মন্ত্র প্রসঙ্গে। 'মধুপর্ণী'। উত্তরবঙ্গ সংখ্যা ১৩৮৪। সম্পাদক—অজিতেশ ভট্টাচার্য।

৩১. পরেশ চন্দ্র হাউলী। প্রাগুক্ত।

৩২. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৩৩. দিব্যচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

৩৪. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৩৫. সৃষ্টিধর সর্দার। বাবা—ফটিক চাঁদ সর্দার। বয়স—৩৮। গ্রাম—মিত্রবাড়ী, ডাকঘর : সাতজেলিয়া, থানা—গোসাবা, জেলা—দক্ষিণ ২৪ পরগণা। তপসিলী উপজাতি। পরাশর গোত্র। দ্বিতীয় শ্রেণী। পেশা—কৃষিকাজ। আমাদের শেষবারের মত কথা হয় ১৬-২-৮৩।

৩৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস। বাংলা পীরসাহিত্যের কথা। ভূমিকা অংশ। ১৯৭৬

৩৭. ঐ।

৩৮. শোভারাণী চক্রবর্তী। বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা। প্রসঙ্গ—মুসলমানবিধি। ১৭৯—১৯৩ পৃষ্ঠা। ১৯৭৬।

২ : ৩ তন্ত্র ও মন্ত্র

অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের ধারা অনুযায়ী গুণিন তথা লোক চিকিৎসকগণ বলেন--'মন্ত্র' হতে 'তন্ত্র'। আগে মন্ত্র তারপরেই তন্ত্র। যদিও 'মন্ত্র' সমস্ত রকম শাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট উপাদান বা অপবিহার্য বিষয়রূপে চিহ্নিত হলেও কেবল মাত্র মন্ত্রকে নিয়েই 'মন্ত্রশাস্ত্র' পরিদৃষ্ট নয় ; অথচ তন্ত্র একটি বিশেষ 'শাস্ত্র' বলে গণ্য। মন্ ধাতুর উত্তর ষ্ট্রণ্ প্রত্যয় করে হয়েছে মন্ত্র--মনন কবা থেকে যা জাত। 'তন্যতে বিস্তার্যতে জ্ঞানমনেন ইতি তন্ত্রম্'--জ্ঞান বিস্তার করা হয় যার দ্বারা তাই তন্ত্র, তণ্ ধাতুর অর্থ বিস্তার প্রসঙ্গে এর উৎপত্তি। 'তন্ত্রী' বা 'তন্ত্রি' থেকে তন্ত্র শব্দ নিষ্পন্ন। এর বুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান। তন্ত্র শব্দের অন্ত 'ত্র' ত্রাণ বা মুক্তির নির্দেশ দেয়। সুতরাং যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধন-ভজন করলে জীব বা প্রাণী পরিশেষে মোক্ষলাভ করতে সক্ষম, তাই তন্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র। গোটা তন্ত্র শাস্ত্রই মন্ত্র নয়। যদিও বলা হয়--মন্ত্রের প্রসবভূমির তন্ত্রশাস্ত্র।[১] তন্ত্র সাধনার একটি বিশিষ্টতম পদ্ধতি, নির্দিষ্ট কোন 'বাদ' নয়। সাধারণভাবে এর আলোচ্য বিষয় দুটি ক. দর্শন বা যোগতন্ত্র, খ. ক্রিয়া বা ক্রিয়াতন্ত্র।

তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যত প্রকার 'শাস্ত্র' আছে তার মধ্যে তন্ত্রই প্রধান।[২] তন্ত্রোক্ত উপাসনা বলতে--মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, মুদ্রা, আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক স্বরূপ বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র ; পূজায় মৎস্য-মাংস-মদ্য-মুদ্রা-মৈথুন--এই পঞ্চ 'ম'-কার ব্যবহার ; কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি ষট্ কর্মের আশ্রয় গ্রহণ ও যোগানুষ্ঠান। ক্রম অনুসারে এইসব কাজ করলে দেবতা সিদ্ধি হয়, দেবতা বশীভূত হয়, সাধকের কাছে কোনো কাজই অসাধ্য থাকে না বলে বিশ্বাস করা হয়। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও বার বার প্রশ্ন উঠেছে--সমস্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনমন্দির 'বেদ' থাকতে আবার তন্ত্র কেন? তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন--'বেদং ব্রহ্মেতি সাক্ষাদ্বৈ জানহি' অর্থাৎ বেদকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বলে জানবে, এহং 'স্বয়ং প্রবর্ত্ততে বেদস্ত্যকর্তা নাস্তি' অর্থাৎ বেদ স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, কেহ তার কর্তা নেই। বলা হয়ে থাকে--ব্রহ্মা সত্য জগৎ মিথ্যা, মায়ার সংসারে সবই মায়ার খেলা, কর্ম করে যাও, ফলের আশা কোরো না ইত্যাদি দার্শনিক চিন্তা-চেতনা সব সময় সমস্ত মানুষের কাছে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়নি, কেমন যেন আলো-আঁধারির খেলা বলে মনে হয়েছে। আর্য দার্শনিকগণ যে বেদ বা শাস্ত্রের প্রচার করেছেন তার সঙ্গে লৌকিক মানুষের [সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ও কলি--যে যুগেই হোক না কেনো] সম্পর্ক একক নয়। একটু তুলনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। শাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ, অভ্রান্ত কিন্তু মানুষ সমস্ত বিষয়ে অভ্রান্ত নয় ; শাস্ত্র অপ্রমত্ত, মানুষ নিত্ত-প্রমত্ত। শাস্ত্র নিত্য কৃপানিধান কিন্তু মানুষ প্রতারণার নিদান। শাস্ত্র অনাদি অনন্ত, মানুষ অভ্রান্ত--জন্ম মৃত্যুর বশীভূত। শাস্ত্র যদি অতীন্দ্রিয় পদার্থের প্রদর্শক হয় তবে মানুষ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়েরই দাস। অপর দিকে শাস্ত্র নিঃস্বার্থ জগদ্‌গুরু কিন্তু মানুষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এই রকমের পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব সমূহের একত্রে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা ভ্রম-প্রমাদ-প্রতারণাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ 'মোক্ষ'--'মুক্তি'--

নির্বাণ ইত্যাদি বিষয় গুলিকে মানুষ কোনোদিন উপেক্ষা করতে পারেনি। বরং জীবনে বিশেষ এক পর্যায়ে এরই আকাঙক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। পৃথিবীর প্রমোদ-বনে সংসারাবদ্ধ মানুষ দেব-দেব বলে দুরারোহ বেদ-বৃক্ষের মোক্ষফল লাভে অপারগ হলেও কৈবল্য সিদ্ধি অনায়াসে অর্জন করতে সক্ষম হয় যে সাধনার দ্বারা 'শাস্ত্র ভাণ্ডাবের' সেই শেষ সাধনার নাম তন্ত্র-সাধনা।

নান্য ঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে।
যথা তন্ত্রোদিতোমার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ।।

অর্থাৎ ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ প্রাপ্তির জন্য এমন কোনো অন্যপথ নেই যেমন তন্ত্রোক্ত পথ সুখ ও মোক্ষ উভয়েরই নিমিত্ত হয়েছে।[৩]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তন্ত্রে পাশাপাশি দুটি বিষয় অবস্থান করে, ক. সাধন মার্গ। খ. প্রয়োগ মার্গ।

আমরা আমাদের সকল ধর্মের মূলাধারকে 'বেদ' বলে জেনে এসেছি। চিরায়ত এই অভ্যাস-অনুযায়ী বেদ চার প্রকার বললেও মূল বৈদিক সাহিত্য কিন্তু ঋক্, সাম ও যজুঃ এর পাশাপাশি অথর্বকে স্থান দেওয়া হয়নি ; যদিও সমস্ত বেদ মন্ত্রে বিরচিত। প্রাচীন ঋষিরা 'ত্রয়ী' শব্দ ব্যবহার করে 'বেদ' থেকে অথর্ববেদকে বৃন্তচ্যুত করেছিলেন। এই অথর্ববেদেই আছে প্রাক-আর্যকালের এদেশীয় বিভিন্ন রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার ইত্যাদির প্রয়োগ ও প্রচার। বেদের মধ্যে প্রধান হলো ঋক্। সাম ও যজুঃ তারই অনুক্রম বা পরিপূরক মাত্র। কাজেই প্রশ্ন ওঠে ঋক্ ও অথর্ব সমগোত্রীয় কিনা। বলা বাহুল্য, ঋক্‌বেদে আছে প্রার্থনা, স্তব-স্তুতি, আর অথর্ববেদে আছে প্রয়োগ-বিধি। এখানেও প্রশ্ন উঠেছে তা হলে অথর্ববেদ ও তন্ত্রশাস্ত্র কি এক? কারণ অথর্ববেদে যেমন স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা-প্রয়োগ মার্গের প্রসঙ্গ আছে, তেমনিই তন্ত্রশাস্ত্রেও আছে সাধন মার্গের স্তব-স্তুতি-প্রার্থনা, আছে প্রয়োগ মার্গের কলা-কৌশল। কিন্তু পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত--সাধনার নিম্ন স্তরের পন্থাই প্রয়োগ মার্গ। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই বিষয়ের লক্ষণ হলো--শত্রু, মিত্র কিংবা সমভাবাপন্ন যাই হোক না কেন, নিজের মঙ্গলের জন্য অপরের অনিষ্ট সাধনে কুণ্ঠিত না হওয়া, অপরের কোনো মূল্যকেই স্বীকার না করা। অনুরূপভাবে বলা যায়--চিরন্তন কল্যাণ সাধনের জন্য যেমন মন্ত্র রয়েছে, তেমনি মানুষের ক্ষতি সাধনের জন্যও মন্ত্র বর্তমান। শত্রুতা করে মন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সন্তান প্রসব বিঘ্ন ঘটিয়েছে, দেহের ক্ষত অংশ সারাতে দেয় নি, অন্যের ফসল বিনষ্ট করেছে, আবার ভালোবাসার রমণী অথবা পুরুষকে আয়ত্তে রাখার জন্য মন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, হচ্ছেও। এতে কেবল দেব-দেবী ও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের ভূমিকাই সব নয়, বিভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠান সহ নানা প্রকার গাছ-গাছড়া, মাটি, জল, বাতাস, ধাতু, চন্দ্র, সূর্য, দিন-ক্ষণ-মাস ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, হচ্ছে। অবশ্য অথর্ববেদের নানা প্রকার অভিচারও সাধন পদ্ধতি থেকে তন্ত্রের বিকাশ হয়েছে--অনেক পণ্ডিতই এমন মত পরিপোষণ করেন। তন্ত্র সাধনার পিছনে যে প্রাচীন মাতৃকা পূজা এবং যৌনাচার-ভিত্তিক ধর্ম-বিশ্বাস নিহিত, কোনো কোনো তন্ত্রে এর প্রেরণা মূল যে অথর্ব-সংহিতা তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। 'অথাও অথর্বণ সংহিতায়াং দেবুবাচ' [কালীকুলার্ণব তন্ত্রঃ মুখ

পত কারিকা]। মহাশক্তি স্বয়ং "অথর্ব বেদ শাখিনী" বলেও কথিতা হয়েছেন [রুদ্রযামল : ১৭ পটল]। তন্ত্রবিদ্যা 'অথর্ববেদ সার- সম্ভূত" বলে একাধিক তন্ত্র গ্রন্থে উল্লিখিত [যন্ত্রচিন্তামণি : ভূমিকা, কুলার্ণব তন্ত্র : ২/১০, ২/৮৫ ইত্যাদি]। তান্ত্রিক যন্ত্র এবং চক্রের অনুরূপ প্রচুরায়ত বর্ণনা অথর্ব সংহিতা সম্পৃক্ত। তান্ত্রিক সাধনার অন্তর্গত দেহ তত্ত্ব সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া যায় অথর্ব বেদের ১০/২/৩১-৩২ সূক্তে। এখানে দেহ কল্পিত হয়েছে 'পুর' অর্থাৎ নগররূপে। দেহরূপ নগরের আটটি চক্র এবং নয়টি দ্বার। এই দেহ-নগরের মধ্যেই হিরন্ময় কোষের অবস্থান। কোষ তিনটি জ্যোতি দ্বারা আবৃত। এর মধ্যে আত্মা যুক্ত যক্ষ রয়েছে। অর্থাৎ আত্মাকে আগলে আছে যক্ষ। তন্ত্র সাধনায় এ-জন্য 'দেহতত্ত্ব' ও 'কায়াসাধনা'র অপরিসীম গুরুত্ব। তন্ত্র মতে যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। দেহরহস্যের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের পরিচয়গত মূলসূত্র বর্তমান।

তন্ত্রশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রকরণ, তন্ত্র-নির্ণয়, দেবতা সংস্থান, তীর্থবর্ণন, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম ধর্ম, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্যাকর্তব্য, প্রাণিসংস্থান, পুরাণকথন, কোষ কথন, ব্রতবর্ণন, শৌচাশৌচন কথন, নরক বর্ণন, হরচক্রকথন, স্ত্রী-পুরুষ লক্ষণ, রাজধর্ম, যুগধর্ম, দানধর্ম ব্যবহার ও আত্মনির্ণয় ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত তাকেই তন্ত্রশাস্ত্র বলা হয়।[৪]

অধ্যাত্মসাধন শাস্ত্র হিসাবে তন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তত্ত্বের ও মন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে তন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। এজন্যই বর্তমান প্রসঙ্গে 'তন্ত্র' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বর্তমান হিন্দু ধর্ম বলতে যা বুঝায় তা তান্ত্রিক তত্ত্ব হতে বিচ্ছিন্ন করা মুশকিল। যা তত্ত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ সাধিত করে তাই তন্ত্র নামে অভিহিত। তত্ত্বজ্ঞান ও মন্ত্র সাধনার মাধ্যমে জীব সাধারণ উন্নততর স্তরে উঠতে পারে। তত্ত্ব = 'সৎ' বিষয়ক জ্ঞান ; মন্ত্র = 'চিৎ' বিষয়ক জ্ঞান। সৎ ও চিৎ-র মিলনেই আনন্দ। 'সচ্চিদানন্দ বিভব' হতে বিশ্বের সৃষ্টি। ভারতকোষের[৫] তন্ত্রে ৬৪টি তত্ত্ব আছে। ৫টি শুদ্ধ তত্ত্ব বা শিব তত্ত্বং ২৫টি অশুদ্ধ তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব ; ৬টি মিশ্র বা শুদ্ধাশুদ্ধ বা বিদ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি।

তন্ত্র শাস্ত্র কবে কোথায় কিভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, কত প্রকার শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তার কোনো সুসম্বদ্ধ পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈদিক অথবা তান্ত্রিক এই উভয় ধারা এদেশে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত ছিল কিনা কিংবা কোন ধারাটি প্রাচীন অথবা দেওয়া মাত্র ছাড়া আজও তার স্থির সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি ক্রমে হয় নি। তান্ত্রিক প্রথার প্রথম নিদর্শন দেখতে পাই—গুপ্ত যুগের তাম্রশিলা লিপির মারফৎ। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত 'কুব্জিকামততন্ত্রই' তন্ত্রের প্রথম পুঁথি রূপে কোনো কোনো পণ্ডিত দাবি করেন।[৬]

পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলা যেতে পারে—তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে তন্ত্রের মূলাধার কোনো পুস্তক নয়। তন্ত্র অপৌরুষের 'জ্ঞান' বিশেষ। এই জ্ঞানকে আগম বলে। এই জ্ঞানরূপ আগম শব্দরূপে অবতারণ করে। তন্ত্র মতে পরা বাক[৭] অখণ্ড আগম।[৮] পশ্যন্তী অবস্থাতে ইহাই—স্বয়ং বেদ্য রূপে প্রকাশিত বা স্বয়ং প্রকাশ। এখানে দ্বিতীয় বা অপরের মধ্যে জ্ঞান

সঞ্চারের কোনো প্রশ্ন থাকে না। এই জ্ঞান মধ্য রাতে অবতীর্ণ হয়ে শব্দের আকার ধারণ করে। শব্দ চিন্তাত্মক। এই চিন্তাত্মক ভূমিতেই গুরু-শিষ্যের ভারের উদ্ভব। এরই ফলে এক আধার হতে অন্য আধারে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন শাস্ত্র ও গুরু পরম্পরায় প্রাকট্য মধ্যমা ভূমিতেই হয়ে থাকে। বৈখরীতে[৯] এই জ্ঞান বা শব্দ স্থূলরূপে ধারণ করে। তখনই তা অন্যের ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত হয়। তন্ত্রে যে মতবাদ দেখতে পাওয়া যায় তা হলো যথাক্রমে অদ্বৈত, দৈতাদ্বৈত এবং দ্বৈত। এই শাস্ত্রে 'আগম' 'নির্গম' ও 'রহস্য' প্রায় সমার্থক।

তন্ত্র মতে মানুষকে নিদ্রিত থাকলে চলে না। তাকে জাগাতে হবে—'প্রবুদ্ধঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ', যে পূর্ণত্বকে মানব জীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করা হয়, উপলব্ধির জন্য অনাদি নিদ্রা হতে জাগরণ বা প্রবোধন ; এরপর আত্মার[১০] ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির মার্গে পরম শিব, পরাসংবিৎ অথবা পরমসত্তার সাক্ষাৎ লাভ করা।

তন্ত্র সাধনায় উপাস্য ও উপাসকের অর্থাৎ ব্রহ্মা ও জীবের ঐক্যানুভূতির সহায়তা করাই হলো অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই উপাসনায় শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। ফলে শিব ও শক্তি অভিন্ন। তত্ত্ব হিসাবে তান্ত্রিক উপাসনায় যথাক্রমে পতি (ঈশ্বর), পশু (জীবাত্মা) এবং পাশা (সংসার বন্ধন)—এই ত্রিবিধ তত্ত্বকে সিদ্ধান্ত মতে স্বীকৃত। তন্ত্র সাধনায় বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত মতের দেবতারা হলেন নিম্নরূপ :

বৈষ্ণব দেবতা : বিষ্ণু / নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, বাসুদেব, বালগোপাল, দধিবাসন, লক্ষ্মী-নারায়ণ নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতি।

শৈব দেবতা : শিব, মৃত্যুঞ্জয়, বটুক ভৈরব, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি।

শাক্ত দেবতা : কালী, তারা, ভৈরবী।

তন্ত্র সাধনার চরম আদর্শ শাক্ত সাধনা। এই সাধনার লক্ষ্য মহাশক্তি জগদম্বাকে মাতৃরূপে উপাসনা অথবা শিবোপাসনা। সৃষ্টি, পালন, সংহার, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ এই পাঁচ প্রকার কাজের মুখ্যত কর্তা হলেন একমাত্র পরমেশ্বর বা শিব। এই জন্য তন্ত্রে সর্বত্র পরমেশ্বর[১১] পঞ্চকৃত্যাকারী রূপে বর্ণিত। মহেশ্বর হলেন এখানে হেতু কর্তা ও শক্তি তাঁরই কারণ। এই সাধনার মূল লক্ষ্য পূর্ণত্বলাভ। পূর্ণত্বলাভের জন্য অপরিচ্ছন্ন শক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা। শক্তির সংকোচের দরুণ হয় জীব বা প্রাণীর অপূর্ণতা অথবা বন্ধন এবং শক্তির বিকাশেই তার পূর্ণতা ও মুক্তি। সদগুরুর দীক্ষার মাধ্যমে জীবের এই প্রসুপ্তা-শক্তি জাগরুক লাভ করে ও তারই ফল স্বরূপ শিবোপাসনা সম্ভব হয়। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই উপাসনায় যথাক্রমে মাতৃকাপূজা, যুগল আরাধনা ও উর্বরতা-সাধনা—এই ত্রিলব্ধ ফল সমাহৃত। যার মাধ্যমে বা সহায়তায় এই ত্রয়ী ফল লাভ সম্ভব সেই 'সদগুরু' হলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যিনি দৃষ্টির্ষি বা শ্রুতর্ষি নামে অভিহিত।

তন্ত্রে গুরুর আসন অতি উচ্চে শুধু নয়, গুরু বাক্যই তান্ত্রিকদের তত্ত্ব—গুরুই সাক্ষাৎ দেবতা। কুলার্ণব তন্ত্রে গুরু সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ধনমূলং গুরোমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোপদম।
মন্ত্রমূলং গুরোবাকং মোক্ষমূলং গুরোকৃপা।।

লৌকিক মন্ত্র সাধনায় গুরুকে 'পরমজ্ঞান' করা হয়ে থাকে। গুরুই মোক্ষ বা মন্ত্রসিদ্ধির

একমাত্র উপায়। তন্ত্র সাধনায় এই লৌকিক রূপটিকে কি শাস্ত্রীয় মোড়কে ব্যবহার করা হয়েছে--এমনতর প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। [এই প্রসঙ্গের আলোচনা এই অধ্যায়েরই শেষের দিকে করা হয়েছে।]

তন্ত্র সাধনায় ফল সিদ্ধির জন্য সাধককে ছয় প্রকার ক্রিয়া পদ্ধতির যে কোনো একটি অথবা সবকটিই অনুসরণ করা চলে। ক্রিয়া পদ্ধতি গুলি নিম্নরূপ :

ক. ভুবন -ভগবান ভুবনাদি[১২] চিদানন্দময় শিব রূপেরই ধ্যান চিন্তনেই ভুবনেশ্বরত্ব লাভ।

খ. বিগ্রহ--ব্রহ্মাদি কারণ দেবতাগণের বিগ্রহ চিন্তনে তদরূপতা লাভ।

গ. জ্যোতি বা বিন্দু--ধ্যান করলে যোগসিদ্ধ হয়, ত্রিকাল[১৩] জ্ঞান হয়। যোগের প্রকর্ষবশতঃ জ্যোতির সঙ্গে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয় এবং শ্রেষ্ঠ যোগপদে প্রতিষ্ঠা হয়।

ঘ. ব্যাপিনী বা আকাশ--ইহার ধ্যানবশতঃ পূর্ণ্যাত্মভাবের[১৪] উদয় অন্তে বিন্দুত্ব জন্মে। অতঃপর বিন্দু-ধ্যানে যোগসিদ্ধি হয়।

ঙ. নাদ বা শব্দের ধ্যানে শব্দাভাব ও সমস্ত বাঙ্ময় অধিকার জন্ম।

চ. মন্ত্র -জপ, হোম ও অর্চনাদির দ্বারা আরাধান্তে ফলস্বরূপ মন্ত্রসিদ্ধ হয়। মন্ত্র সিদ্ধিতেই সর্বসিদ্ধি।[১৫]

তন্ত্রের প্রবর্তক ঋষির নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা না গেলেও নেপাল রাজ দরবারের গ্রন্থালয়ে প্রাপ্ত মহিমস্তোত্রের এক পুঁথিতে বলা হয়েছে 'সর্বসামুপনিষদাং দুর্বাসা জয়তি দেশিকঃ প্রথমঃ।' তান্ত্রিক সাহিত্যে 'ক্রোধ ভট্টারক' নামে দুর্বাসার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিই শ্রীকৃষ্ণকে চৌষট্টি অদ্বৈত কলা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেন। তন্ত্র শিক্ষা গুরু-পরম্পরা প্রদত্ত হয়েছে। আদি গুরু শিব হতে বশিষ্ট, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্করাচার্য এবং পরবর্তী কালে বোধঘন, জ্ঞানঘন প্রভৃতি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, স্কন্দ, বীরভদ্র, লক্ষ্মীশ্বর, মহাকাল, মন্মথ বা কাম প্রভৃতি তান্ত্রিক উপাসক বা প্রবর্তক। ব্রহ্মাযামলানুসারে উশনা, দধিচি, বৃহস্পতি, সনৎকুমার, নকুলীশ, জয়দ্রথ, যামানানুসারে দুর্বাসা, সনক, বিষ্ণু, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, সংবর্ত্ত, গলব, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য, শাতাতপ, আপস্তম্ব, জাত্যায়ন, ভৃগু প্রভৃতি তান্ত্রিক মার্গের উপাসক ছিলেন।

তন্ত্র সাধনায় 'পীঠের' স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন তান্ত্রিক বিদ্যার সাধনা প্রত্যক্ষ অনুভব ও যোগ্য আধারে বিদ্যা সমর্পণ—কামরূপ, জালন্ধর, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান প্রভৃতি পীঠে হত। পরবর্তী কালে বৌদ্ধগণ নালন্দা বিক্রমশীলা, উদন্তপুরী, বিভিন্ন স্থানে এই প্রাচীন পীঠের অনুকরণে তন্ত্র বিদ্যাভ্যাস ও প্রচার করতেন। গোটা দেশে সম্পূর্ণরূপে উনপঞ্চাশ অথবা পঞ্চাশ পীঠ বর্তমান। এই পীঠ সমূহ তন্ত্রপীঠ, বিদ্যাপীঠ, মন্ত্রপীঠ, প্রভৃতি নামে খ্যাত। 'পীঠ' শব্দ 'জাগ্রত শক্তি' সম্পন্ন স্থানকে বুঝায়। সেখানে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কারাদির বিষয় অব্যক্ত অলিঙ্গের ব্যক্ত জ্যোতিঃ স্বরূপ লিঙ্গরূপ ধারণ করে। অম্বিকা ও শান্তা শক্তিদ্বন্দ্বের 'সামরস্য' যে স্থানে তাই প্রধান পীঠ। সেখানে অলিঙ্গ অব্যক্ত মহাপ্রকাশ পরম জ্যোতি রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই পীঠের পরিভাষিক নাম হলো পরাবাক্। এই প্রকার যেখানে ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া এবং বামা-জেষ্ঠা ও রৌদ্রীর সামরস্য হয়েছে সেই

সব স্থানে সেই রকম পীঠরূপে পরিণত।[১৬]

তন্ত্রের বহুবিধ ধারার মধ্যে আর একটি হলো অথর্ব-বৈদিক ধারা যা ঋক-বৈদিক ধারার সঙ্গে বহুলাংশে পৃথক। বৈদিক উপাসনাক্রমে অনেকাংশ তত্ত্বতঃ তান্ত্রিক ধারার সঙ্গে একত্রে গ্রথিত বা অতি প্রাচীন কাল থেকে পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। বেদের উপনিষদ ভাগে গুপ্তবিদ্যা অর্থাৎ সম্বর্গ, উদগীথ, উপকোসল, ভূমা, দহর, পর্যঙ্ক প্রভৃতি রহস্য অংশ সমূহ এই বিদ্যারই অন্তর্গত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন, এই গুপ্ত বিদ্যাসমূহের চর্চাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক।

ভারতবর্ষে সাধনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা অর্থাৎ 'যত মত তত পথ' পরিদৃষ্ট হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে সমস্ত পথেরই লক্ষ্য এক। তন্ত্র সাধন-সংস্কৃতি এবং ভারতীয় অন্যান্য সাধন-সংস্কৃতি স্ব স্ব মহিমায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও মূল ঐক্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছে—যা ভারতীয় সাধনায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর Indian Philosophy খণ্ড ২ [১৯২৩], খণ্ড ১ [১৯৪৮] গ্রন্থের নানা জায়গায় যা বলেছেন, মূলতঃ তা হলো—সমস্ত দার্শনিক মতবাদগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী আনন্দের উপাদান হিসাব পরিসমাপ্তি হয়নি, একই সঙ্গে জীবন চর্যায় উন্নতির উপায় হিসাবেও গ্রহণ করেছে। দুঃখ, দুঃসমুদয়, দুঃখ নিবৃত্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ই যেন ভারতীয় সমস্ত দর্শনের মৌলিক সত্য। 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মত অনুধাবনযোগ্য। তাঁর মতে ভব-দুঃখের কারণ অজ্ঞান [অবিদ্যা বা মায়া]। এবং নিবৃত্তির উপায় জ্ঞান, ধ্যান, সংযম ইত্যাদি পন্থার আশ্রয়। পরিশেষে ইহাই মুক্তি আনতে সক্ষম। সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে যতই তাত্ত্বিক মতভেদ থাকুক, দার্শনিক মতবাদে সাধনার ক্ষেত্রে ভিতর বাহির যাই-হোক, মূলগত ঐক্যের মনোভাবটি সুস্পষ্ট। দেশ-কালের ব্যবধান, সম্প্রদায়-শ্রেণীগত ব্যবধান একে বিনষ্ট করতে পারেনি। তাই বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ-গীতা, বৈষ্ণব-সহজিয়া, শৈব-শক্তি, সৌর-গাণপত্য, নাথ-বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধনার মধ্যে একের সঙ্গে অপরের মূলগত ব্যাপারে রয়েছে গভীর ঐক্য।

এই ঐক্য একদিনে সম্ভব হয়নি। নানা মত ও পথ ঘুরে তবেই তা সম্ভব হয়েছে। তান্ত্রিক সংস্কৃতির অভ্যন্তরেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেশ-কাল ক্ষেত্র ভেদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়—যদিও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলগত সাম্য বিদ্যমান। আসলে, উপাস্যগত ভেদই উপাসনা, ক্রিয়াদি ও আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির ভেদকে অনিবার্য করে তুলতে বাধ্য। কালক্রমে এই সব ভেদ বা বিভেদ বহুবার বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য এই ত্রয়ীধারার কথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ থাকলেও এদেরই সম্প্রদায়গত পার্থক্য বর্তমান। যেমন—শৈব বা শৈবশক্তি মিশ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত শৈব, বীর বা জঙ্গম শৈব, রৌদ্র পাশুপাত, কাপালিক বা মহাব্রত বা সোম, বাম, ভৈরব ইত্যাদি, অদ্বৈত মতে শৈব, ত্রিক, প্রত্যাভিজ্ঞা প্রভৃতি এবং শক্তির প্রাধান্যমূলে যথা স্পন্দ, মহার্ঘ, ক্রম ইত্যাদি, শিবাগম প্রভৃতি দশ এবং রুদ্রাগম প্রভৃতি আঠারোটি সম্প্রদায় ; দ্বৈতমতের মধ্যে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ইত্যাদি ; কালমুখ ও ভট্টনামক সম্প্রদায় ; কৌলে, ক্ষপণক, দিগম্বর, বামক প্রভৃতি সম্প্রদায় বর্তমান ছিল।

একসময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বহির্ভারতেও তন্ত্রসাধনার বিস্তার ঘটেছিল। ভারতীয় সাধন মার্গের বিভিন্ন স্তরে বহির্ভারতীয় অনেক ধারাও সন্নিবেশিত হয়—কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় আমরা যে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখি, তা থেকেই প্রতীতি জন্মে। তন্ত্র মধ্যে 'হাদি' ও 'কাদি' ছাপান্নটি দেশে প্রচলিত ছিল। পূর্ব ভারতে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, কামরূপ, উৎকল, মগধ, পীড়, সিলহট্ট, কীকট ইত্যাদি ; দক্ষিণ ভারতে—কেরল, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, মলয়াদ্রি, চোল, সিংহল, প্রভৃতি ; পশ্চিম ভারতে—সৌরাষ্ট্র, আভীর, মৎস্য, সৈন্ধব প্রভৃতি , উত্তর ভারতে—কাশ্মীর, সৌরসেন, কিরাত, কোশল প্রভৃতি এবং মধ্যভারতে—মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, মালব, আবন্তক ইত্যাদি। ভারতের বাইরে যতদূর জানা গেছে, তার মধ্যে বাহ্লীক, কাম্বোজ, ভাট, চীন, মহাচীন, নেপাল, হূণ, কৈকেয়, মদ্র, যবন প্রভৃতি।[১৭]

'শব্দ কোষে' বলা হয়েছে তন্ত্র ক্লীলিঙ্গ—তন্ + এ (ষ্ট্রণ)—ক। যার অর্থ :

ক. শাস্ত্রীয় বিধি পরম্পরা। খ. প্রধান বচন গ. অভিচার মন্ত্র ঘ. বেদশাখা বিশেষ. ঙ. শাস্ত্রসূত্র চ. শিবপ্রোক্তশাস্ত্র বিশেষ বা তন্ত্রশাস্ত্র। [১৮]

এই অর্থ সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তন্ত্র উপাসনা বা তন্ত্র মন্ত্র-নিরপেক্ষ নয়। মন্ত্রের উচ্চারিত ধ্বনি-স্পন্দনের মধ্যে মন্ত্রের এক যুক্তিগ্রাহ্য শক্তিময় সনাতন এবং চিরন্তন সত্তার কথা বলা হয়ে থাকে—মানুষ যা স্মরণাতীত আদিমকাল থেকে বিশ্বাস করে আসছে। তন্ত্রে সেই একই চিরন্তন সত্তায় বিশ্বাস করা হয়েছে। বারংবার আবৃত্তি ও উচ্চারণের ফলে মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে সঞ্চারিত শক্তিরই মূর্ত প্রতীক হল মূর্তি। তাই তন্ত্রের সমস্ত শাখাতেই মন্ত্রের গুরুত্ব সমধিক। তন্ত্রকে 'পঞ্চমবেদ'[১৯] বা 'শাস্ত্র' যে নামেই অভিহিত করা হোক, অথর্ব-সংহিতারই মত এই পঞ্চম বেদ মূলত গার্হস্থ্য-উৎসব-কেন্দ্রিক বা গৃহ্যকৃতীয়। লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাসেই এর বাড়-বাড়ন্ত ও বিকাশ। আদিম ধর্মানুভূতি জনিত ইন্দ্রজাল চেতনা এর মানস-প্রেরণাকে দৃঢ় করেছে। তান্ত্রিক মন্ত্রের ক্ষেত্রে পঞ্চাশৎ বর্ণমালার অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণের এক বা একাধিক ধর্ম নিয়ে রচিত হয়েছে বিভিন্ন বীজ। মন্ত্রের মত তন্ত্রের মুখ্য উপজীব্য—বাস্তব জগতকে কেন্দ্র করে মানুষেরই অর্থাৎ যজমানের কামনা-বাসনা-প্রার্থনা বা উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে দেবতার প্রশস্তি ও আজ্ঞাবহ করা। কি বৈদিক-তদনুযায়ী পৌরাণিক, কি তান্ত্রিক—সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উদ্দিষ্ট দেবতা এবং দেবী একই—মন্ত্র বিনিয়োগের পূর্বে যথাবিধি তাঁদের উল্লেখ একটি আব্যশিক কৃত্য। বৈদিক মুখ্য বীজের মত তন্ত্রেরও মুখ্য বীজও একটি। তাহল—প্রণব বা ওঁকার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কিংবা বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব, সৌর যে কোনো সম্প্রদায় তন্ত্র সাধনা করতে পারেন। সমাজে বৈদিক ক্রিয়া কলাপ একেবারে বিলুপ্ত না হলেও পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রত পূজা আজকাল পূর্ণ বা আংশিকভাবে তান্ত্রিকতার ছায়াবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেই কারণেই বলছিলাম—কেবল মাত্র ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকই যে তান্ত্রিক সাধনা বা দীক্ষা গ্রহণের অধিকারী তা নয়, আচণ্ডাল পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই এতে অধিকার আছে। তন্ত্রের ষটকর্মের ও কৌলাচারের অনুরূপ ক্রিয়া উপসনায় মদ্যাদির ব্যবহার, মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস—বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাক্তন ধর্মের এইগুলিই ছিল প্রধান অঙ্গ। ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষ অধিকার প্রদান তন্ত্রের

যে একটি সর্বজনীন রূপ দেখতে পাওয়া যায় তা লৌকিক মন্ত্র সাধনার প্রেক্ষিতেও একটু সর্বগ্রাহ্য রূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র। একাগ্রতা, সংযম, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস এই সর্বগ্রহ্যতার চাবিকাঠি। ঐহিক ফল লাভই তন্ত্রের মূল লক্ষ্য--যা মন্ত্রে প্রতিনিয়ত ব্যক্ত। এর জন্য অন্যান্য শাস্ত্রীয় সাধনার মতো দেবতার আনুকূল্য বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর না-করলেও চলে। সাধনার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে তন্ত্র এবং মন্ত্রের এটাই সবথেকে বড় অবদান। অবশ্যই তন্ত্র সাধনা অপেক্ষাকৃত কঠিন। প্রচুর উপাদান--উপকবণেব প্রয়োজন পড়ে। আচার-পদ্ধতিও অগুণতি। তান্ত্রিক আচার দ্রাবিড়াদি বিভিন্ন অনার্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, ভারতীয় আর্যগণ এইসব আচার ইত্যাদি গ্রহণ করে নিয়মাবদ্ধ করেছিলেন খ্রীস্টের জন্মের সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেই। অপরকে বশীভূত করার জন্য, আয়ত্তে আনার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া কলাপ প্রাচীনকালে বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল। একেই বলেছেন স্যার জেমন ফ্রেজার বলেছেন Sympathetic বা imitative magic। সোম বা ঐজাতীয় কোনো দ্রব্যের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষেব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে, উক্ত প্রতিকৃতিতে অভিমন্ত্রিত করা, শত্রুর অঙ্গ ইত্যাদি কিংবা প্রাণনাশের জন্য নখাদির দ্বারা ওই প্রতিকৃতি আহত করা, অগ্নিতে দ্রবীভূত করা সেমেটিক বা ইরানীয়দের মধ্যে বর্তমান ছিল।

মন্ত্র সাধনা ও মন্ত্র বিনিযোগের ক্ষেত্রে এমনতর আবশ্যকতার আদৌ প্রয়োজন নেই। যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে বুঝতে হবে, তা তান্ত্রিক প্রভাবিত। সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য যৎ-সামান্য উপকরণ ইত্যাদিই যথেষ্ট বলে গণ্য। অনেক সময় কোনো উপকরণাদির প্রয়োজন পড়েই না। সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে কাজ করবার সময়, পেটের ব্যথা ঝাড়াবার সময়, গরু-ছাগল-ঘোড়া-মহিষ চরাবার সময়, চালান-গণ্ডীকরণের সময়, সর্প দংশনের ব্রহ্ম চাপড়ের সময় ইত্যাদি নানা প্রকারের মন্ত্র আছে যা বিনিয়োগের সময় কোনো উপাদান লাগে না। লৌকিকতার এইক্ষেত্রকেই শাস্ত্রীয়রূপ দিতে গিয়েই তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ একটা বিধি-আরোপ করেছেন। ফলে তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রও যেমন পৃথক, তেমনি সময়ও পূর্ব পরিকল্পিত। অমাবস্যার রাত, শ্মশান, আকস্মিক মৃত্যুজনিত শবই সাধনার কালে প্রকৃষ্ট। অর্থবন সংহিতায় যে সমস্ত মারণ, উচাটন, বশীকরণ, ঝাড়-ফুঁক, শান্তিকরণ, স্তনন, সম্মোহন ইত্যাদি রয়েছে তাহাই বিভিন্ন স্তরের সকল শ্রেণী ও সমাজের মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ী নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করা হয়। শ্মশানে শব-সাধনা করা হয় বলে যথেষ্ট সাহস ও সংযমের প্রয়োজন। তন্ত্র সাধনাকে 'বামাচার সাধনা'ও বলা হয়ে থাকে। কারণ উপযুক্ত সাধনসঙ্গিনী রেখে সাধক সিদ্ধির পথে ক্রম-অগ্রসর হন। এখানে ইন্দ্রিয়-পরতা প্রশ্রয় পেলেও এই ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কার্যাবলীর উদাহরণ গ্রীস ও রোমে 'পান' পূজা বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো কোনো গোষ্ঠীর ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। আবার নায়ক-নায়িকার প্রেম ও রতি সুখ ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে ভগবদুপাসনার রূপক রূপে কল্পনা করার বিবরণ সুফী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়। নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে ভগবদুপাসনার প্রথা তন্ত্রের মত খ্রীস্টান সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যেও বর্তমান।[২০] তন্ত্রে সম্ভবত এই 'বামাচার' প্রক্রিয়া থাকার জন্য তন্ত্রের মন্ত্রাংশে অশ্লীলতা প্রসূত হয়েছে। এই অশ্লীলতা বাংলা লৌকিক মন্ত্রের বিশেষ করে, সর্প দংশন জাত রোগ চিকিৎসার 'ঝাঁপান সার' বা 'ভূত ঝাড়ান' কিছু

মন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে রুচির প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। তবে, দেখা এবং ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। বিশ্বাস এবং যুক্তির মেল বন্ধন সব সময় সংঘটিত হয় না বলেই এত দ্বন্দ্ব এত সংঘাত। অবশ্য এমন বহু মন্ত্র আছে যা দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট। তন্ত্রের শাস্ত্রীয় বিধি-বিধানের মত পরিশীলন প্রক্রিয়া প্রযুক্ত না হওয়ায় মন্ত্রে এই ত্রুটিই রয়ে গেছে। তাছাড়া একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সমস্ত মন্ত্র সার্থক ভাবে বুঝতে বা অনুধাবন করতে হলে যেকোনো ভাষা বা সম্প্রদায়ের মন্ত্রেরই মত পর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান, যজমান তথা তার আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও পরিবেশিক বিষয়ে সুস্পষ্ট ও গভীর জ্ঞান আবশ্যক। বলা বাহুল্য বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রেরই মত বাংলা লৌকিক মন্ত্রেরও পুষ্টি এবং আভিচারিক উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি বর্তমান এবং খানিকটা সর্বজনীনতার প্রভাব হেতু বর্তমান সমাজে প্রচলিত পূজা পদ্ধতি বিমিশ্র বৈদিক-পুরাণিক-তান্ত্রিক মন্ত্র সম্মেলনে একটি মিশ্রধারা নৈমিত্তিক জীবন যাপনেব সঙ্গে প্রবহমান।

অতঃপর তন্ত্র ও মন্ত্রের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

ক. মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র :

আদৌ প্রাসাদবীজং তদনু মৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতিশ্চ।
প্রোচ্চার্য্যএাম্বকং যো জপতি মৃতিহরং সংপুটং চানুলোসাৎ।
মৃতিহরংএ্যক্ষরমৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রং।
ওঁ হুঁ সঃ।
অস্য জপাৎ সর্ব্বসিদ্ধির্ভবতি।[২১]

অর্থাৎ হৌং ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ সঃ এ্যাম্বকং যজামহে যুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্বরুকমিব বন্ধনামৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ হৌং ওঁ জুং সঃ ওঁ ভূভজঃ মঃ। এই মন্ত্রে জপে সর্বকার্য্য সিদ্ধি হয়ে থাকে।

খ. বশীকরণ ·

কাকজিহ্বা বচাকুষ্ঠং আত্মনো রুধিরং স্ত্রিয়ঃ। তত্তাবিতজ্জ মঞ্জিৎষ্ঠা ত্যারং সৌরসর্ষপাঃ।

শিব নির্ম্মাললঃসংযুক্তংসমুভাগানি করয়েৎ। ভোজ্যপানেহথবা দেয়াব স্ত্রীণান্ত বশকারকাঃ।

নিত্যংপুরুষামিচ্ছন্তী মৃতমপ্যনুগচ্ছতি।। সিদ্ধিমন্ত্র ওঁ হ্রীং হ্রীং থ্রেং ঐং লং ওঁ ভৌ স্বাহা।

কাকের জিহ্বা, বচ, কুড, নিজের এবং স্ত্রীররক্ত মঞ্জিষ্ঠা এবং শ্বেত সর্ষপ, তগর বৃক্ষের মূল ও বিল্বপত্র এই সকল সমভাগে নিয়ে একত্রে চূর্ণ করবে। সিদ্ধমন্ত্রপাঠ কর এই চূর্ণ স্ত্রীলোকের খাদ্যবস্তু কিংবা পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে পান করতে দেবে। অনন্তর যে স্ত্রীলোক পান বা আহার করবে সেই স্ত্রীলোকই পুরুষের বশীভূত হবে। এমনকি পুরুষ মরলেও তার অনুগামী হয়।[২২]

চন্দনপড়া : বাংলা লৌকিক মন্ত্র : বশীকরণ :

কাম মালিনী বোনে কাঁদে যোগিনী দেয় সাড়া। সাত সতীনে পুড়িয়ে মেরে কল্লে ভাজা পোড়া।।

শ্মশানে থেকে উঠে শিব চন্দনে দিল বর। ফোটা ওণে মর পায়ে তেল পড়।।
এই কথা যদি নড়ে। শিবের জটা খসে মহাদেবের পায়ে পড়ে।
কার আজ্ঞে কাউরের কামুক্ষার আজ্ঞে। শীঘ্র শীঘ্র লাগ।[৩]

স্বামী বিমুখ হলে স্ত্রী রক্ত চন্দন ঘষবে স্নানের পর। তারপর সাতবার এই মন্ত্র পড়ে কপালে ফোটা দিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়াবে। স্বামী ফোটার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বশীভূত হবেন।

গ হীরাবাণ বাংলা লৌকিকমন্ত্র সর্পবিষ নাশন

দেবী আইলেন রথে ঠাকুর আইলেন নায়। চন্দ্রসূর্য কাঁপে আমার হীরাবাণের ঘায়।।
ওহিরা ও হিরা পাথর যায় চিরাসমুদ্র না মানে টান
পর্বতগড় গণ্ডীকুণ্ডলী ভাবরান গাঁট গাটুলী।। তন্ত্রমন্ত্র গাছ-গাছড়া ধূলার মোড়ন
গামছার মোড়ন গেছো প্রেত যারা আছে সব কেটে করিলাম খান খান।
আমার এই বাণ যদি ফেরে মহাইন্দ্র কপালের জটা ছিঁড়ে পদতলে পড়ে।
হুংকারে পাহাড় পর্বত চূর্ণ করে করিলাম বিদায়।। আমার এইকথা যদি নড়ে
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়ে ভূমিতলে পড়ে।।[৪]

মূলত এটি একটি 'বাণকাটা' মন্ত্র। মন্ত্রটি তন্ত্র প্রভাবিত। প্রচুর উপকরণ লাগে এই 'হীরাবাণ' প্রয়োগ করার সময়। আট রকম গাছের কাটা এবং সাত ঘাটের জল নিয়ে এই মন্ত্র পড়তে হবে। তার পূর্বে লাল হেনার কয়লা দিয়ে একটি মাটির নতুন সরায় নিম্নের চিত্রটি আঁকতে হয়। এই সরাটি রাখতে হবে 'ওমা মনসাদেবী' লেখা একটি শিলের উপর। এবার উপরের বাতা থেকে ঝুলে পড়া একটি দড়িতে রোগীর হাত ধরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু শিলের ওপর রাখা সরার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এই সব করার পর যদি সরা না ভাঙে বুঝতে হবে যে অন্য গুণিনে 'বাণ' মেরেছে, না হয় গাঁটুল করেছে। সেই কারণেই রোগী সুস্থ হচ্ছে না।
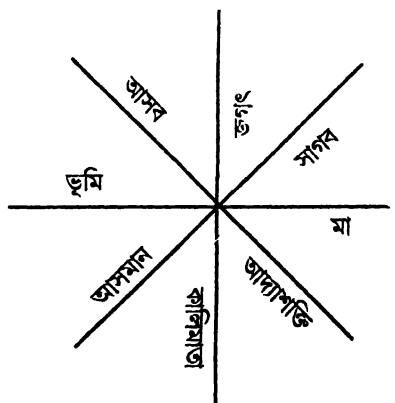
এইসময় নারকেল, এক ডাকে ক্রয় করা এক বোকা রুমাল, চৌদ্দ ইঞ্চি পেবেক, বরণশয্যা প্রভৃতি নিয়ে মা মনসার 'আসর' বসিয়ে যা পূজা করে পুনরায় 'হীরাবাণ' প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ নদীবন্দ খিলেন বাংলা লৌকিকমন্ত্র :

আল্লাহি হাঁকোর--কুম্ভির মুখে মারি
ছোটে সনাতন ঘোষের দহাই লাগে।
ব্রজের খিল। যদি আমার এই খিল
আল্লাবছুল মহাদেবের দহাই, দহাই বাবা গোঁবাচাঁদ।

দোহাই বাবা গোরাচাঁদ। দহাই বাবা আলি। শত্রুব মুখে মারো ব্রজের তালি। [২৫]

যে সময় মৎস্যজীবীগণ নদীতে মাছ ধরতে যান তাঁরা নদীবন্দ করে হাঙর-কুমিরের মুখে খিলান দেন বা অকেজো করে দেন মন্ত্রের সাহায্যে। বর্তমান নদীবন্দের খিলেন মন্ত্র প্রয়োগ করবার সময় গুণিন বাউলে যে উপকরণ ব্যবহার করেন তা এইরকম :

সুন্দরী অথবা হেঁতাল গাছের ডাল নিতে হবে গাছের গোড়া থেকে। ডালটি হবে সোয়া হাত অর্থাৎ একহাত চার আঙুল লম্বা। উক্ত ডাল অভিমন্ত্রিত করে এক নিশ্বাসে চেপে মাটির মধ্যে পুঁতে দিতে হবে সম্পূর্ণটা ; এবং অবশ্যই নদীতে হাঁটু জলে নেমে। মন্ত্র পড়তে হবে অঞ্জলি করে জল তুলে।

ঙ, সরিষা পড়া : ভূত নামান : বাংলা লৌকিক মন্ত্র :

শ্বেতপীত কাল সরিষা।
তোর বাণের চোটে গগন ফাটে।
ডাকিনী যোগিনী ভূত-প্রেত।
সব সাইয়া ক্ষেত, তোর দৃষ্টিতে পালাইয়া যায়।
কাউরার কামাক্ষার মায়ের আজ্ঞা
চালিস ফিবিস ভ্যাইসা।।
ঈশ্বর মহাদেবের জটা কাটে।।
কাল কাল আর পীত শ্বেত।।
কার আজ্ঞা?
হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।[২৬]

সরিষা নিয়ে অভিমন্ত্রিত করে আঁচে দিতে হবে। ফুটে উঠলে উক্ত তপ্ত সরিষা ঝাঁটার কাঁঠিতে করে ভূতগ্রস্ত রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

১. তন্ত্রতত্ত্ব। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য। ১৩৮৯

২. রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত)। বৃহৎতন্ত্রসার : ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য। ১৩৮৯

৩. তন্ত্রতত্ত্ব। প্রাগুক্ত।

৪. রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়। বৃহৎতন্ত্রসার। প্রাগুক্ত।

৫. ভারতকোষ ঃ তন্ত্র-দ্রষ্টব্য। তৃতীয়খণ্ড। ১৩৭৩।

৬. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। ধর্ম ও কুসংস্কার। ১৯৭৩।

৭. পরাবাক—শব্দ ব্রহ্মরূপ 'রবি' অথবা সূর্য ভেদ করতে পারলে বিবেক জ্ঞানের উদয় হয়। আর শব্দ ব্রহ্ম হলেই মুক্তি। শব্দ ব্রহ্মবাদীদের সঙ্গে সূক্ষবাক পশ্যন্তি হতে পৃথক হলেও শাক্তমতে তা আত্মা বা পরম শিবের পরাশক্তি। যখন আত্মস্বরূপে নিজের স্বরূপ দর্শন করার ইচ্ছে জাগ্রত হয় তখন শান্তা বা অম্বিকা শক্তি উভয়েরই মধ্যে সামরস্য ঘটে। একেই বলে পরাবাক্। পরাবাক্ পরামাতৃকা নামে অভিহিত।

এর মধ্যে ছান্দস তত্ত্ব সমন্বিত বিশ্ববীজাস্থিত যা বৃক্ষের ন্যায় অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান থাকে এবং সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত হয়। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত। গোপীনাথ কবিরাজ। ১৯৭৬।

৮. মন্ত্রের অপর নাম 'আগম' বা 'আগম কথা।' ইংরাজীতে Divination

Divination-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–Divination are those divices by the help of which the supersitions man tries to find out the phenomena of life and nature which do not yield themselves to his intellect.--লোকসাহিত্য. ১ম খণ্ড। আশরাফ সিদ্দিকী। ২৩৮পৃঃ। ১৯৭৭।

Divination সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে–Divination the act or art of Knowing or for etelling the unknown, whether further or-destant in space ; a practice of greatest antiquitay ,-performed every where in the world, by peoples in every cultyral status and uliliring almost every conceivable instrument or phenomenon as an indicator.–Maria Leach [ed.] S. D. F. M. L. 316 page.

৯. বিন্দুর শব্দাত্মিকা বৃত্তি চার প্রকার। বৈখরী, মধ্যমা পশ্যান্তী, পরা।

বৈখরী-শোত্র গাহ্য অর্থ বাচক মূল শব্দ। এই শব্দ প্রাণের বৃত্তিকে আশ্রয় করে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

মধ্যমা--পাণবৃত্তির অতীত ও শোত্রের অ বিষয়, চিন্তারূপে ভিতর ভিতর চলতে থাকে।

পশ্যান্তী–ইহা অক্ষর বিন্দু। স্বয়ং প্রকাশ, অবিভক্ত, বর্ণময় ও ক্রমহীন।

পরা–অভিধেয় বুদ্ধির বীজ বা বিবেকজ্ঞান।

১০. আত্মা, দেহ বিশিষ্ট জীবাত্মা। তন্ত্র সাধনায় আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য সমপ্রাত বৈশিষ্ট্যের দরুণ সকল 'দসাব' উদ্ভব হয। দসা বুঝান হয়েছে জাগ্রত স্বপ্নাবস্থা ও সুষপ্তি।

জাগ্রত–আত্মা ও মন, মন ও ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংসর্গ যে অবস্থাতে বিদ্যমান।

স্বপ্নাবস্থা–আত্মা ও মন, মন ও ইন্দ্রিয়ের সংসর্গের প্রচলিত নাম।

সুষুপ্তি--একমাত্র আত্মা ও মনের সম্বন্ধ বিদ্যমান অবস্থা।

আত্মা সম্পর্কে অন্য ভাবে বলা হয়েছে–চৈতন্য বা চেতনা বলে আমরা যা অনুভব করি কিংবা যার দ্বারা সমর্থ হওয়া যায় তারই নাম শক্তি। শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। এরই নামান্তর আত্ম--অতি বা প্রোতীতি আত্মা।

–তন্ত্রতত্ত্ব, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য। ২৩৯-২৪০ পৃষ্ঠা। ১৩৮৯

১১. তন্ত্রশাস্ত্রে পরমেশ্বরের পূর্ণশক্তির রূপতিনটি ঃ

ক. পরা বা অনুত্তরা = চিৎশক্তি = অ।

খ. পরাপরা = ইচ্ছাশক্তি = ই।

গ. অপরা = উন্মেষরূপ জ্ঞান শক্তি = উ।

একত্রে এই তিনশক্তি অ-ই-উ নামক ত্রিকোণ। আবার ক্ষোভবশত শক্তিবর্গের সংখ্যাও হয় ছয়। অ ক্ষুব্ধ হলে হয় আ, ই ক্ষুব্ধ হলে হয় ঈ, উ ক্ষুব্ধ হলে হয় ঊ। বলা হয়ে থাকে অ = আনন্দের, ঈ = ঈশ্বরের, উ = উনাত্মর বাচক ; এবং এ-ঐ-ও-ঔ = অস্ফুট, স্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি। এই ক্রিয়াশক্তিই অন্তরালবর্তী সকল শক্তিকে গুটিয়ে সমষ্টিভাবে বিন্দু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিন্দুই চিৎ শক্তির সঙ্গে

যুক্ত হলে শিববিন্দু লাভ করে। এই 'শিববিন্দু' বা বিসর্গ দুটি। একটি পরবিসর্গ = অ এবং অপরটি অপর বিসর্গ = হ। আত্ম নিজ হতে সৃষ্টি করে এবং নিজেরই মধ্যে পরে তা প্রকাশ করে। যে কোন প্রমাতা বা প্রমেয় সৃষ্ট হোক না কেন পূর্ণ চৈতন্য শক্তি এমশ 'অ হতে 'ঙ পর্যন্ত স্ফুরিত হতে থাকে।

গোপীনাথ কবিরাজ। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, শক্তির জাগরণ অধ্যায় ১৩৭৬ সন।

১২ তন্ত্র মতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ৭টি ভুবন আছে। ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে দশ দিকে একশত রুদ্র ভুবন এবং সকল ভুবনের উপরে সর্বাধিষ্ঠাতা বীরভদ্রের ভুবন। অর্থাৎ নিবৃত্তি কলার অন্তর্গত পৃথিবী তত্ত্বে ১০৮টি ভুবন। ব্রহ্মাণ্ডের ৭টি ভুবন যথাক্রমে অধোভাগে কালাগ্নি, কুষ্মাণ্ড ও হাটক , মধ্যভাগে-ভূলোক , উদ্ধভাগে সপ্তলোক পর্যন্ত এক ভুবন, তার পশ্চাতে বিষ্ণুলোক ১ এবং রুদ্রলোক।

* জলতত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব ইন্দ্রিযতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, গুণতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্বে গুহ্যষ্টক অতিগুহ্যষ্টক, গুহ্যতরাষ্টক, পাত্রাষ্টক, স্থানষ্টক, দেবযোনিতলষ্টক, যোগেশ্বরষ্টক, প্রভৃতি ৫৬টি ভুবন আছে।

* পুরুষ ও রাগতত্ত্বে ৮ বিদ্যেশ্বর ভুবন নিযতি ও বিদ্যাতত্ত্ব বাসা হতে মনকামনা পর্যন্ত ৯টি শক্তির ভুবন কাল ও কালতত্ত্বে মহাদেবাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত ৩টি ভুবন, মায়াতত্ত্বে ৭টি ভুবন আছে.

* শুদ্ধবিদ্যাতে ১ভুবন ; ঈশ্বরতত্ত্বে ১৫টি ভুবন , ঈশ্বরের ১ভুবন, অনন্তবিদ্যাস্বরূপের ৮ভুবন , ধর্মাদির ৪ভুবন , বামাদি-তিনশক্তির ১ভুবন, জ্ঞানক্রিয়ার ১ ভুবন সদাশিবতত্ত্বে ১ ভুবনের উল্লেখ আছে।

* শিবতত্ত্বে ৩ বিন্দুভুবন, ৬ নাদভুবন এবং ৭ কলাভুবন, মিলে একত্রে ১৬ ভুবন আছে. গোপীনাথ কবিরাজ ঃ তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিকদর্শন। ১৯৬৩। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, ১৩৭৬, গোপীনাথ কবিরাজ।

১৩. 'কাল' ঈশ্বরের বিশ্বভাগকে ক্রিয়া শক্তিময় রূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত কালকে প্রাণে লীন করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পরমভাবে স্থিতি অসম্ভব। কালের প্রভাবেই উচ্চারণ হয়, প্রাণের উচ্চার হতে হয় মাতৃকা বা বর্ণের, বর্ণ হতে বাচক শব্দ ও বাচক বাচ্য। তাই জগতের সকল পদার্থ কালের কলনার অধীন। তান্ত্রিক পরিভাষাতে কাল গণনা করা হয় 'তুটি' হতে—আমরা যাকে বলি 'এক'। 'তুটি' 'লব', 'নিমেষ', 'কাষ্ঠা', 'কলা', 'মুহূর্ত' 'অহোরাত্র', 'পক্ষ', 'মাস', 'ঋতু', 'অযন', 'বৎসর', 'যুগ', 'মন্বন্তর', 'কল্প', 'মহাকল্প', এই যোড়শ অতঃপর পরম কাল এবং সর্বশেষে 'অষ্টাদশ' বা কালবিচুম্বরৎ।--গোপীনাথ কবিরাজ। ঐ।

১৪. পরম শিবই পরম শূন্যপদ। তান্ত্রিক মতে অধঃশূন্য, মধ্যশূন্য, ঊর্ধ্বশূন্য, ব্যাপিনীশূন্য, সমনাশূন্য, উমানাশূন্য--এই ছয়শূন্য অতিক্রমণের পরই পরমপদ যা চিদস্বরূপ সত্তা। এরই প্রকাশে সকল ভাব ও অভাব প্রকাশিত হয়।

অশূন্যং শূন্যাসিত্যু ওং চাভাব উচ্যতে।
অভাবঃ স সমুষ্টিঃ যত্র ভাবাঃ পরাং গতাঃ।।

—গোপীনাথ কবিরাজ। ঐ।

১৫. গোপীনাথ কবিরাজ। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত : দীক্ষারহস্য অধ্যায়। ২০৮ পৃষ্ঠা ১৩৭৬। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগদর্শন। ১৯৬৩।

১৬. গোপীনাথ কবিরাজ। প্রাগুক্ত।

১৭. ঐ।

১৮. বঙ্গীয় শব্দকোষ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে "তন্ত্র হচ্ছে এক জাতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ যা থেকে নানা দেবদেবীর পূজার জন্য, অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভের জন্য মানুষ একটা বিশিষ্ট পথের সন্ধান পেতে

পারে"--সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। "তন্ত্রের কথা"। ১৯৯৭৮।

১৯. কুম্ভক ভট্টের মতে--শ্রুতি দ্বিবিধ। ক. বৈদিকী খ. তান্ত্রিকী, সেকারণে চার বেদের পরেই তন্ত্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে পঞ্চম বেদ রূপে।--ভারতকোষ। তৃতীয়খণ্ড। তন্ত্র দ্রষ্টব্য। ১৩৭৩।

২০. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। তন্ত্রকথা। ১৩৬২।

২১. বৃহৎতন্ত্রসার : রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়। (সংকলিত) ৫০০-৫০৫ পৃষ্ঠা। ১৩৮৯

২২. ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ . রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় (সংকলিত) ইন্দ্রজাল অধ্যায়। ৫ পৃষ্ঠা, ৩২নং মন্ত্র। ১২৮৬।

২৩. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

২৪. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)। প্রাগুক্ত।

২৫. নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

২৬. দিব্যাচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

৩ : ১ সুন্দরবন অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি ও মন্ত্র

আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করাব সময় দেখেছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সময় থেকে সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে আবাদ-পত্তনের কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি অথবা দীর্ঘ মেয়াদি শর্তে লিজ নিয়ে বেসরকারি ভাবে আবাদ-পত্তন করিয়েছেন মূলত সামন্ত বা জমিদার শ্রেণীর মানুষ। সুন্দরবনে সন্ত্রাসকারী ও জলদস্যুদের দমন করার জন্য কিংবা সরকারি-বন্দীদেব কয়েদ করে রাখবার জন্য—যে উদ্দেশ্যেই জঙ্গল উঠিয়ে বসতির আয়োজন করা হোক না কেন আসলে জমিদাররা যে খানিকটা ব্যবসা করা বা মুনাফা লোভের মানসিকতায় সুন্দরবনে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন, সে কথা গোপন থাকে না। এঁরা বিহার-রাঁচী-ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি এলাকার আদিবাসী মানুষদের লোভ দেখিয়ে জঙ্গল কাটিয়ে নিয়েছেন, আর পত্তনি জমিতে করিয়ে নিয়েছেন চাষাবাদ। এরই পাশাপাশি মেদিনীপুর-উড়িষ্যা সাবেক পূর্বপাকিস্তান ও ২৪পবগণার অন্যান্য এলাকা থেকে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ এসেছেন সস্তায় জমি কিনে বসবাস করবার জন্য, জঙ্গল থেকে মোম-মধু-কাঠ-কাঁকড়া-মাছ সংগ্রহ করার জন্য, আবাদ পত্তনিতে শ্রম দিয়ে বাসযোগ্য কিছু জমি পাবার আশায় ইত্যাদি। যে যেখান থেকেই আসুন না কেন আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁদেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা, কৃষিকাজ বা নিজেদের সম্প্রদায়ের পেশাভিত্তিক সামাজিক-সংস্কার-বিশ্বাস মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি। সুন্দরবনের নদী-জঙ্গল নির্ভর আদিম পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আনিত ভাব ধারার সম্মেলনে তার কিছুটা হারিয়ে গেছে, কিছুটা বা রয়ে গেছে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থেকে গড়ে ওঠা জন-জীবনের নতুন ভাবধারার সঙ্গে। কিন্তু জীবিকার যে দুটি প্রধান উৎস অর্থাৎ কৃষি এবং সুন্দরবনের নদীজঙ্গল তার চাবিকাঠি এইসব সাধারণ মানুষদের হাতে থাকেনি। জমিদার বা সামন্ত শ্রেণীর মানুষ কিংবা তাঁদেরই প্রতিভূ নায়েব-মহাজন-আড়ৎদার-খটিদার-জোতদাররা ঋণ-দাদন-ধর্মগোলা প্রভৃতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। ফলে, সামাজিক বৈষম্য বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের যে মূলগত পর্যায় অন্যান্য সমাজ-ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষি-জঙ্গল নির্ভর অর্থনৈতিক বিকাশের সূচনা থেকেই সেই একই চিত্র বর্তমান। কাজেই অনিবার্যভাবে শোষক ও শোষিত এই দুটি শ্রেণীর মূলগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই গোষ্ঠী ও সমাজে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মানুষ উৎসব বা পূজা-পার্বণাদির যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন তা মূলত উৎপাদনকে কেন্দ্র করে।

ক. উৎপাদনের কাজ শুরু করার প্রাক্কালে প্রার্থনা অনুষ্ঠান।

খ. উৎপাদনের শেষে উৎসব-অনুষ্ঠান।

আবার এই উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বর্ষচক্র। বর্ষচক্রের মধ্যেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে পূজা-পার্বণউৎসব অনুষ্ঠানের সময় সূচী। সুন্দরবন এলাকা মূলত পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র এবং ধর্মান্তরিত মুসলিমদের দ্বারা অধ্যুষিত এলাকা বলে চিহ্নিত করা হলেও এই এলাকার জনসংখ্যার বড় অংশে বর্তমান রয়েছেন তাঁতি, মাহিষ্য, গোপ, ঋষিবর, রাজবংশী, কামার, কুমোর, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, ভূমিজ ইত্যাদি। এঁরা যে সমস্ত এলাকা থেকে সুন্দরবনে এসেছেন সেই সমস্ত এলাকায় বর্ষচক্র যাই থাকুক না কেন, সুন্দরবনের ভৌগোলিক পরিস্থিতির টানাপোড়েনে, পাশাপাশি একই এলাকায় একই সঙ্গে দীর্ঘ দিন বাস করার ফলে বর্ষচক্রের 'মিলন' ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। কারণ চাষবাসের সঙ্গেই এখানকার মানুষের যোগাযোগটা বেশি ; দ্বিতীয় আর যে ক্ষেত্রে মানুষের যোগাযোগ বর্তমান তাহলো সুন্দরবনের জঙ্গল। তাই কৃষি ও জঙ্গল নির্ভর সংস্কৃতিতে সুন্দরবনের লোকায়ত সমাজে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত স্তর-গুলি পরিজ্ঞাত হতে দেখি :

ক. অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম স্তরে সমাজের বয়স্ক মানুষ—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মিলিত ভাবে রীতি-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থেকে কাজ করেন। আদিবাসী জীবনচর্যায় এই ধরনের রীতি লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবনের অরণ্যকে উচ্ছেদ করা হলেও যেখান থেকে এঁরা এসেছিলেন সেখানকার জীবন ধারার স্মৃতি বহন করে সুন্দরবনের আরণ্যক জীবনের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে চলেছেন। করম-ভাদু-টুসু ইত্যাদি উৎসব-অনুষ্ঠান তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

খ. দ্বিতীয় স্তরের রীতি-অনুষ্ঠানে মহিলারাই বেশি যুক্ত হয়ে থাকেন। কৃষি-নির্ভর সমাজে যখন অনিশ্চয়তা ক্রমশ নোঙর গেড়ে বসে তখনই এ জাতীয় চিত্র চোখে পড়ে। বিভিন্ন জাগরণ গান, ভাসান গান, ব্রত-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তারই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

গ. তৃতীয় স্তরে পুরুষের প্রাধান্যই লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। তত দিনে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজবার বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে মানুষের মনে। বনবিবি-দক্ষিণরায়—গাজী পীর সহ হিন্দু-মুসলমানদের অন্যান্য প্রধান অপ্রধান দেব-দেবী বা পীর-পীরানীর পূজা-উৎসবের মধ্য দিয়ে তারই চরিত্র প্রতিফলিত।

সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত মানুষদের অধিকাংশই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে 'শীতলার জাগরণ' করেন। এই গানে শীতলা ছাড়াও লক্ষ্মী-দুর্গা-কৃষ্ণ-কালী-বনবিবি-সাজঙ্গলীর নামেও গান গাওয়া হয়। আবার ভাদ্র-আশ্বিনে যে 'মনসার ভাসান' অনুষ্ঠিত হয়, সেই গানেও একই সঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীর গান গাওয়া হয়ে থাকে। তবে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে বনবিবির পূজার সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যারা সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু-মাছ-কাঠ ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে যান, তাঁরাই জঙ্গলে যাবার আগে অথবা জঙ্গলে গিয়ে কিংবা জঙ্গল থেকে ফিরে এসে বনবিবির পূজা-'হাজত' করেন। কিন্তু জঙ্গলে যাবার নির্দিষ্ট সময়টি চট করে ধরা মুশকিল। কেননা, জেলে কিংবা কাঠুরেরা প্রায় সারা বছরই জঙ্গলে যান। আর মধু সংগ্রহকারীরা যান নির্দিষ্ট মরসুমে অর্থাৎ ফাল্গুনের শেষ থেকে। বর্তমানে

অবশ্য মধুসংগ্রহকারী বা মউলেদের সংখ্যা অন্যান্যদের চাইতে তুলনামূলক ভাবে কমে যাচ্ছে। তবে বনবিবির পূজার বাৎসরিক পদ্ধতি যেখানে চালু আছে সেই সমস্ত জায়গার পূজার কালটি বিশেষ ভাবে বিবেচিত। ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, বনবিবির বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় কোথাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে, কোথাও অগ্রহায়ণ মাসে আবার কোথাও পৌষ-সংক্রান্তির দিন, কোথাও বা মাঘ মাসে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মূলত মউলেরাই পূজা করেন। এই সময়টিকে বাদ দিলে অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ এই তিনটি মাসের সঙ্গে এলাকার উৎসবের সময়ের একটা যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়। এখানকার নীচু জমিতে ধান পাকতে একটু দেরি করলেও মোটামুটি এই সময়ই সমস্ত আমন ধান ঘরে আসে। অগ্রহায়ণ মাসে আউস ওঠার নির্দেশ কালেও সুন্দরবন অঞ্চলে আউস ধানের চাষ একেবারে নেই বললে চলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফসলের শুরু এবং শেষ পর্বেই মানুষ পূজা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করছেন ও তাতে অংশগ্রহণ করছেন এবং সেই একই সঙ্গে ব্যক্ত করছেন নিজেদের আশা-আকাঙক্ষা দোষ-ত্রুটির কথা।

মূলত সুন্দরবন এক-ফসলি এলাকা। আবাদ-পত্তনিতে আমন ধানের নীচু জমিই বেশি। আউস-বোরো একেবারেই যে উৎপন্ন হয় না তা নয়। তবে এত নগণ্য পরিমাণ উৎপন্ন হয় যে সাধারণ কৃষকের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ হয় না। আমন ও আমন ব্যতিরেকে অন্যান্য যে চৈতি ফসল হয় তার অধিকাংশই মহাজন-মালিকের ঘরে গিয়ে ওঠে। কৃষক থাকেন অভুক্ত। শীত এবং বর্ষাকাল ছাড়া বাকি মরসুমে কাজ পাওয়াই যায় না। দিন-মজুরদেরও অর্ধাহারে-অনাহারে কাল কাটাতে হয়। সেকারণে জীবিকার প্রধান হাতিয়ার কৃষি হলেও সুন্দরবনের মানুষ কৃষিকে অবলম্বন করে দুবেলা-দুমুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার সংস্থান করে উঠতে পারেনি। তাকে নির্ভর করতে হয়েছে ভয়ঙ্কর আরেক উৎস 'জঙ্গলের' উপর। আবার 'জঙ্গল-করা' মানুষের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। তাঁদের অভিমত—জঙ্গল করে যে আয় হয়, তার অর্ধেকের অর্ধেক যদি জঙ্গলে না গিয়ে উপার্জন হতো তাহলে তাঁরা কিছুতেই জঙ্গলে যেতেন না। জঙ্গলে পায়ে-পায়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে হয়। সেখানে আর কিছু না হোক মাছ-মধু-কাঁকড়া ইত্যাদি পেট ভরে খাওয়া যায়। জাঙ্গলিক জীবনের অনিশ্চিত ভরসায় জীবনভারে ন্যুব্জ সদা কম্পমান হাড় জিরজিরে মানুষগুলো যখন পা বাড়ান, তখন যাবার সময় বউদের হাতের শাঁখা, সিঁথির সিঁদুর মুছিয়ে দিয়ে যান। বউরাও অনিবার্য ভবিতব্য হিসাবে তা মেনে নেন। ধারণ করেন বৈধব্যের বেশ। একাহারী হন। মাছ-তেল খান না। অপরের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করেন না। বিভিন্ন বিধি-নিষেধ মেনে চলেন। উদ্দেশ্য, স্বামীর নিরাপদ জীবন কামনা। স্বামী যদি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারেন তাহলে তাঁরই হাত দিয়ে পুনরায় সধবার স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করেন।

উভয়ে উভয়ের সঙ্গে পৃথক হলেও জন-জীবনের সঙ্গে জঙ্গলের জীবনের যদি কোনো মিল থেকেও থাকে তবে তাহলো সমষ্টিগত জীবন। জঙ্গলে একা চলা যায় না। একলা চলার কথা ভাবাই যায় না। সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে বসত গড়ে তোলার সময়ও এই সমষ্টিগত জীবনের দাবিই ছিল মুখ্য। যদিও জঙ্গল-হাসিল হয়েছে জমিদার-ব্যবসায়ী-মহাজন-মালিকের তত্ত্বাবধানে। বাহ্যত এঁদের ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের অধীশ্বর বলে

মনে হলেও যে সত্য কথাটা আদৌ গোপন থাকেনি তাহলো—এঁদেরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তির শোষণ ও শাসন। এই শোষণ ও শাসন কিভাবে হয়েছে তা আমরা প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করার সময় জেনেছি। সুতরাং একথা বলা চলে, সুন্দরবনের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে শোষণ-কেন্দ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব থেকেই গেছে।

কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজের সমষ্টিগত জীবনের উপলব্ধির ফসল যা জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তোলার সময় কাজে লেগেছিল তা পুনরায় ফিরে পেয়েছেন জঙ্গল-করা জীবনে। শেষপর্যন্ত তাঁরা জেনেশুনে শোষকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন অনন্যোপায় হয়ে ; কিন্তু তত দিনে সমষ্টিগত জীবনের প্রাণশক্তির পুঁজি এসে পৌঁচেছে একেবারে তলানিতে। জঙ্গলের শত্রুকে যে প্রক্রিয়ায় বা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত বা পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন আবাদের শত্রুকে সেই একই প্রক্রিয়ায় জব্দ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহায় ফুঁসে উঠলেও তা খনিকেব জন্য। বিদ্রোহী-মাথা সাপুড়ের সাপের মতো নামাতে একদম সময় লাগেনি। ঋণের পর ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদ বিশালাকার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আবাদের সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে, কাঠের আড়ৎদারের কাছ থেকে, মধু-মাছের খটি-মালিকের কাছ থেকে খোরাকি, নৌকা, টাকা ইত্যাদি সহ 'বনের সাজন'-এর উপকরণ নিয়েছেন বাধ্য হয়েই। এঁদের কেউ পারমিট বা লাইসেন্স নিয়ে জঙ্গলে গেছেন, কেউবা গেছেন চুরি করে। যারা 'পাশ' পেয়ে বনে যান, স্বভাবতই তাঁরা একটু স্বচ্ছল আর যারা 'চুরি' করে বনে যান তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। এঁরা মালিক-মহাজনের হয়ে গভর্ণমেণ্টের 'খাসমহলে' কিংবা অন্যান্য এলাকায় ঢুকে মধু-মাছ-কাঠ-কাঁকড়া-গোলপাতা-লতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। সঙ্গে থাকেন একজন করে গুণিন বা ফকির। দলের তিনিই প্রধান। তাঁর নির্দেশেই পরিচালিত হয় যাবতীয় কাজকর্ম। উপযুক্ত পরিমাণ মাছ-মধু-কাঠ ইত্যাদি পাবার আকাঙক্ষায় এবং নিজেদের সকল রকম নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করেন। প্রকৃতির সঙ্গে নিরস্ত্র মানুষের নিয়ত সেই আদিম দ্বন্দ্ব যেখানে, সেখানে মহাজনের শাসনের মতো গুণিনদের শাসন মানতেই হয়—কেননা, তাঁর প্রতিটি কথাই তখন হয়ে ওঠে 'বেদবাক্য' স্বরূপ। যদিও গুণিন কিংবা গুণিনের সহচরগণ অর্থাৎ জঙ্গলকারী প্রত্যেকেই একই শ্রেণী-সমাজ বা গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হলেও সমাজের আইনের সঙ্গে জঙ্গলের আইনের কোনোদিন 'গাঁট-ছড়া-বন্ধন' হয়নি—উভয়ে উভয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক। সে-কারণে যে-ব্যক্তির নির্দেশে গৃহস্থ জঙ্গলে আসছেন, তাঁকে জঙ্গলে এসেও সেই একই ব্যক্তি বা মহাজন মালিকের প্রতিভূ অর্থাৎ গুণিনের 'হুকুম' মানতেই হয়। দিনের পর দিন এখানে প্রকৃতি ও মানুষের শ্রমের মধ্যে সময় অতিবাহিত করতে হয় বলেই সুপ্রাচীন যুগের ছায়া অর্থাৎ জাদু-সংস্কারের বিশ্বাস বা মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি অপরিসীম আস্থা এসে পড়তে বাধ্য। বনবিবি-দক্ষিণ রায়-গাজীপীর—সুন্দরবনের এই তিন প্রধান লৌকিক দেবতা সহ লোকসমাজে প্রচলিত অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা উপাসনা করতেই হয়। মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করে, সমস্ত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে কিংবা মানত-বলি-উৎসর্গ করেও যারা জঙ্গলে যান তাঁরা যে সবাই নিরাপদে ফিরে আসেন এমন নয়, কেউবা বাঘের কবলে পড়ে,

সাপের কামড়ে, কিংবা রোগ-ব্যাধিতে মারা যান। যে যে ভাবেই মারা যান না কেন, জঙ্গল করতে গিয়ে জঙ্গলেই মারা গেছেন এটাই মুখ্য। বর্তমানে ৩৯ পয়সা দিয়ে জঙ্গল-করাদের প্রিমিয়ামে লাইসেন্স-এর ব্যবস্থা হয়েছে। এরই দৌলতে একটি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে ২০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়া যেন তিক্ত বিদ্রূপের বহ্নি বাড়িয়ে তোলে। আর লাইসেন্স-বিহীন মা-বউদের তো কাঁদবারও উপায় নেই। কারণ কান্নার আওয়াজ অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে কোন বাড়ির 'চোর' বাঘের পেটে গেছে। তখন সে আরেক 'ফেগ্‌ড়া'। এবং এইভাবেই প্রতি বছর মা সন্তান হারান, আর স্বামীর মৃত্যুতে বউরা বিধবা হয়ে 'বিধবা পল্লীর' সীমানা বাড়িয়ে তোলেন।

যারা জঙ্গল করতে যান, প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনে বুঝতে পারেন যে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। চাষের কাজে নামার আগে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে খাবার জন্য, চাষের হাল-বলদ-বীজধান ইত্যাদি পাবার জন্য মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ ফসলেও পরিশোধ হয়নি, অধিকন্তু আশ্বিন-কার্তিকের 'দু-মুখ' সময়েও বসে থাকতে হয়েছে, অপর দিকে জঙ্গলে যাতায়াত করার কারণে 'জঙ্গল রক্ষক কর্মী' বা ফরেস্টারদেরকেও মন জুগিয়ে রাখতে হয়েছে নানারকম ভাবে। এও জানেন—তাঁদের দলপতি হয়ে যে গুণিন জঙ্গলে আসেন, তিনিও কোনো নিরাপত্তা দিতে পারেন না। গুণিনের মন্ত্রে যে কোনো কাজ হচ্ছে না তা নিজের জীবনের বিনিময়ে অনুভব করতে পারছেন। তাঁরা দেখেছেন—মন্ত্রজ্ঞ গুণিনেরাই বার বার বাঘের পেটে চলে যাচ্ছে। মন্ত্র তাঁদেরকে বাঁচাতে পারছে না—অথচ জঙ্গলে তাঁর 'নির্দেশ'ই শেষ কথা বলে বিবেচ্য। এই সমস্ত মানুষ কার উপর অভিযোগ করবে—বাঘ-সাপ-গুণিন না মৃত্যুকে? বরং নিজের ভাগ্যকেই দোষেন বেশি করে।

সামাজিক জীবনেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। যার পায়ের তলায় মাটি নেই, স্বভাবতই তার মাথায়ও ছাদের ছায়া থাকতে পারেনা। এর উপর আছে—অর্ধাহার-অনাহার, রোগ-শোক-তাপ ইত্যাদি। জঙ্গলে যেমন বন্দুক-বল্লম নিয়ে যাওয়া যায় না—মন্ত্রই একমাত্র ভরাসা, তেমনি সুন্দরবন দেশের অন্যান্য এলাকার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বা রোগ-ব্যাধির ভালো করে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র যাবার যোগাযোগ হয়ে ওঠে না। ফলে শিক্ষা ও জন স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়েছেন গুণিনরাই। এখানেও সেই একই ব্যবস্থা। অর্থাৎ ঝাড়-ফুঁক মন্ত্র-তন্ত্র। জঙ্গলের মন্ত্র জাঙ্গলিক দুঃসাহসিক জীবনে নিরাপত্তা দিতে পারেনি, সমাজের জন-স্বাস্থ্যকেও সুষমা মণ্ডিত করতে পারেনি ওঝা-গুণিনের ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র। প্রায়শ সাপের ওঝাকে সর্পাঘাতে বা ভূতের ওঝাকে ভূতের কবলে পড়ে মারা যেতে দেখা গেছে। মন্ত্র তাঁদেরকেও বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু একেই মানুষ যুগযুগধরে 'ঈশ্বরের দান' বা একমাত্র 'অবলম্বন' বলে বিশ্বাস করে এসেছেন। আসলে ইতিহাসের পরিজ্ঞাত সময় থেকে মানুষ যে সমস্ত সামাজিক বিধি-বিধানকে 'ধর্ম' বলে মেনে এসেছে, সেই বিধি-বিধান থেকে এক চুলও সরে আসতে পারেনি। সভ্যতার বিবর্তন যেভাবে যতই ঘটুক না কেন সমাজের বিবর্তনের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক গতি বর্তমান, তারই লব্ধ ফল আমাদের প্রাত্যহিক জীবন-চর্চায় কমবেশি প্রতিফলিত। এরই সুযোগ নিয়ে যারা শোষণ ভিত্তিক কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রাখতে 'ধর্ম'-কে পছন্দ মতো কাজে লাগিয়েছে,

কালে তাঁদেরই প্রতিভূ হয়ে পড়েছেন গুণিনেরা। গুণিন যে শ্রেণী-সমাজের প্রয়োজনে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি প্রয়োগ করেন তিনি সেই একই শ্রেণী-স্তরের মানুষ হয়েও মালিক-মহাজন-আড়ৎদার-খটিদারদের সংরক্ষক বা মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন এবং গোটা সমাজকে মন্ত্র বিশ্বাসের সীমানার মধ্যে এনে গণ্ডীবদ্ধ রাখতে প্রয়াসি হন। সর্বোপরি মন্ত্রের পিছনে যে ধর্মনৈতিক বাতাবরণ যুগ যুগ ধরে অন্তর্লীনভাবে সংযুক্ত তার প্রভাবে আচ্ছন্ন মানুষ সর্বগ্রাসী হতাশার মধ্যেও দেখতে পান এক ফালি আশার আলো, এক টুকরো নিরাপদ আশ্রয়। সুতরাং সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতিতে মন্ত্র যে জায়গা করে নিয়েছে সে জায়গা থেকে তাকে হঠানো খুব মুশকিল।

৩ : ২. লৌকিক বিশ্বাসে মন্ত্র

প্রবাদে আছে—'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'। কোনো বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে মন অকপট ভাবে সায় মানলে বা বিশ্বাস উৎপাদন হলে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হাঁ তো হাঁ, কিংবা না তো না। এই সহজ সত্য ও স্বাভাবিকতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বিশ্বাস সম্পর্কে একটু চিড় ধরলে, সংশয় উপস্থিত হলে তা প্রশ্ন বা তর্ক সাপেক্ষ। এরকম ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ভাবে ফলাফল লাভের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ইংরেজি 'Faith' কিংবা 'Belief' এই উভয় শব্দকেই বাংলা 'বিশ্বাস' করা হয়েছে, যার বিশ্লেষিত অর্থ হলো—কোনো বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা মানসিকতার প্রতিক্রিয়া অথবা প্রত্যয়। লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের আলোচনায় আমরা Faith-এর পরিবর্তে Belief শব্দটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

কার্ভেথ রীড বলেছেন—বিশ্বাস হলো মনের একটি বিশেষ ভঙ্গি, যা কোনো প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বিচার করার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতা অথবা বাস্তব প্রক্রিয়া, যা উক্ত ঘটনা বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে। এ একটি অনুক্রম এবং সম্মানসূচক [ব্যক্তির পক্ষে] দৃষ্টিভঙ্গি ; কোনো কাজের ঘটনার জটিলতা বা পরিবর্তিত শক্তি সম্বন্ধে হ্যাঁ অথবা না—এর কোনো একটি অভ্যাসের সঙ্গে আমাদের [ব্যক্তির] সঙ্গতি বিধান করে।[১]

মানব সমাজের আদিম অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এক অসম-নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মহড়া চলেছে। এই সংগ্রাম সূচিত হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার সুতীব্র আকুতিতে, কখনও বা পরিচালিত হয়েছে ব্যষ্টির অধিকার ও আক্রমণের অভীপ্সায়। সে-লড়াইয়ে কখনো হয়েছে সফল, কখনও বা সন্ত্রস্ত থাকতে হয়েছে নানা দুশ্চিন্তায়। সে দিনকার অজ্ঞাত অপরিচিত পৃথিবী ও তার নৈসর্গিক পরিবেশ আদিম গুহা-মানুষের কাছে ছিল দারুণ রহস্য-ঘন অনিশ্চয়তায় ভরা। একদিকে মুহুর্মুহুঃ ভূ-কম্পন, অগ্ন্যুৎপাত, জল-প্লাবন, তুষারপাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি, দিন-রাত্রি, চন্দ্র-সূর্য, জন্ম-জরা-মৃত্যু, নিদ্রা-জাগরণ-স্বপন, ঋতু-ভেদ ইত্যাদির তৎপরতা, অপরদিকে বিরাটকায় ম্যামথ, সিংহ-বাঘ, সাপ-কুমির প্রভৃতি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উদ্দামতা যেমন ভীতির সঞ্চার করে তেমনিই খাদ্যবস্তুর অপর্যাপ্ততা, বাসস্থানের অনির্দিষ্টতা, ব্যবহারিক দ্রব্য সম্ভারের স্বল্পতা ইত্যাদি জীবনকে অনিশ্চিত সম্ভাবনায় শঙ্কিত রেখেছিল। এরই মধ্যে অসহায় অজ্ঞ ভীত-বিহ্বল চিত্তে চলতে-ফিরতে স্বীয় শ্রম ও প্রকৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্বে অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হতে হতে, শ্রবণ-দর্শন-ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ নানা রকম সংকেত ও চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতা-লব্ধ এই সব সংকেত বা চিহ্নকে বিশেষ পরিণতির কারণ হিসেবে গ্রহণ করতে শেখে, এবং এর সঙ্গে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতায় কার্যকারণ সম্বন্ধ কল্পনা করে নেয়। প্রথমে মানুষ দেখেছে প্রতি-মানুষ বা বিভিন্ন জীব-জন্তুর পদচিহ্ন, গাছের ডালপালা, খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ, পরিত্যক্ত বসতের চিহ্ন, আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি, নক্ষত্র স্খলন, পড়ে

থাকা পাখির পালক, পশুর বিষ্ঠা, গোষ্ঠীর কারুর মৃত্যু ইত্যাদি ; অনুভব করতে পেরেছে সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ, প্রবহমান বাতাসের দিক পরিবর্তন, জোয়ার ভাঁটা, হঠাৎ পাখির স্তব্ধ হওয়া, ঋতু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি ; আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করেছে শকুনের ওড়া, পাখির ও কীট-পতঙ্গের চলাচল ; যাতায়াতের পথে পায়ের কাছে পড়ে থাকা মৃত খরগোশ, শত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি নানাবিধ অসামঞ্জস্য অসমতাকে ঘিরে 'শুভাশুভ' যুক্ত করে ফেলে। এইভাবেই জন্ম হয় বিশ্বাসের। এবং তা ক্রমশ জন-জীবনের মধ্যে সংহতি লাভ করে লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা তৈরি করতে সাহায্য করে। সুতরাং বলা যেতে পারে—একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে একই আচার-আচরণ ও জীবনচর্চায় অভ্যস্ত সংহত এক-জন সমষ্টি যে বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে শুভাশুভ বোধ জড়িত করে কর্তব্য বা অকর্তব্য বিবেচনা করে তাই Folk-belief বা লোক-বিশ্বাস।

সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা এবং প্রবহমান স্মৃতি ও বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তথা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই কোনো বস্তু বা ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণ করতে সচেষ্ট হয়েছে। জীবনের সাফল্য অর্জনে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে ও বঞ্চিত ফললাভের আকাঙ্ক্ষায় বাহ্যত কিছু বিশ্বাসকে বা সংস্কারকে মানতে হয়েছে বা হচ্ছেও—যা পৈত্রিক সম্পত্তির মতো সমাজে অনুসৃত হয় ও সুদৃঢ় নোঙর গেড়ে বসে। এই সব বিশ্বাস বা সংস্কার সমাজ দেহে সঠিক সম্প্রসারণের জন্য বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে। যাঁদেরকে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে অর্থাৎ মুনি-ঋষি, গুরু-গুণিন, রোজা, পুরোহিত-ওঝা, পীর-ফকির, যাদুকর, গোষ্ঠী অধিপতি বা সমাজপতি ইত্যাদি রূপে অভিহিত করি। এঁদেরই হাত ধরে লোকায়ত-মত লোকে আয়ত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে। এ দিক থেকে বলা যায়—লোকবিশ্বাস খুব সাম্প্রতিক কালের কিংবা সুদীর্ঘ কালের অথবা দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। এর মূল হলো—বিশেষ কোনো কার্য বা ক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট কারণের অনুসন্ধান। আর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্থান-কাল-পাত্র কিংবা পরিবেশ-পরিস্থিতি ভেদে তেমন কোনো পরিবর্তন যোগ্য নয়।

আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি, আদিযুগে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ছিল প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে প্রকৃতি তার সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করেছে। প্রকৃতিকে নির্ভর করে সে প্রথমে প্রকৃতির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তারপর মার খেতে খেতে সেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটাতে নিজেই হয়েছে তৎপর। আর প্রকৃতির নিরঙ্কুশ খেয়াল-খুশির দাপাদাপি নয়। তার হাত থেকে বাঁচতে হলে তাকে শান্ত অথবা বশ করতে হবে। এই চিন্তা-চেতনাই মানুষকে দিয়েছে প্রথম বিপ্লব-মন্ত্র, সমস্যা বা শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুর্জয় সাহস। সে দিনের অজ্ঞতা-অসহায়তা, দীনতা-সামর্থ্যহীনতা আদিমতম মানুষকে এবং তাদের জীবনের অত্যাশ্চর্য অঘটনগুলির সম্যক ব্যাখ্যানে অথবা ভীতিতে অশরীরী অতিপ্রাকৃত অলৌকিক অনৈসর্গিক শক্তির কল্পনায় নিবিষ্ট, অতি বিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর করে তোলে। আজ, অবশ্য, মানুষ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন আনতে নাপারলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে তার ক্ষমতাকে স্থানান্তরিত অথবা নির্মূল করেছে।

কিন্তু এই বাহ্য—প্রকৃতি নির্ভরতা এখনও কমেনি। প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশকে এক একটি শক্তির প্রতীক কল্পনা করে মানুষ প্রকৃতিকে শান্ত অথবা বশ করতে গিয়ে তার বিভিন্ন শক্তির আদর ও তোষামোদ করেছে, কখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো শক্তিকে তারই বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে অর্থাৎ উপচার হিসেবে প্রকৃতিকে প্রকৃতিরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আত্মরক্ষায় সচেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, কৃষি ও শিল্পের উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। তখন থেকেই তার অসংলগ্ন সমাজ তথা সাংস্কৃতিক জীবনের পথ যায় পাল্টে। জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে অভিযোজিত হতে থাকে নানাবিধ সংস্কার, রীতি-নীতি, 'কর্ম-অভিব্যক্তি ও অনুশাসন। সৃষ্টি হয় অলৌকিক ক্ষমতার শক্তিতে বিশ্বাস, ধর্মানুভূতি ইত্যাদি। কিন্তু কৃষি-নির্ভরতা লোকায়ত মানুষের জীবন-ধারা আমূল বদলে দিলেও তার ভিতরে ভিতরে ফেলে আসা পূর্ব-জীবনের দীর্ঘ অনিশ্চয়তা, বিফলতা, অসহায়তাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ভাবী-ভবিষ্যতের পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন করে সেই বিশ্বাস ও সংস্কারগুলিরই পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে মানুষ। সেইসব বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে জীবনের পূর্ণ সার্থকতা, অখণ্ড শান্তি বা নিরাপত্তার পথ বাতলে নিতে সে সচেষ্ট হয়েছে।

লোকায়ত বিশ্বাসকে আমরা নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করতে পারি [যদিও এই বিভাজন স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়] : ক. না-ধর্মী বিশ্বাস। খ. হাঁ-ধর্মী বিশ্বাস। গ. সংক্রামক বা সংস্পর্শমূলক বিশ্বাস। ঘ. শুভকারী বিশ্বাস।

ক. না-ধর্মী বিশ্বাস : ইংরাজিতে যাকে "Taboo" বলা হয়, অনেকটা তারই সমধর্মী-বাংলায় বিধি-নিষেধ। বসন্ত-কলেরা-টাইফয়েডের সময় বাড়িতে ভিখারি এলে ভিক্ষে দিতে নেই, অতিথি এলে বসতে বা থাকতে বলতে নেই ; মেয়েদের মাছের পটকা খেতে নেই, ফাটা শাঁখা-চুড়ি ইত্যাদি পরতে নেই ; পাট কাঠি দিয়ে কাউকে মারতে নেই, প্রথম তেলের পিঠে বা বাড়া-ভাতে মেয়েদের প্রথম খেতে নেই, গর্ভাবস্থায় মা-বোনেদের লাউ-কুমড়ো কাটতে নেই কিংবা সন্ধ্যাবেলায় নববধূর এলোচুলে বাইরে যেতে মানা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে জীবনের যে-সব ঘটনা-লক্ষণ-আচরণ আদিম মানুষের কাছে ছিল যুক্তির অগোচর সেগুলিকে ঘিরে তারই নানাবিধ সংস্কার ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে ; এবং প্রসঙ্গক্রমে কোনো বিশেষ ঘটনা বা বস্তুকে বিশেষ কোনো সময়ে দেখা, তার স্পর্শে আসা অভিজ্ঞতার দ্বারা শুভাশুভ বোধকেও অন্তর্লীনভাবে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে।

খ. হাঁ-ধর্মী বা অভ্যর্থক বিশ্বাস : এই সব বিশ্বাস বা আচরণীয় বিষয় অবশ্য পালনীয় তা অভ্যর্থক পর্যায়ভুক্ত। ব্রতের দিন উপবাস করা, আত্মীয় বিয়োগে অশৌচ পালন ইত্যাদি।

গ. সংক্রামক বা সংস্পর্শমূলক বিশ্বাস : এমন কতকগুলি বিশ্বাস লোক-সমাজে প্রচলিত যা সংক্রামক বা সংস্পর্শ মূলক—ইংরাজিতে যাকে বলা হয়ে থাকে "Contagious"। এই ধরনের বিশ্বাসের মূলে হলো অসবন্ধ সম্বন্ধের ধারণা। দেবতার প্রসাদ খাওয়া, অঞ্জলি দেওয়া-ফুল কাছে রাখা ; কাউকে 'গুণ' বা আকর্ষণ অথবা বিনষ্ট করতে হলে সেই ব্যক্তির ব্যবহৃত বিশেষ পোষাক বা দ্রব্য-সামগ্রীর টুকরো কিংবা দেহের

কিছু অংশ যেমন নখ-চুল-চামড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিশেষ ক্রিয়া করা ; বিশেষ ধরনের পশু বা জীবজন্তুর শিং-নখ-ছাল ইত্যাদি সংস্পর্শে থাকায় উক্ত বিষয়ের বস্তুগুলির অন্তর্লীন অলৌকিক ক্ষমতার বলে আকর্ষণ করা ইত্যাদি মানসিকতা বা বিশ্বাস।

ঘ. মঙ্গল বা শুভকারী বিশ্বাস : এমন কতকগুলি লোকবিশ্বাস প্রচলিত যা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, এবং এরই উপরে নির্ভর করে অসহায় মানব-সমাজ পৃথিবীতে টিকে আছে। এই ধরনের বিশ্বাসকে অনুকরণ মূলক বা শুভকারী বিশ্বাস বলা যেতে পারে। ব্রতপালন, বৃষ্টি নামানোর কিংবা ভালো ফসল লাভের জন্য উদ্‌যাপিত কোনো অনুষ্ঠান, আহার্য সন্ধান, বিত্ত অর্জন, সন্তান পালন, যুদ্ধ বা মামলা জয়ের আশায় ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি এর মূলে আছে অনুপ্রক্রিয়াদি দ্বারা অভিষ্ট সিদ্ধি অর্জন। বাস্তবে যা ঘটে বা ঘটা প্রত্যাশিত এমন কিছু ঘটনার অনুকরণ বা অভিনয়। অধিকাংশ পূজা-অর্চনা বা বিশেষ ধরনের আচরণ বিধি এই বিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে।

প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার যতই দুর্দমনীয় হতে থাকে ততই এই ধরনের বিশ্বাস, বিধি নিষেধ, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এতে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট সমাধান যে সে করতে পেরেছে, তা নয়। প্রকৃতির নানান কার্যকলাপ তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়েছে যার সব কিছুরই সদুত্তর সব সময় মেলেনি। উত্তর-না পাওয়া এই অব্যক্ত অনির্দেশ্য ব্যাখ্যাহীন রহস্যকে অশরীরী অলৌকিক শক্তির দ্বারা অর্জন করতে চেয়ে আকাঙ্ক্ষার ব্যবহারিক প্রতীক হিসেবে ধর্ম, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা যাগযজ্ঞ, জাদুপ্রক্রিয়া, ধর্মের দেবতা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। সংস্কার, ধর্ম, জাদু, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই বিশ্বাস থেকে জাত বা বিশ্বাস সম্পৃক্ত। এরই অন্তর্গূঢ় সূত্রে বিশেষ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে মন্ত্রও এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। পৃথিবীর সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে, সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি পর্বে-পর্বে তার সংস্কারে-প্রথায়-ধর্মচেতনায়, তার আচারে-পালা-পার্বণে, উৎসবে-ব্যসনে, আভিচারিক ক্রিয়াদিতে সর্বত্রই এই বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ ভাবে সক্রিয়।

এখন প্রশ্ন—সংস্কার ধর্ম বা জাদুকে চিনবার উপায় কি বা এদের পৃথক-অস্তিত্ব বর্তমান কিনা? নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা প্রতিবর্ণিত হলো।

এক কথায় কেবল মাত্র বিশ্বাসই অন্ধসংস্কার বা superstition একটি যৌথ ঘটনা, যা একাধিক বিশ্বাসের সমবায়ে সংঘটিত। এই বিশ্বাস এমন সব আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ যা পালনীয় বা বর্জনীয় বলে সামাজিক মানুষেরা বিশ্বাস করে এবং ব্যবহারিক জীবনেও পালন করে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক লৌকিক সংস্কার ধর্ম ও জাদু সংক্রান্ত বিশ্বাস বিমিশ্র হয়ে আছে। কারণএর পিছনে 'ফেয়ার অব দ্য আননরম্যাল অ্যাণ্ড অ্যাবনরমাল'—যা অস্বাভাবিক, অজানা তাই ভয়ের কারণ ও সব সময় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আদিম মানুষ তার নিগূঢ়-প্রাত্যহিকতা দিয়ে যে সব আচার-ব্যবহার ঘটনা ও লক্ষণকে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষিত করে কাজে লাগাতে পারেনি তাকেই ঘিরে গড়ে ওঠে তারই সংস্কার। ধীরে ধীরে তা তার সমাজে পল্লবিত হয়, পরিশেষে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যবহারিক দিক থেকে এই সংস্কারকে ত্রিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : ক. জ্ঞানীর সংস্কার, খ. ভক্তের সংস্কার, গ. কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক সংস্কার।

জ্ঞানকেন্দ্রিক সংস্কারের মূল ভিত্তি দর্শন বা প্রকৃষ্টজ্ঞান। জ্ঞানীরা এগুলি অনুসরণ করে চিত্তবৃত্তি নিরোধের পথে অগ্রসর হন। পতঞ্জলি তাঁর 'যোগসূত্রে' এই নিয়মের প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় বা ভক্তের সংস্কার হলো ভক্তি বা শ্রদ্ধা কেন্দ্রিক। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্। পত্র-পুষ্প-বারি প্রত্যার্পণ' করে ভক্ত তার অভিষ্ট দেবতার আরাধনা করে থাকেন। এই আরাধনা তথা শ্রদ্ধাভক্তি মানুষকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দেয়।

তৃতীয় বা কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক সংস্কার হলো তাই যা কেবল 'ধনং দেহি রূপং দেহি যশঃ দেহি' ইত্যাদি বলে পূজা ও প্রক্রিয়াদির মাধ্যমে চাওয়া-পাওয়ার ফর্দ পেশ করা। এতে ধীরে ধীরে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। [২]

মোটের উপর বিশ্বাস যখন বাস্তবে সত্য হয়, সামাজিক অনুমোদন লাভ করে তখন তা লোক-সংস্কার বা superstition-এ পরিণত হয়। এই সূত্রেই এর মধ্যে 'রিচুয়াল-সেরিমনি' ঢুকে পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে Ritual বা ক্রিয়া হলো—ধর্মীয় বিধি-বিধানকে কার্যকরীভাবে সার্থকতা মণ্ডিত করার পদ্ধতি। যেমন প্রার্থনা, ধর্মীয় সঙ্গীত, দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য-নিবেদন, বলি-প্রদান, খয়রাত দেওয়া ইত্যাদি।

আর উৎসব বা অনুষ্ঠান [ceremony] হলো অনেকগুলি ক্রিয়ার যুগপৎ সম্মেলন। যেমন দুর্গাপূজা, গাজন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। এসব করতে গেলে একই সঙ্গে বা পরপর অনেকগুলি ক্রিয়া করতে হয় মানুষকে।

আমরা জেনেছি, অনুষ্ঠান হলো একাধিক ক্রিয়ার সমাহার। এই ক্রিয়াগুলি আসে সংস্কারের ফলে। আবার সংস্কার আসে বিশ্বাসের ফলে। সুতরাং গাণিতিক সূত্রায়নে, অনুষ্ঠান : ক্রিয়া : : বিশ্বাস একথা আমরা বলতে পারি।

উপরি উক্ত যে তিনটি সংস্কারের কথা আলোচিত হলো অর্থাৎ জ্ঞানীর সংস্কার, ভক্তের সংস্কার এবং কামনা-বাসনা কেন্দ্রিক সংস্কার—অনেক সময় এই তিনটি একই সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে অচ্ছেদ্য থাকে অথবা একে অপরের পরিপূরক। অনস্বীকার্য যে, লোকজীবনের মধ্যে যেগুলি প্রতি নিয়ত প্রবহমান ক্রিয়াশীল—সেগুলিই স্থায়ীত্ব লাভ করে, আর যেগুলি সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে বাতিল ও মৃত বলে গণ্য হয় তাই কুসংস্কার। আবার উপরে বর্ণিত ত্রয়ী সংস্কারের যে কোনো একটি বিভাগ যদি প্রবলভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিংবা প্রশ্রয় পায় তখন সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ইত্যাদির পথ ধরে কুসংস্কারে পরিণত হয়, উপস্থিত হয় ধর্মের গ্লানি ইত্যাদি।

ধর্ম সম্বন্ধে শব্দকোষে বলা হয়েছে—ধর্ম পুং ক্লী। ধৃ+ম (মন) ক। এর অর্থ করা হয়েছে :

ক. লোক ধারক শ্রেয়, শুভদৃষ্ট, পুণ্য।

খ. চতুবর্গের একতম।

গ. আচার অনুষ্ঠান।

ঘ. শাস্ত্রদৃষ্টকার্যমাত্র, শাস্ত্রানুশাসন।

ঙ. সম্প্রদায় বিশেষের শাস্ত্র বিধি।

চ. ন্যায়, বিচার, নীতি

ছ. ঈশ্বরের অনুরাগ।[৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে ধর্ম হলো :

ক. মানুষের একটি অবশ্য পালনীয় অধ্যাত্ম বিশ্বাস, যা অতিপ্রাকৃত বিষয় সম্পর্কে নির্ভরশীল ও দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অনুভূতি সৃষ্টি করে ও স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসের ভিত্তিকে দৃঢ় করে।

খ. পূজ্য বা ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে যে কোনো রকমের বিশ্বাস।

গ. অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে কাজে পরিণত করার অত্যাবশক অঙ্গ।

ঘ. ধর্মীয় বিশ্বাসকে বাস্তব সম্মত রূপ দেওয়া।

ঙ. বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন কারুর নিকট কোনো অভিপ্রায় জ্ঞাপন বা বস্তু উৎসর্গ অথবা সে সম্পর্কে যত্নবান হওয়া।

Religion–first, a belief in super human beings who rule the world, and, second, an attempt to win their favour......[৫] অর্থাৎ ধর্ম হলো বিশ্ব-নিয়ামক দৈব বা অতিমানুষিক শক্তিতে এক ধরনের বিশ্বাস—যারা অনুগ্রহ ভাজন তাদের জয়লাভে সাহায্য করে।

একথা প্রতীয়মান যে, ধর্ম বিশ্বাসের মূলে রয়েছে জীবন-যুদ্ধের ব্যর্থতা বা জীবনের অনিশ্চয়তাকে প্রতিহত করার এক সুকৌশল অভিব্যক্তি। আদিম মানুষ তার প্রতিটি কর্ম ও ঘটনার কারণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা সূত্র খুঁজে নিয়েছে। সেই সূত্র অনুযায়ী ব্যাখ্যাত বিশ্বাসকে যখন কার্যকরী ভূমিকায় সঠিক সংযোগ সম্ভব করতে পারেনি তখনই তাকে বিভিন্ন শক্তির খেলা বলে ধরে নিয়েছে। এই শক্তি চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সর্বত্র সমুপস্থিত। এ-শক্তি এত বিরাট যে এর কাছে মানুষকে মাথা নোয়ানো ছাড়া আর কোনো পন্থা থাকে না। এই শক্তিকে খুশি করতে পারলে জীবনের যা কিছু কাম্য, চাওয়া-পাওয়া, শঙ্কা-বিপদ সবই উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। এই চিন্তা বা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে মানুষ সর্ব-কারকের সেই বিভিন্ন কারণ শক্তি অর্থাৎ আত্মা বা প্রাণশক্তি বা দৈব শক্তিকে স্তব-স্তুতি, আবেদন-নিবেদন, উপাচার-উপাদন সহযোগে খুশি, শান্ত ও বশ করতে চেষ্টা করেছে। সেই আদিমতম অরণ্য জীবনের সময় থেকেই বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল কর্ম কাণ্ডের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত হয়ে নতুন-নতুন ধর্ম তথা দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। সেকারণে বলা যায়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে ধর্ম। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে ধর্মের কার্যকরী ভূমিকা অবিসংবাদিত রূপে সত্য। যদিও সকল ধর্মই তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজ-নিজ অনুসারীদেরকে নির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকে। সেই-ভাবেই প্রতিপালিত হয় পূজা-প্রার্থনা, স্তুতি-অর্চনা, উপহার-বলি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ইত্যাদি।

দৈবশক্তি বা 'দেব' শব্দটি সংস্কৃতে যে অর্থে প্রচলিত ইরানীয় ভাষায় জরথুষ্টের নব্য ধর্ম প্রচারের জন্য অর্থ হয় 'উপদেবতা'। উপদেবতার পরবর্তী স্তর হিসেবে গণ্য হয়েছে দৈত্য বা রাক্ষস। ইংরাজি Demon শব্দের অর্থ উপদেবতা, দৈত্য হলেও এর বিভিন্নতা বর্তমান, যদিও গ্রীক্ ভাষায় এর অর্থ--দেবতা। এই যে উপদেবতা, দৈত্য বা রাক্ষস ইত্যাদি প্রসঙ্গ এসেছে, তুলনামূলক ভাবে এরাও কম শক্তিধর নয়। জনজীবনে অতিন্দ্রিয়, অশরীরী এইসব শক্তি অঘটন ঘটাবার কারক বলে বিশ্বাস। বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাক, অশুভ-অমঙ্গলের কাজ এদেরই সাহায্যে সংঘটিত হয় এবং রোগ-মৃত্যু, ক্ষণস্থায়ী জীবন ও জীবনের অনভিপ্রেত দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। Thompson এই দৈত্য-রাক্ষস প্রসঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে ত্রিবিধ পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

ক. অদেহী শক্তি : মানুষের মৃত্যুর পর যে আত্মা কোনো মূর্তি পরিগ্রহ করে না। এরা সাধারণত ভূত প্রেত ইত্যাদি নামে পরিচিত।

খ. নৈর্ব্যক্তিক শক্তি : কল্পনাতীত এক বিশেষ শক্তি যাদের মূর্তি রূপ পরিলক্ষিত হয় না। পৃথিবীর সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিতান্তই স্বল্প। এরা দৈত্য-দানব প্রভৃতি নামে পরিচিত।

গ. অর্ধ-নৈর্ব্যক্তিক শক্তি : মানুষ ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির মিলনে সৃষ্ট যে অর্ধ মানব অর্ধ দানব রূপমূর্তি পরিগ্রহ করে।[৬]

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাস, মানুষ বা অন্যান্য জীব-জন্তু ও প্রাণীর মৃত্যুর পরও তার দেহস্থিত আত্মার মৃত্যু হয় না। জাগতিক পৃথিবীর অচরিতার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা নিয়ে সেই আত্মা বা শক্তি অন্যরূপ ধারণ করে ; জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এদেরকে এড়াবার উদ্দেশ্যেই মৃত প্রাণীকে যথাবিহিত সংকার করার নিয়ম প্রচলিত : মাটির নীচে চাপা দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া, ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা কিংবা অর্ধেক পুঁতে রাখা ইত্যাদি। মৃতকে যথাযথভাবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাহিত করা না হলে তার আত্মা থাকে ক্ষুধার্ত, অতৃপ্ত। এরা ভূত-প্রেত, দানব-দৈত্যে রূপান্তরিত হয়ে, সাপ-ব্যাঙ, কাক-চিল, বিড়াল-বানর প্রভৃতি হয়ে মানুষের চলাচলের পথে বিভিন্ন জায়গায়, খালে-বিলে-ডোবায়, গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে, আনাচে-কানাচে, পাহাড়ে-গুহায়, রাস্তার মোড়ে, নির্জন প্রদেশে, শ্মশানে, ভাঙা মন্দিরে, পরিত্যক্ত বাড়ি যে কোনো স্থানে থেকে অনিষ্ট করতে সচেষ্ট হয়। যত রোগ-ব্যাধি ও অন্যান্য অকল্যাণকর অমানবিক সংঘটনের জন্যই এরা দায়ী। সুতরাং প্রকাশিত অথবা অ-প্রকাশিত এইসব দেব-দেবকল্প বা প্রেতশক্তিকেও আয়ত্তে আনতে, তাদেরকে প্রতিহত করতে সেই একই স্তব-স্তুতি, পূজা-প্রার্থনা, যাগ-যজ্ঞ, উপচার-মানত প্রদান ইত্যাদি করতে হয়েছে। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে বৃহৎ বা সর্বশক্তিমান দেব-দেবী ও তাদের অধঃস্তন দেব-দেবী এবং উপ বা অপদেবতা অর্থাৎ ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব-রাক্ষস ইত্যাদি। মানুষ এইসব অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবশক্তি অথবা প্রেতশক্তিকে একাকী নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই যূথচারী যাযাবর মানুষ তাদেরকে প্রতিহত করবার জন্য এমন একটি বিশিষ্ট মাধ্যমকে খুঁজে ফিরেছে যার সাহায্যে নিজেদের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া যায়। এই মাধ্যম হলো ধর্মগুরু কুল-পুরোহিত, শামন বা গুণিন ইত্যাদি। এঁরা মানব সমাজ ও অতিলৌকিক শক্তির

মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি করেন, ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করেন, রোগ চিকিৎসা করেন যত অবিনাশী বিনাশন প্রক্রিয়াকে মঙ্গলজনক মহিমা প্রদান করেন ইত্যাদি--অবশ্যই তা নিজ এক্তিয়ারের দেবতার অনুগ্রহ-আনুকূল্যে। এঁরা একই সঙ্গে স্তব-অনুষ্ঠান করেন আবার প্রয়োগ-বিধির কাজেও সিদ্ধহস্ত। একজন মানুষ অথবা গোটা সমাজের হয়ে অন্য আরেকজন মানুষ ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি করে তার মঙ্গল-বিধান ও স্বস্তি নিরাপত্তা এনে দিচ্ছে--এই শক্তিকেই মাধ্যম হিসেবে মানুষ সমীহ বা স্বীকার করে নিয়েছে স্মরণাতীত প্রাচীন কাল থেকেই।

গুণিন বা পুরোহিতের ক্রিয়া-অনুষ্ঠান একই হলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এদের পার্থক্য বর্তমান। পার্থক্যের সূত্রটি নিম্নের ছকে দেওয়া হলো :

গুণিন	পুরোহিত
ক. গুণিনেরা আংশিক ভাবে ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।	পুরোহিতেরা সম্পূর্ণভাবে, সর্বক্ষণের জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
খ. অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ অবিসংবাদিত রূপে বেশি।	অতীন্দ্রিয় শক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেন। এরা দেব-দেবীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হন। ব্যক্তি বিশেষের জন্য পূজা-অর্চনা করা হয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
গ. গুণিনদের ক্ষেত্রে স্থিরিকৃত কোনো বিধি-বিধানের প্রশ্নই ওঠে না।	পুরোহিতগণ সর্বত্রই এবং সর্বদা স্থিরিকৃত বিধিবিধান অনুসরণ সাপেক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
ঘ. গুণিনদের উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা আয়োজিত ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে।	পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে উন্নত ব্যবস্থার মধ্যে। এরা সামাজিক পর্যায়ে সর্বাধিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
ঙ. সামাজিক প্রতিষ্ঠা উভয়েরই সমান। গুণিন বা পুরোহিত একই ব্যক্তি হতেও পারেন।	

পৃথিবীর সব ধর্মে যেমন বৃহৎ সর্ব শক্তিমান দেবদেবী এবং অধঃস্তন দেবদেবী আছেন, তেমনিই আছেন স্থানীয় বা আঞ্চলিক দেবদেবী। এঁদেরই পাশাপাশি ছায়ার মতো থাকে অপদেবতা বা প্রেত-শক্তিসমূহ। স্থানীয় দেবদেবীরা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মানীয় শক্তিশালী দেব-দেবীর চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতাধারী হন। তুল্যমূল্য বিচারে এঁরা মানুষের অনেক কাছের, অনেক আপন, অনেক বেশি ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গে সংযুক্ত। এঁদেরকে প্রতিহত বা বশ করতে এঁদেরই দয়া-দাক্ষিণ্যের কাছে, ক্ষমতার কাছে বৃহৎ-দেবতারাও

ঈর্ষণীয় ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। লৌকিক মানুষ তাদের ধ্যান-জ্ঞান-মন-আত্মা দিয়ে প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় বৃহৎ দেবতার অস্তিত্বের উপলব্ধি করতে সব সময় সক্ষম নয়, হতেও পারেনি। যদিও সমস্ত দেবদেবীই যুগপৎ মঙ্গলময় ও ভয়ঙ্করী। দেবতা যখন মঙ্গল বিধানে নিরত তখন তিনি প্রসন্ন ও অকুণ্ঠ। তাঁর কৃপায় সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী হয় রোগশূন্য, পুত্র-পুত্রাদি, ধন-জন, সুখ-শান্তি, শক্তি-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে ভক্তের পৃথিবী। বিপরীত পক্ষে তিনি ভয়ঙ্করী অর্থাৎ অখুশি হলে ভক্তের পৃথিবী শ্মশানতুল্য হয়, দেশে নেমে আসে হাহাকার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, রোগ-মৃত্যু ইত্যাদি। দেব-দেবীর নামকরণের মধ্যেও যুগপৎ কল্যাণকর ও ভয়ঙ্করত্ব উভয়ই বর্তমান : শিব, বিশ্বনাথ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, নারায়ণ, বিষ্ণু, অন্নপূর্ণা, গৌরী, উমা, লক্ষ্মী, সর্বমঙ্গলা, চণ্ডী, ভীমা, ছিন্নমস্তা, কালী, করালী, খোদা, রসুল, পীর, গাজী, বিষহরি, কামাক্ষাবুড়ি, হাড়ির ঝি প্রভৃতি। মানুষ চিরকাল ধরেই এইরকম দৈব শক্তিকে কল্পনা করে ধর্মীয় যাগ-যজ্ঞ, স্তব-স্তুতি, আবেদন-নিবেদন, উপচার-উপাদান প্রদানের মাধ্যমে আনুকূল্য লাভে সচেষ্ট থেকেছে।

সংক্ষেপে নিম্নের ছকে কয়েকজন সর্বজনীন ও আঞ্চলিক দেবদেবী এবং তাঁদের অবস্থানের বা চিহ্নিত ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক সংখ্যা	দেব / দেবী	পুং / স্ত্রী	অবস্থানের ক্ষেত্র	সর্বজনীন / আঞ্চলিক
১.	নারায়ণ / গোপাল / হরি / বিষ্ণু / নরসিংহ / সত্য নারায়ণ	পুং	বিষ্ণু : সর্বসংরক্ষক	সর্বজনীন
২.	ব্রহ্মা	”	ব্রহ্মা: সৃষ্টিকর্তা	”
৩.	মহাদেব / শিব / পঞ্চানন / রুদ্র / ভোলা নাথ	”	শিব : প্রলয়কর্তা	”
৪.	লক্ষ্মী	স্ত্রী	সম্পদের দেবী	”
৫.	ভারতী / কামাক্ষা / বিশালাক্ষী / প্রভাতী / দুর্গা	”	ভগবতী : শিবের স্ত্রী বা সহগামী	”
৬.	চণ্ডী	”	শিবের সহগামী কিন্তু পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিতা	”
৭.	কালী	”	”	”
৮.	শীতলা	স্ত্রী	মহামারী সংক্রান্ত রোগের দেবী	সবর্জনীন
৯.	মনসা / বিষহরি	”	সাপের দেবী	”
১০.	রাম / রঘুনাথ	পুং	মহাকাব্যিক নায়ক : বিষ্ণু অবতার	”
১১.	লক্ষ্মণ		মহাকাব্যিক নায়ক এবং রামের ভাই	

১২.	হনুমান / মহাবীর	"	মহাকাব্যিক নায়ক এবং বানর দেবতা ও রামের শিষ্য	"
১৩.	সীতা	স্ত্রী	রামের স্ত্রী	"
১৪.	আল্লা / খোদা	পুং	মুসলমান সৃষ্টিকর্তা	"
১৫.	সিঙবোঙ্গা	"	মুণ্ডা-বীরহ-ভূমিজ ইত্যাদি আদিবাসী গোষ্ঠীর সুবৃহৎ দেবতা	আঞ্চলিক
১৬.	মারং বুরু	"	সাঁওতাল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর পাহাড়-দেবতা	"
১৭.	বহরাম	"	লোধা-ভূমিজ ইত্যাদি গ্রামরক্ষক দেবতা	"
১৮.	যুগিনী / যোগিনী	স্ত্রী	শীতলা সংশ্লিষ্ট দেবী / শক্তি	"
১৯.	পিশাচিনী	"	ডাইনী শক্তি	"
২০.	কালপুরুষ	পুং	পুরুষ শক্তি	আঞ্চলিক
২১.	ভূত / প্রেত / প্রেতিনী	পুং / স্ত্রী	উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভ্রমণকারী অতৃপ্ত পুরুষ কিংবা নারীর আত্মা	আঞ্চলিক
২২.	প্রেতিনী	স্ত্রী	শিশুদের ভূত বা উপসর্গ	"
২৩.	যক্ষ	পুং	পুরুষশক্তি : সম্পদের প্রহরী	"
২৪.	ধন্বন্তরী	"	ওঝা-বৈদ্য: চিকিৎসক	"
২৫.	ফতেমা	স্ত্রী	মুসলীম ঃ আল্লা সহগামী	সর্বজনীন
২৬.	বনবিবি	"	জঙ্গল সম্পর্কিত দেবী	আঞ্চলিক
২৭.	আস্তিক মুনি	পুং	মনসা সংশ্লিষ্ট	"
২৮.	দক্ষিণ রায়	"	জঙ্গল সংশ্লিষ্ট দেবতা	"
২৯.	দক্ষরাজ	"	পুরাণ প্রাসঙ্গিক	সর্বজনীন
৩০.	গড়ুর	পুং	পুরাণ প্রাসঙ্গিক নারায়ণ ভৃত্য	"

৩১.	মাকাল ঠাকুব	”	মাছের দেবতা	আঞ্চলিক
৩২.	যোগাদ্যা	স্ত্রী	দুর্গা ও কালী সংশ্লিষ্ট	”
৩৩.	গোমুয়া	পুং / স্ত্রী	গরু সংশ্লিষ্ট আত্মা বা ভূত	”
৩৪.	ঘোড়া	পুং / স্ত্রী	”	”
৩৫.	চিরকুনি	”	প্রসবাবস্থায় মৃত নারীর আত্মা	”

মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি, ধর্মসম্পৃক্ত অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ একক ভাবে যদি কোনো একটি বিশেষ বিষয় আদিমতম কাল থেকে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা হলো জাদু শক্তিতে বিশ্বাস। ইংরাজি Magic শব্দের বাংলা পরিভাষায় জাদু। Magic শব্দটি এসেছে ফার্সী Magic শব্দ থেকে যার অর্থ পুরোহিত শ্রেণীর ব্যক্তি। এঁরা যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালন করতেন গ্রীকরা সেগুলিকেই বলত Magic। Magic হলো :

"The art of compulssion of the supernational ; also the art of controlling nature by supernatural means."[৭]

অর্থাৎ জাদু অতীন্দ্রিয়কে বশ করার বিদ্যা এবং সেই একই সঙ্গে অতীন্দ্রিয় উপায়ে প্রকৃতিকে বশ করার শাস্ত্র। জাদু প্রসঙ্গে অন্যত্র বলা হয়েছে :

ক. কোনো অতি-প্রাকৃত কলা-কৌশল, ইন্দ্রজাল বা ভোজ-বিদ্যা।

খ. হাতের কৌশল বা চাতুরী।

গ. যে কোনো সহায়ক শক্তিযুক্ত কাজের বিস্ময়কর ফলাফল।[৮]

মানুষ যেদিন থেকে তার নিজের চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে শিখেছে সেইদিন থেকেই এই জাদু-সম্পর্কে বিশ্বাসী। অ্যাবে ব্রুইল বিরচিত 'ফোর হাড্রেড সেঞ্চুরীজ অব কেভ আর্ট' গ্রন্থ অবলম্বনে ফ্রান্সের পীরেনিজ পর্বতমালার আরিয়েজ অঞ্চলে 'তিনভাই', [ত্রোয়া ফ্রো : Trois Frere] গুহার একটি নৃত্যরত মূর্তি [জাদুকর] পর্যবেক্ষণে অনুমিত হয় যে—মানব সমাজে জাদুর অস্তিত্ব ২০,০০০ কম-বেশি বছর।[৯]

মানুষের চিন্তাধারার যে ভিত্তির উপর জাদুবিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে তার নীতি ফ্রেজারের মতে দ্বিবিধ :

ক. First, that produces like, or that an effect resembles its cause. সদৃশ ঘটনা বা কারণ সদৃশ ফলাফলের জন্ম দেয়, অথবা ফলাফল সর্বদা কারণের অনুরূপ হয়।

খ. Second, that things which have once been in contact with other continue to act on each other at a distance offer the physical contact had been savered. যে-সমস্ত বস্তু বা ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে

সম্পৃক্ত, সেই বস্তু বা ব্যক্তি শারীরিকভাবে পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও উভয়ে উভয়ের ক্রিয়াশীল থাকে।

এই নীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে প্রথম নীতি Law of similarity বা সদৃশ নীতি যাকে Homeopathic বা Sympathetic বা Imitive ম্যাজিক বলে। দ্বিতীয় নীতি হলো Law of contact or contagious বা সংক্রামক তথা সংস্পর্শ মূলক নীতি।[১০]

উপরি-উক্ত নীতিদ্বয় থেকে আদিম মানুষের নিম্নলিখিত সূত্রগুলি ধরা পড়ে। প্রথম নীতিতে যথাক্রমে :

ক. সদৃশ ঘটনা সদৃশ ফলাফলের জন্ম দেয়।

খ. সদৃশ জাদু প্রধানত শত্রু ধ্বংসের কারণে উদ্ভূত হলেও প্রয়োজনানুসারে মঙ্গলজনক ফললাভের উপায় স্বরূপ ব্যবহার করা হয়।

গ. সদৃশ জাদু-বিধানে রোগের চিকিৎসা ও রোগের প্রতিরোধ মূলক কাজ করা হয়। এইরকম ক্ষেত্রে যাদুকর বা পুরোহিতগণ রোগীর উপর চিকিৎসার পদ্ধতির প্রয়োগ না-ঘটিয়ে নিজের উপর প্রয়োগ করেন বেশি।

ঘ. সদৃশ জাদুর সাহায্যে আদিম মানুষ বিশেষ করে শিকারি ও জেলেরা পর্যাপ্ত খাদ্য ও শিকার সংগ্রহ করতেন। বিভিন্ন সমীক্ষার ভিত্তিতে দেখা গেছে, পূর্বে টোটেমবাদী জনগোষ্ঠীরাই সদৃশ জাদু বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল ছিল বেশি।

দ্বিতীয় নীতি পর্যালোচনা করলে যে অনুক্রমগুলি পাওয়া যায় তা হলো :

ক. কোনও বস্তু যা ব্যক্তির সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ তা ব্যক্তির শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও উভয়ে উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এইজন্য কেউ কাউকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেও তার দ্রব্য সামগ্রী, পোষাক, পরিচ্ছদ, দাঁত, চুল, নখ, গায়ের ময়লা ইত্যাদির মাধ্যমে জাদু প্রয়োগ করা হয়।

খ. ব্যক্তির পদচিহ্ন, শরীরের ছায়া যে স্থানে পড়ে সেইস্থানে বা অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করে, এঁকে জাদু প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ফ্রেজার জাদুকে প্রকৃতির বিধান (Natural Law) ধরে নিয়ে জাদু শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করে বলেছেন :

ক. জাদু বিদ্যা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের একটি মেকি ব্যবস্থা বা ঝুটা বিজ্ঞান। এই তত্ত্বীয় জাদু সহযোগে পার্থিব ঘটনা ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে লাভ-ক্ষতির জ্ঞানলাভও সম্ভব।

খ. জাদু বিদ্যা একই সঙ্গে আচার-আচরণের একটি কৃত্রিম পথ নির্দেশ ও ব্যর্থ শিল্প। এই ফলিত বা ব্যবহারিক জাদু অবলম্বন করে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাবার জন্য, বাঁচার জন্য, বিশেষ পথ ও নীতি অনুসরণ করা হয়।[১১]

যদিও বহু বিজ্ঞানী এইমত গ্রহণীয় বলে মনে করেন না। ফ্রেজারের এই মতকে আরো বিস্তৃতি ও নিরপেক্ষতা দিয়ে মেলিনোওস্কি বলেছেন—জাদু-বিদ্যা মেকি বিজ্ঞান বা শুধু বিজ্ঞান নয়। উভয়ের মধ্যেও কোনো বিরোধ নেই। বরং আদিম মানুষ উভয়কেই

পাশাপাশি রেখে উভয়কেই তার উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগিয়েছে। জাদু ও বিজ্ঞান উভয়কেই পরস্পর সহযোগিতা করে এগিয়ে যায়, কেউ কারুর অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না।

আদিম মানুষ বিশ্ব-চরাচরে সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে একটা বিশেষ শক্তির কল্পনা করে যাবতীয় ঘটনার পিছনে কার্য-কারণ সূত্র প্রসঙ্গে উক্ত শক্তির ক্রিয়াশীলতার সম্পর্ক খুঁজে ফিরেছে। এই চিন্তা-চেতনাকে পণ্ডিতগণ Animism বা সর্বপ্রাণবাদ আখ্যা দিয়েছেন। নৃতত্ত্ববিদগণ বলেছেন—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আদিম সমাজে বিশ্বাস ছিল মানুষের দেহ মধ্যস্থিত আত্মাই জীবন এবং তাই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ যখন নিজেদের দেহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্ন ছায়ার ব্যাখ্যা ইত্যাদি না করতে পেরে বিশ্বাস করেছে তাদের চিন্তা-চেতনা তথা সংবেদন প্রক্রিয়া কিছুই নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়। এ কোনো এক বিশিষ্ট আত্মার কাজ। যে আত্মা দেহতেই বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহ পরিত্যাগ করে। আত্মা যদি মৃত্যুর পর দেহ পরিত্যাগ করেও বেঁচে থাকে তাহলে তার আর স্বতন্ত্র মৃত্যুর সম্ভাবনা আবিষ্কারের কারণ থাকে না। এইরকম ধারণা থেকেই আত্মা অমর এমন বোধ এসেছে।

অপরদিকে বহিঃর্বিশ্বের যাবতীয় বস্তু বা ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রক কোনো শক্তি বা আত্মা। এর আবার চারটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় :

প্রথম পর্যায় হলো আত্মার আবিষ্কার।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো বিশ্বের সমস্ত বস্তুর মধ্যে আত্মা সম্পন্ন অস্তিত্বে বিশ্বাস অর্থাৎ Soul-like beings।

তৃতীয় ধারায় ব্যক্তি-জীবনে ও বিশ্ব-জীবনে আত্মার অস্তিত্বকে ধীরে ধীরে পূজা, উপাসনা, ভক্তি ও ধর্মের প্রাথমিক অবস্থা হিসাবে গড়ে তুলেছে। আবিষ্কার হয়েছে দেবতা, দেবতাদের বাসস্থান। বৃষ্টি, বজ্র, বায়ু, মৃত্তিকা, জল, সমুদ্র, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি বিশ্ব আত্মায় দেবতার রূপান্তর হতে থাকে। এরা ধর্ম তথা মঙ্গল ও অমঙ্গল কারণের জন্য দায়ী।

চতুর্থ ও সর্বশেষ পর্যায়ে এইসব দেব-দেবী বা বিভিন্ন শক্তির কল্পনাকে অতিক্রম করে উদ্ভব হয়েছে একজন সর্বশক্তিমান দেবতা, ঈশ্বর বা একেশ্বর বাদের ধারা অথবা ব্রহ্ম তথা এক অখণ্ড শক্তি কল্পনার ধারা। দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় সবধর্মেই আত্মার অবিনশ্বরত্বের কথা স্বীকার করা হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদ থেকে ধর্মের তত্ত্বগুলি কিভাবে আত্মা বিষয়ক বিশ্বাস গড়ে তুলেছে সর্বপ্রাণবাদের আবিষ্কর্তা ই. বি. টাইলর তাঁর গ্রন্থে সূত্রাকারে দেখিয়েছেন।[১২]

সর্বপ্রাণবাদ বা Animism পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোক-সমাজের মধ্যে জাদু-সংস্কার ও ধর্মের মূলে নিহিত এক ধরনের বিশ্বাস। এর মূল কথা—আত্মা ও পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস। টাইলরের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আদিম মানুষের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। প্রশ্নগুলি যথাক্রমে এইরকম :

ক. কিসের কারণে এবং কেন জীবন্ত শরীর ও মৃত দেহের পার্থক্য সূচিত হয়?

খ. নিদ্রা, জাগরণ, মূর্ছা, রোগ-ব্যাধি, মৃত্যু কিসের দ্বারা সংঘটিত হয়?

গ. স্বপ্ন ও দৈব-প্রত্যাদেশের মধ্যে কোন্ মনুষ্য দেহ আবির্ভূত হয় ইত্যাদি। টাইলর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন এইভাবে যে মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বর্তমান।

ক. জীবন—যাকে বলা হয় প্রকৃত আত্মা বা Vital Soul.

খ. প্রকৃত আত্মার প্রচ্ছায়া বা Apparitional Soul.

উভয় সত্তা যেহেতু শরীর সম্পৃক্ত তাই উভয় সত্তাই পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সত্তা-স্বরূপ মানুষের কাছে বাষ্পসদৃশ, হালকা, ছায়ার মতো—যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, চিন্তা করার শক্তি যোগায়। [১৩]

সর্বপ্রাণবাদ জাদু ও ধর্মের উভয়েরই উৎস বলা হলেও চরিত্রের দিক থেকে উভয়ই সম্পূর্ণ আলাদা। বিজ্ঞানের সঙ্গে কি ধর্মের কি যাদুবিদ্যার কোনো সংঘর্ষ নেই। মানুষের জীবনে এগুলি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে পরম শান্তিতে বসবাস করে জীবনে চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে। বলা হয়েছে, ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বিপুল ভূমিকা পালন করে। রেমণ্ড ফার্থর তাঁর 'এলিমেণ্টস অফ সোসাল অরগানাইজেশন' (১৯৫১) গ্রন্থে বলেছেন, ধর্ম :

ক. ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সমাজে-সমাজে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে পরিবারের, পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে অপর সদস্যের সম্পর্ক বিষয়ে এক বৃহৎ কর্তব্য পালন করে।

খ. সামাজিক সংগঠনগুলিকে শুধু যে রক্ষা করে তা নয়, তাকে নৈতিক মূল্যে বিচার করে, অনিশ্চয়তা ও উদ্বিগ্নতার মুখে সাহস যুগিয়ে একের প্রতি অন্যের নৈতিক কর্তব্যকে জাগিয়ে তুলে ধর্ম মানব সমাজকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যায়।

সমাজে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞানের কার্যকারিতা-সম্পর্কে মানুষ যখন সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করতে পারে না তখনই জাদু-শক্তির স্মরণাপন্ন হয়। মানুষের বিপন্নতা অসহায়তাই হলো জাদুবিদ্যার ক্ষেত্র। আহার অন্বেষণ, শিকার, মাছধরা, যুদ্ধের সময় কিংবা প্রণয় লাভের জন্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগাক্রান্ত হলে, কিংবা মৃত্যু আসন্ন হলে জাদুবিদ্যা অনিবার্যভাবে বিশ্বাসের জমিতে শিকড় বিস্তার করে। তবে একথা ঠিক জাদুর উদ্দেশ্য তথা প্রয়োগক্ষেত্র সর্বত্রই এক নয়, বিচিত্র। ভাবাগত, অঞ্চলগত পার্থক্য অনুযায়ী জাদু এবং প্রয়োগকারীর উপাদানের বিভিন্নতা ঘটে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জাদু প্রয়োগের উপাদান হলো যথাক্রমে : ক. বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ব্যবহার, খ. ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন, গ. মন্ত্র প্রয়োগ।

সমস্ত জাদু প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এই তিনটিই থাকবে এমন নয়, তিনটির প্রত্যেকটিই থাকতে পারে, আবার একটি অথবা দুইটি থাকতে পারে। তবে তিনটির মধ্যে কোন উপাদানটি অধিকতর জরুরি তা নিশ্চিত রূপে বলা কঠিন। এ নির্ভর করে প্রয়োগকারী ও প্রয়োগের বিষয়ের উপর। বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য নীচের ছক অনুসরণ করা যেতে পারে :

প্রথম ছক : জাদু-বিদ্যা ও ধর্মের সাধারণ উপাদান সমূহ দেখান হলো।

জাদু	ধর্ম
ক. অতীন্দ্রিয় শক্তিকে মানুষ যে বশ করতে পারে--এই ক্ষমতার অধিকারে বিশ্বাস।	অমানবিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।
খ. অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বশ মানাতে মন্ত্রের ব্যবহার।	প্রার্থনা, স্তব-স্তুতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাফল্যের জন্য অনুনয় বিনয় করা।
গ. ক্রিয়ানুষ্ঠানে ব্যবহৃত মন্ত্র সিদ্ধ বস্তু ইত্যাদি ব্যবহার--যে বস্তু বা পদার্থ নিজেরাই বিশেষ শক্তিসম্পন্ন।	যাগ-যজ্ঞ, প্রতীক, উৎসর্গ, বলি-প্রদান বা কোরবানী সংক্রান্ত ক্রিয়ানুসরণ।
ঘ. অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস।	আধ্যাত্মিক সত্তায় বিশ্বাসী।
ঙ. ব্যক্তির স্বার্থ-সেবার জন্য ব্যবহৃত।	সমাজের সকলের জন্য দলগতভাবে সবাই অংশগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় ছক : ঘটনার মধ্যে জাদুবিদ্যা ও ধর্মের যে সাধারণ উপাদান সমূহ বর্তমান তা দেখান হলো।

জাদু	ধর্ম
ক. মূলত জাদু বিদ্যাগত উপাদান যা ধর্মের সঙ্গে সাধারণভাবে বর্তমান।	মূলত ধর্মীয় উপাদান জাদু বিদ্যাতেও সাধারণভাবে বর্তমান।
খ. মন্ত্রের শব্দের মধ্যে অতীন্দ্রিয়-অলৌকিক শক্তিকে বশ করার ক্ষমতা অবিসংবাদিত।	
গ. বস্তু বা প্রতীক গুণে বিশ্বাস।	
ঘ. ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত।	আধ্যাত্মিক সত্তার মাধ্যমে দল বা গোষ্ঠীর পার্থিব স্বার্থরক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয়।
ঙ. যন্ত্রপাতি, অর্থনৈতিক উন্নয়াদি এবং তার আনুষঙ্গিক বস্তু বা প্রতীককে আশীর্বাদিত করা। [১৪]	

অতএব গাণিতিক সূত্রায়নে বলতে পারি জাদু : ধর্ম :: ক্রিয়া : অনুষ্ঠান।

লৌকিক জীবনে বিশ্বাস অনুযায়ী জাদুর প্রয়োগক্ষেত্র, উদ্দেশ্য ও তার সামাজিক তাৎপর্য বিবেচনায় রেমণ্ড ফার্থ যে ত্রয়ী পর্যায় ভুক্ত করেছেন তা আমাদের দেশেও সার্থকভাবে প্রযোজ্য। পর্যায়গুলি যথাক্রমে :

ক. সৃজনধর্মী জাদু : এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে শিকার, জমির উর্বরতা, বৃক্ষরোপণ, ফসলসংগ্রহ, বৃষ্টি আনয়ন, মৎস্যশিকার, নৌকানির্মাণ ও চালান, প্রেম-প্রীতি সংঘটন ইত্যাদি। ব্যক্তি বিশেষের নিজ নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য কিংবা সমগ্র সমাজের জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে গুণিন তথা পুরোহিত প্রয়োগ করেন। সমাজ এই ধরনের জাদুকে

স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে সৃজনাত্মক জাদু প্রেরণাস্বরূপ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ উপাদান হিসেবে গণ্য।

খ. প্রতিরোধক জাদু : বিবিধ বিধি-বিধান প্রসঙ্গে, সম্পত্তি রক্ষা, ভ্রমণ, বাণিজ্য, নিরাপত্তা, শিকার, রোগ-ব্যাধির প্রতিবোধ-প্রকল্পে, বিভিন্ন বিপদ এড়াতে, ঋণ আদায় ইত্যাদি কাজে এই ধরনের জাদু বিশ্বাস প্রচলিত। সমাজ স্বীকৃত এই প্রতিরোধ মূলক জাদুর দ্বারা মানবিক প্রচেষ্টার প্রেরণা হিসেবে ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের শক্তি যোগাতে সক্ষম।

গ. ধ্বংসাত্মক জাদু : রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি, শত্রু নাশক, জীবন নাশক, ঝড় আনয়ন, সম্পত্তি ধ্বংস ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই জাদু-বিশ্বাস প্রয়োগ করা হয়। ধ্বংসাত্মক জাদু 'ডাইনী-বিদ্যা' নামেও অভিহিত। এই ধরনেব বিদ্যার প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। নৈতিক দিক থেকে এ-বিদ্যা নিন্দনীয় হলেও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে এখনও ব্যর্থতা-দুর্ভাগ্য এবং মৃত্যু ইত্যাদির ব্যাখ্যা স্বরূপ এই বিদ্যাকে দায়ী করা হয়। বস্তু জগৎকে ক্ষমতার বলে বশে বা আয়ত্ত রাখতে গিয়ে পৃথিবীর হেন কাজ নেই যা এই বিদ্যার সাহায্যে সংঘটিত করা যায় না।

ধ্বংসাত্মাক জাদু বা ডাইনী-বিদ্যার সাহায্যে মানুষ যথাক্রমে :

ক. অতীন্দ্রিয় শক্তিকে দিয়ে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য অটল ব্রতে নিজেকে ব্রতী রেখেছে। খ. বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক শৃঙ্খলার পরিবর্তে স্বীয় ইচ্ছাধীন এবং স্বরচিত শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ইত্যাদি।

এইসব কারণে সভ্য-সমাজ একে 'যুক্তিসম্মত অবিশ্বাস' 'শয়তানবাদ' 'ঈশ্বরদ্রোহী' 'ধর্মদ্রোহী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করে দূরে রাখতে চেয়েছে। [১৫]

অতঃপর এই জাদুত্রয়ের উদাহরণ নেওয়া যাক :

সৃজনাত্মক জাদু

সৃজনধর্মী জাদু-বিশ্বাসের মধ্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার স্থানও বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। পুরুষ নারীকে অথবা নারী পুরুষকে কামনা করেছে, জয় করার চেষ্টা করেছে। সর্বত্রই যে সফল হয়েছে তা নয়, তখন অন্যপথ বা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। অন্যপথ বা কৌশল বলতে মন্ত্র-কবচ-ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈপ্সিত অর্জনের চেষ্টা। 'বশীকরণ' এমনই একটি লোকায়ত বিশ্বাস ও জাদু প্রকরণের উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই বিষয়ে নানারকমে রীতি নীতি ক্রিয়ানুষ্ঠান ইত্যাদি প্রচলিত। বশীকরণের একটি মন্ত্র :

সরিষা পড়া :

সৈরষা চল কাঁউরে যাই। কাঁউরে আছে
ছুতোরের বাড়ি। তার খোলাতে সৈরষা ভাজি।
কররে সৈরষা চড়পড়। অমুকের
মন করে ধড়ফড়। কার আজ্ঞা—
কাঁউরের কামাখ্যা মায়ের আজ্ঞা।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞা। [১৬]

তিন গ্রাম শ্বেত সরিষা নিতে হবে। খদির অথবা কুল কাঠের মন্ত্রপূত আগুনে উক্ত সবিষা তিন বাব অভিমন্ত্রিত করে বাঞ্ছিত স্ত্রী বা নারীর নাম বলতে হবে। মন্ত্রপাঠ হলে ফুঁ দিতে হবে--অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন কামরূপ-কামাক্ষা বা হাড়ির ঝি চণ্ডীর নাম স্মরণ করে। এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হবে কৃষ্ণ চতুদর্শীর রাত্রিতে।

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনাবৃষ্টির প্রতিকার কল্পে, কৃষির উর্বরতা বৃদ্ধিতে 'হুকুমদেবে'-র পূজা করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণ রাত্রিতে 'গ্রামের' মেয়েরা মাঠে গিয়ে বসন মুক্ত অবস্থায় নৃত্য-গীত-পূজানুষ্ঠানের দ্বারা বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করে। এইসময় পুরুষেরা ঘরের বাইরে আসতে পারে না। লোকায়ত মানুষের বিশ্বাস যে এর দ্বারা প্রতীকী যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তারই পরিণতি বৃষ্টিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হবে, শস্য হবে অপর্যাপ্ত। প্রসঙ্গক্রমে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া, আঁজলাভরা জল তুলে-তুলে ছিটিয়ে 'নকল বৃষ্টি' করে তারই সঙ্গে নানা মন্ত্রগীতি, অভিচার-উপচার প্রয়োগ ইত্যাদি প্রসঙ্গও উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রতিরোধ মূলক জাদু

প্রতিরোধক জাদু সাধারণত আত্মরক্ষা, বিপদ এড়ান, নিরাপত্তা হেতু 'রক্ষাকবচ' সম্পর্কিত বিশ্বাস। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে–জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বত্রই জাদু-বিশ্বাস জনিত ক্রিয়াচারগুলি প্রতিপালিত হয়।

গড়বন্ধ মন্ত্র :

ঘরবন্ধম দোর বন্ধন আর বন্ধম আকাশ। চার কোন পৃথিবী বন্ধম গিরি কৈলাশ।
ছয় ছাটিকে বন্ধম যউলার জুতি ছয়মাসের পথ। ডান-যোগিনীর পিটি ডাইনির কন্ধে দিয়ে পা
মই বন্দ করি চন্দ্র। যা চন্দ্র মোর সত্য। সূর্য মোর পিতা বসুমতী মোর মা।
এই তিন দেবতা যে রদ করতে পারবে আমার কন্দে করতে পারবে ঘা।
উত্তরে বন্দম উদয় গিরি পর্বত পশ্চিমে বন্দম মলয় গিরি পর্বত।
দক্ষিণে বন্দম গোমতী শিব পুবি বন্দম ভানুর বাম কর।
অমুকার লোহার আগোড় পাথরের কাই। আমি কাজ করি লোহা শনির পায়।
আড়ে দিশি ষোল গজ লয়ে আওঘাত বাওঘাত বড়ো গাছ বন্ধি বরি। কার আজ্ঞা—
নবদুর্গা মা কালীর আজ্ঞা আমার এই গড় বন্ধী-সাতরাত সাতদিন
বাড়ি জুড়ে থাক গা। [১৭]

অশরীরী আত্মা যাতে বাড়ির কাউকে কোনোরকম ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধ মূলক নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। বর্তমান 'গড়বন্ধ' মন্ত্রটি বাড়ি বন্ধের মন্ত্র।

কামাক্ষা পোকার মাটি বা ইঁদুরের মাটি নিয়ে শুদ্ধাচারে, ধান-দূর্বা ও তুলসীপাতা, গঙ্গাজল, সরিষা, তামা-লোহা ইত্যাদি নিয়ে মন্ত্রপূত করে কৃষ্ণা চতুদর্শীর রাত্রিতে সারা বাড়ি তিন থেকে নয় বার প্রদক্ষিণ করতে হবে ও সঙ্গে উক্ত মাটি ছড়াতে হবে।

ধ্বংসাত্মক জাদু

ধ্বংসাত্মক জাদুকে ডাইনী বিদ্যা [Witch craft] বা Destructive magic বা Black art বলা হয়ে থাকে। অশুভ-দ্যোতক কোনো শক্তিকে ভয় কিংবা বিশ্বাস থেকেই আদিম মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ধ্বংসাত্মক জাদুর সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

সমাজে এই জাদু ক্রিয়া তিন রকম ভাবে করা হয়ে থাকে—

ক. আত্মরক্ষার কবচ কুণ্ডল হিসেবে বা অশুভ শক্তির প্রতিরোধ প্রতিকল্পে।

খ. নিজের মঙ্গল বিধানের জন্য।

গ. শত্রুর অমঙ্গল বা ধ্বংস কামনায় অথবা ঈর্ষাপরবশে।

শারীরিক শক্তি দিয়ে যদি শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা না যায় তো মানুষ গুণিনের সহায়তায় ধ্বংসাত্মক জাদুক্রিয়া করেন শত্রুর ক্ষতিসাধনের জন্য। শবদাহ করা বাঁশ [ধচনা বাড়ি] থেকে বাখারি তোলেন গুণিন। তারপর উক্ত বাখারি হতে তীর-ধনুক বানিয়ে নেন। এবার ময়দা গুলে শত্রুর মূর্তি গড়ে আতপ চাল, রক্তজবা দিয়ে মন্ত্র-সিদ্ধ তীর নিক্ষেপ করেন উক্ত মূর্তির বুকে। এরকম করলে শত্রুর সুস্থ শরীর অচিরেই দুর্বল হয়ে পড়বে এমন বিশ্বাস বহুকালের। এই প্রক্রিয়ার নাম 'বাণমারা'। কাউকে ক্ষতি করার বাসনা থাকলে নানাবিধ 'বাণ' মেরে আত্মতৃপ্তি ঘটাতে পারে মানুষ। ধ্বংসাত্মক জাদুর একটি বিশেষ মন্ত্র : 'পার্বণের পিঠে নষ্ট করা।'

আলোধানের কালো পিঠা
তিন গাইনে বাণে আটা।
একটা ধানে দুটো তুষ
পিঠা ওঠে ভুসভুস। [১৮]

যতই আতপ ধানের চাল দিয়ে শুদ্ধাচারে পিঠা তোলা হোক না কেন তা কালো হয়ে যাবে এবং তেলে ছাড়া মাত্রই ভুস্‌ভুস্‌ করে ফুলে উঠে নষ্ট হয়ে যাবে।

উপরের এই মন্ত্রের জন্য কোনো অনুষ্ঠান করতে হয় না। যে বাড়িতে পিঠে তোলা হচ্ছে সেই বাড়ির নাম জানতে পারলেই যথেষ্ট। মন্ত্র বলার সময় পূর্ব দিকে ফিরে সেই বাড়ির মালিকের নাম করতে হবে এবং মনে মনে মন্ত্র পড়তে হবে। এই রকম নানাবিধ ধ্বংসাত্মক জাদু-মন্ত্রের দ্বারা কারুর বা ক্ষেত নষ্ট করা যায়, সুরেলা কণ্ঠের অধিকারীর কণ্ঠে বাণ মারা যায়, ভোজের ভাতে বাণ মেরে পচিয়ে দেওয়া যায়, ফলন্ত ফসল বিনষ্ট করা যায় ইত্যাদি।

আবহমান কাল ধরে লোকায়ত জীবনের স্তরে-স্তরে, ধর্মে, লোকাচারে, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে জাদু-বিশ্বাসের সর্বপ্লাবী ভূমিকা বিজড়িত। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পর্যায়গুলি অতিক্রমণের পথে একে অস্বীকার করা যায়নি। বস্তু এবং ক্রিয়ার পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যতই আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকমের হোক না কেন, সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাজার-হাজার বছরের অলৌকিক শক্তি সংঘটনের বিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ

রূপে মাত্র অনড় থাকেনি—রোগ-ব্যাধিতে, ফসলের অনিশ্চয়তায়, আবহাওয়ার দুর্বোধ্যতায়, গৃহপালিত পশুর মড়কে সাধারণ মানুষ যখন বিপর্যস্ত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে, তখনই ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কার-জাদু বা তার উপাদান তাবিজ-কবচ-মাদুলি, ঝাড়ফুঁক-মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। সেখানে মন্ত্র হয়েছে সঞ্জীবনী সঙ্গীত বা অন্যতম প্রধান একটি উপাদান-উপকরণ। মন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস বা ম্যাজিক বিশ্বাসকে দিয়েছে আরো দ্বিগুণ ক্ষমতা। কেবল মাত্র যাদুশক্তি বা তার প্রয়োগবিধি অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়, মন্ত্র সহযোগে পূর্ণ হয়েছে মানুষের বিশ্বাসের ষোল কলা। লৌকিক মন্ত্রে প্রয়োগবিধির ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তি. এবং দ্রব্যশক্তিকে একীভূত করা হয়েছে। ধারণবিধির প্রসঙ্গে জাদু ও ধর্মের সংমিশ্রণ থাকুক বা না থাকুক দ্রব্যশক্তি—ঐশীশক্তি এবং মানুষের দেহস্থিত শক্তির সমন্বয়ে ধারণবিধির সাফল্য নিহিত। এর সঙ্গে মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসকে অদ্ভুত মনোবল প্রদান করে। কি শাস্ত্রীয় বা ক্লাসিক মন্ত্র, কি লৌকিক মন্ত্র যেকোনো মন্ত্র পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব, সকল মন্ত্রেই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত : ক. মন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস। খ. রোগ-দারিদ্র্য-দুঃখ ইত্যাদি সবই মানুষের মতো জঙ্গম, সচেতন অর্থাৎ জীবন্ত।

একজন মানুষ যা যা করতে পারে এরাও তাই করতে সক্ষম। একজন মানুষকে কোনো বিষয়ে অনুরোধ, আদেশ বা হুকুম করলে তিনি তা পালন করতেও পারেন আবার না বলতেও পারেন। রোগ-দুঃখ-যন্ত্রণা কিংবা এদেরই কারণকেও মন্ত্রের মাধ্যমে অনুরোধ, হুকুম বা আদেশ করা হয়, কিংবা স্থানান্তরে যাবার জন্য বলা হয়। 'হে বিষ তুমি চলে যাও' অথবা 'ওলরে ওল বিষ আমার এই ফুঙ্কে'—এ শুধু আনুগত্য অথবা সম্বোধন নয়, নয় আদেশ কিংবা অনুরোধ, বাধ্য করাও বটে। বাংলা লৌকিক মন্ত্রে এই ধরনের উক্তি বারংবার উচ্চারিত হয়েছে।

মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে এসেছে মন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং সচেতন রোগ-ব্যাধিই সব নয়, সুষ্ঠভাবে মন্ত্র উচ্চারণও অবশ্য জরুরি। মন্ত্রের অধিকারী গুণিন বা ওঝা সকল বিপদহারী আশীর্বচন নিয়ে রোগীকে দেখতে আসেন। রোগীকে তাঁর হাতের ছোঁয়া দিয়ে এবং মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রের অমৃতময় শক্তি দিয়ে রোগীর ব্যাধিকে আকর্ষণ করেন। কাজেই মন্ত্রের উচ্চারণ যথাযথ হলে এবং একই সঙ্গে মন্ত্র-সম্পর্কিত ক্রিয়ানুষ্ঠান সঠিকভাবে প্রতিপালিত হলে মানুষ এক অত্যাশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করতে পারে বলে আদিমতম কাল থেকে বিশ্বাস করে এসেছে। সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবও মানুষের এই চিন্তা-চেতনাকে আরো এক শক্তিশালী মাত্রা সংযোজন করে। পুরাকালেমানুষ মনে করত সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে ইতর প্রাণীদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এদেরই মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছা প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বাস থেকেই উপচার হিসেবে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, পশু-পাখি বলি, তাদের পালক-লোম-রক্ত ইত্যাদি এবং নানাবিধ জিনিস ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। বলি প্রদত্ত পশু-পাখির মুক্ত-আত্মার মাধ্যমে মানুষের কামনা-বাসনা সৃষ্টিকর্তার কাছে পৌঁছবে—এই বিশ্বাস। মন্ত্র তার বাহক রূপে প্রার্থনার সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে। যদিও মন্ত্র প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ-মধ্যস্থ সকল মানুষই ব্যবহার করতেন, কিন্তু কালক্রমে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

তা গোষ্ঠী-প্রধান বা বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের এক্তিয়ারে আসে।

লৌকিক দেব-দেবীর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ বিষয় লক্ষণীয় হলো, মানুষ মন্ত্রের মাধ্যমে কোথাও শক্তি স্বরূপ অমোঘ সত্তাকে তুষ্ট করার জন্য কেবলমাত্র মন্ত্র পাঠ করছে, কখনো বা অনুষ্ঠান-উপচার-উপহার প্রদানে নিয়োজিত। আসলে স্বার্থসিদ্ধির মাত্রা বা ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে সাফল্যের উপর ভিত্তি করেই বিনিয়োগ হয়েছে মন্ত্র। অর্থাৎ মন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। তাই দেখা যাচ্ছে, অশরীরী আত্মাকে অপসারণ করতে বা তার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, ভাগ্য ফেরাতে, সর্প বা বিভিন্ন জীবজন্তু দংশনের বিষ ঝাড়তে, বিচিত্র রোগ ব্যাধির উপশম কল্পে, সন্তান লাভ অথবা শষ্য কামনায়, শত্রুবধে, বশীকরণে বিবিধ-বিধি-বিধানে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ মন্ত্রের উপর নির্ভর করেছে। এই কারণেই প্রার্থনা ও তার মন্ত্রে অবলীলাক্রমে এসে মিছিল করে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবী, পীর-পীরানী, গুরু-গুণিন, ওঝা-পুরোহিত ইত্যাদি। লৌকিক মন্ত্র এমন খুব কম আছে যেখানে একটি কারণে একটি দেবতা বা কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের উপাস্য বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। ভগবান-আল্লা, দুর্গা-কালী, রাম-রহিম, ফকির-গুরু, মনসা, হাড়ির ঝি. আউ... -বাউলিয়া, বনবিবি, শা-জঙ্গলী, খোদা-রসুল, কার্তিক-গণেশ, নারায়ণ, শিব—সব মিলে মিশে একাকার। মন্ত্রের সর্বজনীনতা এখানেই। উদাহরণ স্বরূপ সর্প দংশনের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রের কথা ধরা যাক্ :

লৌকিক বিশ্বাসে সাপের দেবী মনসা। সুতরাং সাপের বিষ ঝাড়াবার জন্য মনসা দেবীর পূজা-অর্চনা দান-ধ্যানই যথেষ্ট হওয়া উচিত সত্ত্বেও দেখা গেছে, মানুষ মাত্র মনসার উপর নির্ভর করতে পারেনি। সাপের মন্ত্রের মধ্যে মনসার ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছার উল্লেখ যাই থাকুক না কেন উক্ত মন্ত্রে একই সঙ্গে মনসার সাথে শিব-দুর্গা, খোদা-রসুল, আল্লা-পয়ম্বর, গঙ্গা-কালী, পীর-গুরু-হাড়ির ঝি, চণ্ডী, কামাক্ষা ইত্যাদিকেও ঠাঁই দেওয়া হয়েছে, স্মরণ নেওয়া হয়েছে কিংবা আজ্ঞা মানা হয়েছে।[১৯] অর্থাৎ লৌকিক স্তরে মানুষ একক ভাবে কাউকেই নির্ভর করতে পারেনি। অথচ কাউকে যে অখুশি বা অমান্য করেছে তা নয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজনে সকলকেই এক পংক্তিতে হাজির করানো হয়েছে। চরিত্র ও শক্তির স্বাতন্ত্রতার পরিবর্তে রূপান্তরিত হয়েছে একক প্রতীকে। এই প্রতীক্যশক্তির ক্ষমতার আহ্বানে প্রীত হয়ে দেবতারা আহ্বানকারীর পক্ষ অবলম্বন করে তার মঙ্গল সাধনে যেমন তৎপর, তেমনি তারই ইচ্ছায় অন্যের সমূহ ক্ষতি করতে তারা নিরুদ্বেগ। এককভাবে কোনো নিরপেক্ষ অতিলৌকিক ব্যক্তিত্ব এমনতর কর্মে যুক্ত হতে পারবেন কি পারবেন না সে-চিন্তার অবকাশ না রেখেই এই ভাবে যুগ-যুগ ধরে মানুষ মানসিক স্বস্তি ও শান্তি লাভ করতে সচেষ্ট হয়েছে। আজও হচ্ছে এবং এইভাবেই মন্ত্র ধর্মে, সংস্কারে, বিশ্বাসে প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় তীব্র জীবনানুভূতির সঙ্গে একান্তভাবে লীন হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র

১. 'The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events as about to have

cestain results This a series and respectful attitude, for matter of fact compeles us to adjust our behaviour to it, whether we have power to alter it or not.'

Karvnath Red, Man and his superstitions, Page-6.

২. সুধাকব চট্টোপাধ্যায়। ধর্ম ও কুসংস্কার। ৫-৬ পৃষ্ঠা, ১৯৭৩.

৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ। ১৯৬৭

৪. Standard Dictionary of the English, A Sanguage : 1974

৫. F.J. Frazer : The Golden Bough। 1957

৬ R. Campbell Thompson Semitic Magic, Page-2, 1908

৭. Maria Leach- Ed. S.D.F.M.L.-Page-660,1949.

৮. Standard Dictionary of the English Language, 1974.

৯. পল্লব সেনগুপ্ত। জাদু বিশ্বাস ও মানুষের সংস্কৃতি। শারদীয়া 'সন্ধিৎসা'—১৯৩০। উক্ত প্রবন্ধে ডঃ সেনগুপ্ত জাদু-বিশ্বাসের শ্রেণী বিভাজন ও তার সংক্ষিপ্ত অথচ সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন। জেম্স্ ফ্রেজারের বিখ্যাত 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থমালা অবলম্বনে বলা যায়, জাদু প্রকরণ দ্বিবিধ—ক. অনুকৃতমূলক বা Sympathetic Homeopathic Magic খ. সংস্পর্শমূলক বা Contagious Magic

আবার ভাবগত দিক থেকেও সমাজ বিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ম্যাজিক তথা জাদুকে দুই ধরনের বলেছেন : শুভকারী বা White art. খ. অশুভকারী বা Black art.

এরা উভয়েই আবার নিম্নের দুই ভাগে বিভাজিত : ক. প্রবর্তনমূলক বা Positive Inspirative Magic খ. বিবর্তনমূলক বা Negative Preventive Magic

১০. F. J. Frazer, The Golden Gough, pg II, 1957.

১১. "I short, magic is a spurious system of Natural Lawas Will as a Fallacious guide concudt, it is a false science as well as an abostive art"– Frazer. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১, ১৯৫৭.

১২. Edward Burnett Tylor. Religion in Primitive Culture, Page 9-12, 1959.

১৩. Tylor, প্রাগুক্ত

১৪. Raymond Firth, Human Taypes, 1958

১৫. Raymond Firth, প্রাগুক্ত অবলম্বনে।

১৬. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

১৭. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

১৮. কেনারাম মণ্ডল। বয়স-৭৫। গ্রাম-মিত্রবাড়ি, ডাকঘর-সাতজালিয়া, থানা-গোসাবা, জেলা-দঃ ২৪ পরগণা। তপসিলী : আসীন তন্তুবায়। শাণ্ডীল্যগোত্র। চতুর্থ শ্রেণী। পেশা কৃষি। মাসিক আয় ২০০। মন্ত্র গ্রহনের শেষ তারিখ : ১৬-২-৮৩।

১৯. ১৯৭-২০৩ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

৩ : ৩ মন্ত্র ও ধর্ম

"তন্ত্রতত্ত্ব"[১] গ্রন্থের 'মন্ত্রতত্ত্ব' অধ্যায়ে মন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রানং-সংসাবব-ধনাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-সামন্ত্রা-মন্ত্র উচ্যতে।।

অর্থাৎ যার মনন হতে বিশ্ব-বিজ্ঞান, বিশ্বময় বিশেষ জ্ঞান ব্রহ্মসত্তা হতে ব্রহ্মাণ্ডসত্তা পৃথক নয়, এই একান্ত অনুভব প্রত্যক্ষ হয়—এই অংশে 'মন', সংসার বন্ধন হতে পরিত্রাণ ঘটে—এই অংশে 'এ' সমষ্টিতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গের আমন্ত্রণ যা হতে হয় তার নাম মন্ত্র। ক. বিশ্বময় ব্রহ্মজ্ঞান, খ. সংসার-বন্ধন পরিত্রাণ, গ. ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। এই তিনটি প্রধান অলৌকিক দায়িত্ব যাতে নিত্যবর্তমান তাই মন্ত্র নামে অভিহিত।

উক্ত অধ্যায়ে আরো বলা হয়েছে—মন্ত্র ভাষা নয়, বাক্য নয়, বর্ণ নয়, অক্ষরও নয়, যা লিখি বা পড়ি তাও নয়, অথচ যা বলি এবং শুনি তারই অন্তশ্চারিণী নিখিল-বর্ণ-নিনাদিনী ধ্বনিরূপিণী নিত্যসিদ্ধপ্রত্যক্ষ-দেবতা। এই দেবতার স্বরূপ দ্বিবিধ ঃ ক. বাচকশক্তি। খ. বাচ্যশক্তি।

সাধকের উপাসনা-ক্রমে বাচকশক্তি জাগ্রত হলে তবেই বাচ্য-শক্তির স্বরূপ প্রকাশ হবে। "অবাঙ্মমসাগোচর" মন্ত্র হলো শব্দ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ও কুলকুণ্ডলিনীরাই[২] (অন্তরাত্মা) স্বরূপবিভূতি ; যা কারুব দ্বারা সৃষ্টি নয়, স্বয়ম্ভু এবং সাধকেব কাছে মাতৃকা বিশেষণে বিশেষিত।

নাদ-ব্রহ্ম, মাতৃকা কিংবা মন্ত্র—'মন্ত্র'কে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন গুরু[৩] ব্যতিরেকে মন্ত্রলাভ সম্ভব নয়। গুরু হতে মন্ত্র, মন্ত্র হতে দেবতা ও দেবকল্প কোনো শক্তি, এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় হইতে দেবানুকূল্য ও অনুরূপ শক্তিলাভ সম্ভব নয়। সে-কারণে গুরু সেবা ও মন্ত্র সেবা উভয়েই সাধকের বা মন্ত্র শিক্ষার্থীর অপরিহার্য বিষয় বলে পরিগণিত। সাধকের সাধনার[৪] প্রভাবেই দেবতার আবির্ভাব ঘটে এবং অভাবে ঘটে তিরোভাব। মন্ত্র বর্ণ বা নাদ বিন্দু[৫] কার্যত স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা মূর্তিভেদে দেবতার স্বরূপকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে। মন্ত্র সাধনা ও সিদ্ধির ফলে জীব তথা সাধক বা মন্ত্রশিষ্য উন্নত স্তরে উঠতে সক্ষম হন, তাঁর ত্রিলোক দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। তখন তাঁর কাছে অলৌকিক-অসম্ভব বলে কিছুই মনে হয় না। সে কারণে মন্ত্রকে 'অঘটন ঘটন' পটিয়সী বলা হয়ে থাকে। মন্ত্রশক্তিতে বলীয়ান সাধক সকল মায়া-মুক্তি বিদ্যা-শাস্ত্র, তপ-যোগ, ভোগ-লোক ও সিদ্ধির অধিকারী হন।

'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থের 'ধ্বনি ও বর্ণ' অধ্যায়ে চক্রবিচারক্রমে মন্ত্রকে যথাক্রমে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. সিদ্ধ : সিদ্ধ মন্ত্র সিদ্ধির জন্য তপস্যা করলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে সাধক সিদ্ধ হবেন। সিদ্ধ মন্ত্র যথা শাস্ত্র জপ দ্বারা সিদ্ধ হয় বলে এই মন্ত্রকে 'বান্ধব-মন্ত্র'ও বলা হয়ে থাকে।

খ. সাধ্য : সাধ্য মন্ত্র অধিক সেবার মাধ্যমে সিদ্ধ হয়। একে 'সেবক মন্ত্র'ও বলা হয়।

গ. সুসিদ্ধ : সুসিদ্ধ মন্ত্র পোষক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এই মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধ হবে কিন্তু সাধকের সাধনা অনুসারে ফল অভিব্যক্ত হবে।

ঘ. অরি : অরি মন্ত্রকে রিপু বা 'ঘাতক' মন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই মন্ত্র সাধকের সর্ব সিদ্ধির মূলচ্ছেদ করতে অতি তৎপর, এবং মূলচ্ছেদ করেও।

অবশ্য পূজা-পাঠ স্তব-হোম ধ্যান-ধারণা সমাধি এবং দীক্ষা[৬] মন্ত্র অবলম্বনে সিদ্ধি ও সাধনার উদ্দেশ্য এক হলেও প্রক্রিয়া বিভিন্ন হতে পারে। দীর্ঘ সাধনায় যা সম্ভব নয়, উৎকট সাধনায় প্রক্রিয়ার প্রভাবে মন্ত্র-শক্তিতে তা এক দিনেও সম্ভব[৭] বলা হয়ে থাকে, দেনা-কাল-পাত্র অনুসারে সাধকের সাধন-শক্তির ফল যাই হোক না কেন মন্ত্র শক্তির অব্যাহত প্রভাব কোথাও বিঘ্নিত হয় না। মন্ত্র সর্বত্র গমনযোগ্য। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সমান অধিকার। সাধনায় সাধকের উদ্দেশ্যে সাধু কিংবা অসাধু যাই হোক, মন্ত্রসাধিত হলে তিনি কার্য সিদ্ধ করতে সচেষ্ট হবেনই। এদিক থেকে মন্ত্রশক্তি অগ্নি-স্থানীয়। মন্ত্রের এই অদ্ভুত অসাধ্য সাধন ক্ষমতা আছে বলেই যুগে যুগে মানুষ এর মোহে আকৃষ্ট হয়েছে, আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

অপরদিকে ধর্ম : শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-ধ্যান-ভক্তি-পূজা-অনুষ্ঠান এসবের দ্বারা ঈশ্বর বা আত্মাকে অনুভব করা। এর অর্থ—যা মানুষের মনকে, তার সমাজকে, সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ স্তরে, মনুষ্যত্বের স্তরে ধারণ করে রাখে, তার নীচে নামতে দেয় না। বরং পরবর্তী উর্ধ্ব স্তরে, দেবত্বের স্তরে উন্নীত করে। পরম সত্যের উপর বিশ্বাস ও অনুভূতিই মানব সমাজকে ধরে রাখতে সক্ষম। ধর্মের মূল কারণ হলো—মানুষের আশা-আকাঙক্ষা, ভয়-বিস্ময়, সাফল্য-অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। F.G. Frazer তাঁর 'The Golden Bough' গ্রন্থের মাধ্যমে বলেছেন—আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল দুধরনের : ক. প্রাত্যহিক পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার অনেকটাই আমরা আন্দাজ করতে পারি এবং তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। খ. এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। অনুমান করা হয়, তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিশ্ববিধাতা বা অনুরূপ কোনো শক্তিমান পুরুষের ইচ্ছায়। এই শক্তিমান পুরুষকেই খুশি করতে পারলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা ঘটবে। দ্বিতীয় এই ধারাকেই কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছ ইন্দ্রজাল ও ধর্ম।

ইন্দ্রজাল এক ধরনের মায়া, কৌশল বা রহস্যময়ী শক্তি যা মানুষের সকল ঘটনা ও কার্যকারণাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আদিমকাল থেকেই জাদুর উপর মানুষের অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে মনে করেছে—এর সাহায্যে মানুষ যা-খুশি করতে পারে। মেলিনোওস্কির মতে জাদু বিরাট একটি সাংগঠনিক শক্তি এবং ফলিত ব্যাপার। এর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিটি কাজ কর্মে শৃঙ্খলা ছন্দ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এনে দেয়। আবার ব্যক্তি বা ব্যষ্টি-মানুষকে প্রতিকূল ও চূড়ান্ত আকস্মিকতার মুহূর্তে দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।

বিপরীত ক্রমে ধর্মের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, স্তব-স্তুতি ও আবেদন-নিবেদন। অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ করে, মুক্ত আবৃত্তি করে, দেবতা বা অনুরূপ কোনো শক্তির আনুকূল্য লাভ।[৮]

অন্যত্র ধর্মের অর্থ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিধৃত। ধর্ম হলো—লোক ধারক পুণ্য। আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্রানুশাসন, সম্প্রদায়বিশেষের শাস্ত্রবিধি, ন্যায়-বিচার-নীতি[৯] সাম্প্রদায়িক উপাসনা পদ্ধতির সংস্কার এবং ঈশ্বর ও পরকাল বিষয়ক মত, সাধনার পথ[১০] ইত্যাদি। গোটা বিষয়ের মধ্যে যে দেব-প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ধর্মের অর্থ পরিস্ফুটিত, সেই দেবতার উদ্ভব animism-এর সোপান পেরিয়ে। দেবতা ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হলো এক পক্ষের প্রার্থনায় অপর পক্ষের অনুগ্রহ। দেবতা অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত সত্তা কিন্তু পারত-পক্ষে সে প্রাকৃত ঘটনার কারণ।

অনুরূপ ভাবে ম্যাজিকের উপজীব্য হলো নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান ও মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে দেবানুগ্রহ ব্যতিরেকে ঘটনাচক্রকে নিজের আয়ত্তে এনে অভিষ্ট পূরণ। ম্যাজিক অলৌকিক-নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়। তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বল প্রয়োগ।

ধর্ম ও জাদু-শক্তির মূলে যে বিশ্বাস লক্ষ্য করি সেই বিশ্বাস যত বিকৃত অথবা দুর্বল হয় ততই শিকড় বিস্তার করে ম্যাজিকের প্রতাপ আবার এর প্রভাবের যুক্তিহীন গোঁড়াড়ির অন্ধবিশ্বাসে মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করলে দেখা দেয় ধর্মের গ্লানি, কু-সংস্কার প্রভৃতি। বিপ্রতীপ ভাবে ধর্ম সম্বন্ধে চেতনা সমৃদ্ধি লাভ করলে জাদু বা কুহকের পরিবর্তে ধর্মই প্রাধান্য পায় সমাজে। কারণ, উভয়ের মূলে যেহেতু পরিচালক ঋত্বিক বা পুরোহিত এবং জাদুকর বা গুণিন একই সেহেতু ধর্ম ও জাদু বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যের সীমা রেখা বড় একটা নেই বললে চলে।

অবশ্য ফ্রেজার তাঁর পূর্ব উক্ত গ্রন্থে বলেছেন ম্যাজিক হলো 'প্রি হিস্ট্রিক্যাল সায়েন্স' বা বিজ্ঞানের জন্মের আগেকার বিজ্ঞান। যদিও তিনি মনে করেন ইন্দ্রজাল বা জাদুই হলো ধর্মের প্রসূতি। ফ্রেজারের মতকে মেনে নিলে ভারতবর্ষের ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাসে তিনটি স্তর দেখতে পাই :

ক. প্রাক-ঐতিহাসিক স্তর : এই স্তরের প্রথম উন্মেষ সম্ভবত আর্য জাতির আদিম বাস ভূমিতে। আমরা ঋক্‌বেদে যে উন্নত ধর্মস্তর দেখি এবং এ-দেশে যদি আর্যদের প্রথম কীর্তি ঋকবেদ হয়, তাহলে এ ধর্মের ম্যাজিক স্তর বা ম্যাজিক ক্রিয়া প্রাক্‌-ঋক যুগে আর্যদের আদিম বাস ভূমিতে পরিণত লাভ করে।

খ. ত্রয়ী বৈদিক স্তর : যথাক্রমে ঋক, সাম ও যজুর্বেদ স্তরে ধর্মের স্থান আগে, ম্যাজিকের স্থান আরোও পরে।

গ. ব্রাহ্মণ-গৃহ্যসূত্র-শ্রোতসূত্রের যুগ : এইস্তরে জাদু-বিশ্বাসের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণ।

কিন্তু অথর্ববেদকে এই ত্রি স্তরের কোথাও রাখা সম্ভব হয়নি। অথচ অথর্ববেদ হলো সেই বেদ যা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সূত্র গ্রন্থাদির পূর্ববর্তী কিন্তু ত্রয়ী বেদ সম্পৃক্ত বর্তমান। এইকারণে কল্পনা করা হয়, অথর্ববেদের মাল মসলা বা উপাদান-উপকরণ এমন এক স্তর থেকে সংগৃহীত যেখানে ম্যাজিক ছিল মুখ্য, গৌণ ছিল ধর্ম।[১১]

মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটা সময় আসে যখন ধর্ম এবং জাদু

অনিবার্যভাবে পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হবার চেষ্টা করে। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু ধর্মেও[১২] ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে। এর ফলশ্রুতিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে চতুর্বেদ ভাগই গেছে দুটি স্বতন্ত্র সংহিতায় · ক ত্রয়ী সংহিতা, খ. আথর্বন সংহিতা।

আর্যদের যাগ-যজ্ঞ সম্বলিত ধর্মের জন্য গড়ে ওঠে ত্রয়ী ; এখানে যে রাষ্ট্রিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, তাতে মনে হয় তখনও আর্য বনাম অনার্যের সংঘর্ষ থিতিয়ে আসেনি। অন্য দিকে ঐন্দ্রজালিক সূত্রগুলি যা যুগ যুগ ধরে সমাজের সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছে তা পৃথক ভাবে সুরক্ষিত হয়েছে আর্থবন সংহিতায়। আর্থবন সংহিতা এমন এক যুগের পরিচয় দেয় যখন আর্য ও অনার্যের সংঘর্ষ মিটে গেছে। পরস্পরের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়েছে এবং উভয়েরই একত্র বসবাস সহজ হয়েছে।

বেদের এই দ্বিধাবিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে বলা চলে—ত্রয়ী সংহিতার যাবতীয় যজ্ঞীয় ধর্মানুষ্ঠান বা cult ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিচ্যুত নয় ; যদিও বৈদিক যজ্ঞের ধরনের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে পৃথক। অবশ্য এক বাস্তব আচরণে অর্থাৎ যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ও জাদুর মধ্যে তীব্রতর কোনো ব্যবধান না থাকার দরুণ কালে ত্রয়ী যাজ্ঞিক-সংহিতা অথর্ববেদকে জাদুবিদ্যার উৎস রূপে মেনে নেয়।

বলা বাহুল্য বৈদিক পূজা পদ্ধতি এবং ধর্মানুষ্ঠান গুলিতে সর্বকালের সর্বপ্রকারের জাদুবিদ্যার আদর্শ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে মনে হয় যে, বৈদিক মানুষও তাঁদের পবিত্রতম অনুষ্ঠানের সমুন্নত ব্যূহভেদ করেই লোকায়ত প্রচলিত মানসিক প্রজ্ঞা [Superstition] ঢুকে পড়েছে। আনুষ্ঠানিক পূজা-পদ্ধতি বা ধর্মানুসরণ প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে ঐন্দ্রজালের ফলাফল নির্ভর করে ইন্দ্রজালিক প্রতিনিধিদের আনুকূল্য লাভ করার ওপর যদি তারা উপকারক হয়, অথবা তাদের বাধা দেওয়ায় বা ব্যাঘাত সৃষ্টি করায়—যদি তারা ক্ষতিকারক হয়। আর অভিষ্ট ফল লাভ করা যায় অনুষ্ঠানাদি ও মন্ত্রতন্ত্রের সহায়তায়। সুতরাং বলা যায়, ধর্মের সঙ্গে মন্ত্রের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মন্ত্রের সোপান বেয়েই নির্মিত হয়েছে ধর্মের চূড়া—বিশেষত, যেহেতু ধর্মের মধ্যে সর্বত্রই দেবতার অস্তিত্বের অভিন্ন সম্পর্ক বর্তমান।

ধর্মের উৎপত্তি যে কারণে বা যেভাবেই হোক না কেন পৃথিবীর সমস্ত দেশে সমস্ত সমাজেই তার বিকাশ সংঘটিত হয়েছে একই ছকে, অর্থাৎ সামাজিক কাঠামোকেই অবলম্বন করে। যখন যেখানে যে অবস্থাতেই সামাজিক কাঠামোগুলি বিন্যস্ত হয়েছে সেখানে ধর্মের ভিতর এবং বাইরের ধারণাগুলি গড়ে তোলা হয়েছে তার সঙ্গেই সঙ্গতি রেখে। ধর্মকে সমাজের প্রকৃত নিয়ামক বলে সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা গোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজেদের স্বার্থেই প্রচার করে এসেছে। বলা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে এমন এক অমোঘ এবং অলঙ্ঘনীয় বিধান, যা-নাকি সমস্ত সমাজ-আয়তনকে পরস্পরের সঙ্গে ধরে রাখে। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের অবিরল প্রচারে ধর্ম চেতনার উপর যতই দৈব মহিমা চাপিয়ে দিক না কেন ধর্মের বিকাশ ঘটেছে মূলত জাদু বিদ্যার প্রতি অন্ধ প্রত্যয় থেকেই, পরবর্তী কালে যা সমাজ শাসকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যও পরিমার্জনা করা হয়েছে।

আসলে আদিম কালে মানুষ স্বভাবতই অজ্ঞ ছিল বলেই সমস্ত সামাজিক বিধানকেই ধর্ম বলে বিশ্বাস করে এসেছে। আদিম শিকারজীবী-সংগ্রহকারী যাযাবর গোষ্ঠী যেদিন থেকেই কৃষি কেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলে, সেদিন থেকেই সমাজের সর্বস্তরে এমনকি জনপদ জীবনেও ধর্ম-ধারার পরিবর্তনটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং তখন থেকেই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম শোষণ পদ্ধতির রূঢ়তাকে ঢাকা দেবার জন্য স্তর ভেদে আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ মাখান হতে থাকে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সর্ব দেশেই ধর্মকে পছন্দমত মূর্তিতে তৈরি করেছে শাসক-শক্তি। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁরাই সামাজিক শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের নাম ও মুক্তির বাণীই কিন্তু এইভাবে উত্তরকালে শোষণের হাতিয়ার রূপেই পরিজ্ঞাত হয়েছে।

যদিও শাস্ত্রীয় ধর্মাচার ও তার আচরণবিধি লোকজীবনের আদি উৎস থেকে উদ্ভূত হলেও, লোকায়ত ধর্মের আচার বিধানের সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য বর্তমান। 'রূপং দেহি জয় দেহি যশো দেহি দ্বিষো দেহি" জাতীয় প্রার্থনা বা স্তুতি শাস্ত্রীয় ধর্মে আদিকালে সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকলেও শ্রেণী সমাজের বিবর্তনে সেটা সীমাবদ্ধ পেতে থেকে উক্ত ধর্মেরই মূল কথা বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদের মাধ্যমেই অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যার দ্বারা। এরই সাহায্যে বৃহত্তর জনসমাজকে বোঝাতে চাওয়া হয় জগতে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, সত্য-মিথ্যা সবই মায়া বা জন্মান্তরের সুকর্ম ও কুকর্মের ফল। এরই পাশাপাশি সাধারণ মানুষ যারা বাঁচবার, সুখী হবার, তৃপ্ত হবার মানসিকতায় উন্মুখ তারা তাঁদের নিজেদের চিরায়ত বিশ্ব-সংস্কার অনুযায়ী গড়ে ওঠে ক্রিয়া-অনুষ্ঠানগুলিকে আঁকড়ে থাকবার চেষ্টা করতে থাকে।

শাস্ত্রীয় অথবা লৌকিক—মন্ত্রকে যেভাবেই ভাগ করা হোক না কেন মানুষের আদিম ধর্মানুভূতির মূলে যে ত্রিশক্তি অর্থাৎ দৈবশক্তি, জাদুশক্তি ও বস্তু বা প্রাণীর অন্তর্লীন শক্তির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন, এবং জীবন সংগ্রামে প্রতিটি মুহূর্তে ভাবী জয়-পরাজয়ের উদ্বেগতায় উক্ত শক্তিকে নানা ভাবে পূজা-প্রার্থনা ও উপচার-বলিদান ইত্যাদি সর্বত্রই মানুষ একটি বিশেষ উপকরণকে অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করেছে, তা হলো মন্ত্র। প্রবাদে আছে—'মন তোর'। অর্থাৎ মন্ত্র মন তথা মনন হতে সৃষ্ট। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জীবনে যাবতীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠানে মন্ত্র ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নয়। মন্ত্র ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলিকে পবিত্রকরণ বা সম্পূর্ণতা দানের কারণ তথা মাধ্যম।

কিন্তু এহ বাহ্য, মানুষই ধর্ম তৈরি করে[১৩], ধর্ম মানুষকে তৈরি করে না। যে মানুষ হয় এখনও নিজেকে খুঁজে পায়নি, কিংবা ইতিমধ্যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম হলো তার আত্ম-চেতনা বা আত্ম-সম্মান। যে সব বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে সেগুলির উদ্ভট প্রতিচ্ছায়া, যে প্রতিচ্ছায়ায় পার্থিব শক্তিগুলি ধারণ করে অতিপ্রাকৃত রূপে।[১৪] মানুষ তার কল্পিত স্বর্গের মধ্যে খুঁজতে চেয়েছিল বিরাট এক অতিমানব সত্তা—যার কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার হদিস মিলবে, পরিবর্তে সেখানে সে নিজেরই প্রতিরূপকেই দেখতে পেয়েছে, তার বেশি কিছুই নয়, তখনই তার 'আফিমের ঘোর' কেটে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে সবই ধোঁকা—যেন 'ক্ষুধিত হারেম' নাটকের

মেহের আলীর কথা 'সব ঝুট হ্যায়'। সুতরাং, মানুষের পার্থিব জিনিস যেমন ধন-মান-সৌভাগ্য-সুস্বাস্থ্য-দীর্ঘ জীবন ইত্যাদি কামনা-প্রার্থনাগুলি যে ধর্ম পূরণ করার চেষ্টা করেছে মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই লৌকিক ধর্মকেই গ্রহণ করেছে।

তথ্যসূত্র

১. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য। তন্ত্রতত্ত্ব। ১৩৮৯

২. কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ দ্বিবিধ। ক. স্থূলমূর্তি, খ. সূক্ষ্মমূর্তি। স্থূলমূর্তি হলো দেবতা ভেদে রূপ ভেদে মন্ত্র বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সাধকের এক মাত্র লক্ষ্য, উপাস্য দেবতা হলো সূক্ষ্মমূর্তি।--আবার মন্ত্র ম্পর্কে বোধ বা চৈতন্য জাগরুক না হলে মন্ত্র সিদ্ধ ঘটে না।

৩. প্রণাম মন্ত্রে গুরু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চারাচরম।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকায়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

যোগ্য শিষ্যকে উদ্ধার এবং অযোগ্যকে যোগ্য করে উদ্ধার গুরুর কার্য। 'নবচক্রতন্ত্রে' আছে :

পিণ্ডংপদং তথা রূপং রূপাতীতং চতুষ্ঠয়ং।
যোবৈ সম্যক বিজানাতি স গুরুঃ পরিকীর্তিতঃ।।

তন্ত্রে গুরু পরমেশ্বরের সঙ্গে তুলনীয়। এখানে পরমেশ্বরের অন্তরঙ্গ মূর্তি গুরুবর্গ ছয় প্রকার : ক. পরমশিব খ. পর বা অপর মন্ত্রেশ্বর গ. রুদ্র, ঘ. দেব. ঙ. মুনি. চ. মনুষ্য। প্রথম জন নিয়োজক বলে দ্বিতীয়জন হবেন তাঁর নিযোজ্য। এই ভাবে ক্রম অনুসারে একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে শেষ অবধি মনুষ্য গুরুতে এসে শেষ হয়েছে। মনুষ্য গুরুই শ্রেষ্ঠ। কারণ, তাঁর সঙ্গে পূর্ববর্তী সকলেই সান্নিধ্য-সম্পৃক্ততা বর্তমান।—তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত : গুরুতত্ত্ব ও সদগুরু রহস্য। গোপীনাথ কবিরাজ। ১৩৭৬।

৪. সাধকের সাধনা বিভিন্ন প্রকার। তার মধ্যে প্রধানতম হলো তিনটি :

ক. ধ্বন্যাত্মক : সাধারণত বুদ্ধির কাজ এবং বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম অনুসন্ধান।

খ. স্থূলে উচ্চারণাত্মক বা সূক্ষ্মে বর্ণাত্মক : সাধারণ প্রাণের কাজ এবং ইহাই প্রাণের অসাধারণ ধর্ম।

গ. করণ-মুদ্রাদি বা ক্রিয়াত্মক ঃ দেহ-ইন্দ্র-বিষয় প্রাণাদির ব্যাপার বলেই দেহের বিশিষ্ট ধর্ম। —তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত। প্রাগুক্ত। ৩২৭ পৃষ্ঠা।

৫. প্রাণী মাত্রেরই হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই স্ফুরিত হচ্ছে প্রাণাত্মক উচ্চারণে একটি অব্যক্ত ধ্বনি—অবিভক্ত ভাবে যাবতীয় বর্ণ যাতে বিদ্যমান। এটাই হলো তন্ত্রের নাদ। নাদের অভিব্যক্তি স্থান দুটি বীজ :

ক. পরমা প্রকৃতি বাচক অর্থাৎ সৃষ্টি বীজ 'স' 'স' : কার।

খ. পরম পুরুষ বাচক অর্থাৎ সংহারক বীজ—'হ' 'হং : কার।

এবং যে প্রাণের চলনে উদ্ভূত হয় বর্ণ প্রভৃতি। সেই প্রাণের চলন দুইপ্রকার :

ক. সুন্দাত্মক ও স্বাভাবিক--বর্ণের উদয় যেখানে।

খ ক্রিয়াত্মক ও প্রযত্নজন্য--মন্ত্রাদির উদয় যেখানে।--নাদ রহস্য অধ্যায়। প্রাগুক্ত।

৬. দীক্ষা বস্তুতঃ আত্ম সংস্কারেরই নামান্তর। যাব দ্বারা জ্ঞান প্রদত্ত হয় ও পাশব-বাসনার বিনাশ হয়-- এই প্রকাব দান ও ক্ষপণ যুক্ত ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। দীক্ষা প্রাপ্তি হতে পূর্ণত্ব লাভ পর্যন্ত অবস্থার ক্রম যথাক্রমে : ক. দীক্ষা খ. পৌরুষ জ্ঞানের ধ্বংস গ. অদ্বয় আগমশাস্ত্রের শ্রবণ বিষয়ে অধিকার প্রাপ্তি ও শ্রবণাদি সাধন। ঘ. বৌদ্ধজ্ঞানের নিবৃত্তি, ঙ. বৌদ্ধ অজ্ঞানের প্রবৃত্তি চ. জীবন্মুক্তি. ছ. ভোগাদি দ্বারা প্রায়দ্ধনাশ জ. দেহ ত্যাগের পর পৌরুষ জ্ঞানের উদয ঝ. পূর্ণতা বা পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্তি।—দীক্ষারহস্য অধ্যায়। প্রাগুক্ত।

৭. তন্ত্রশাস্ত্র মতে মন্ত্রকে 'নাম' বলা হয়েছে। ইষ্টস্মরণ, ইষ্টজপ ইত্যাদি অর্থে মন্ত্র হলো নাম বা নামামৃতম। ভাবসাধনার পথে নাম বা মন্ত্র হতে সদগুরু প্রাপ্তি এবং মন্ত্র সাধনার অধিকার অর্জিত হয়। মন্ত্র সাধনার ফলে বিকাশ ঘটে দৈহিক ভাবশুদ্ধির। অধিকার জন্মে ভজন-সাধন-আরাধনার। সাধনায় আসে সিদ্ধবস্থা এবং পরিশেষে মহাস্থিতি। সেকারণে নামশক্তি বা মন্ত্রশক্তি অনন্ত অচিন্ত্য।—নাদ রহস্যঅধ্যায়। প্রাগুক্ত।

৮. Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol 8, page-311

৯. বঙ্গীয় শব্দকোষ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০. চলন্তিকা। রাজশেখর বসু।

১১. সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। ধর্ম ও কুসংস্কার। পৃঃ—১৩-১৪, ১৯৭৩।

১২. পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুধর্ম বা ভারতীয় ধর্মই তার নিজস্ব অভ্যাসে-আদর্শে তথা পরিবেশে স্বয়ম্ভু। এই ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট একজন প্রবর্তক নেই। অথচ এই ধর্মকে ধারণ ও পরিব্যাখ্যানের জন্য মানুষের অভাব হয়নি কোনোদিন, কোন যুগে। ভারতীয় ধর্ম সাধারণের ধর্ম [peoples religion] রূপে অভিহিত। People বা জনসাধারণের যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে এই ধর্মের মধ্যেও ঠিক তাই। এর এক একটি স্তরকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন সৃষ্টি হয়েছে নূতন-নূতন দার্শনিক ও পথ ; অন্যদিকে তেমনি পুঞ্জীকৃত থেকেছে অসংখ্য সংস্কার বা কুসংস্কার। আসলে পৃথিবীর সব মহান মানুষের আবির্ভাবের পর যে সত্যের সম্মুখীন হতে হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ যুগে যুগে মহামানবের আগমনের ফলে প্রচলিত মত ও পথের ধারা গেছে পাল্টে, কোথাও হয়েছে আলোকিত বা সংস্কৃত, কোথাও আবার প্রবর্তিত হয়েছে নূতনতর কোন মত বা পথ। কিন্তু, যাই হোক না কেন, সর্বত্রই খানিকটা করে তলানি থেকে যায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই—বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেছেন 'ফসিল'। কারণ, এটাও ঠিক সব মহাপুরুষের সব বাণীই মানুষের সর্বস্তরে সমান ভাবে পৌঁছুতে পারে না।

১৩. ধর্ম পুং ক্লী ধৃ + ম (মন) ক—ধর্তা বা ধৃত অর্থাৎ ধারণ কর্তা ইত্যাদি যাই বুঝি না কেন প্রাচীন কালে ধর্ম অর্থে কর্তব্যকর্মরূপে গণ্য হত। হিন্দু শাস্ত্রমতে ধর্ম বা ধর্মন হল নিয়ম শৃঙ্খলা বা সত্য [Truth]। বৈদিক যুগে 'ব্যবহার' অর্থে ধর্ম প্রচলিত থাকায় এবং ধর্ম পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিষয়ে লিখিত আইনকানুন [codifed Law] হওয়ায় ব্যবহার "নীতিশাস্ত্র"কে মেনে চলার দরুণ 'ধর্ম' পদের দ্বারা একাধারে আইন ও ন্যায়-বিচার উভয়কেই প্রকাশ করা হত। বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। আর তৎকালীন যুগে ধর্ম সম্বন্ধীয় সকল জনশ্রুতিই 'স্মৃতি'। সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ—বেদের এই চার স্তরের সঙ্গে ঋক-সাম-যজু-অথর্ব সংশ্লিষ্ট। যথাক্রমে সংহিতা এবং ব্রাহ্মণে অংশ কর্মকাণ্ড রূপে গণ্য। যজ্ঞে

বা যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে এই কর্মকাণ্ডেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও ঐহিকতা অধিক পরিমাণ পরিস্ফুট। অর্থাৎ লোকায়তিক মতাদর্শকে এখানে শাস্ত্রীয় মোড়কে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। অপরদিকে আরণ্যক উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড রূপে বিবেচিত। এখানে পারমার্থিক প্রজ্ঞাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে পারলৌকিক পরিচয়ও মেলে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির যে ধর্মাদর্শ লোক সাধারণের মধ্যে প্রচার কবা হয়--ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ যা পরবর্তীকালে 'শাস্ত্র' বলে বিবেচিত, তার একত্রীকরণ অর্থাৎ ইহলোক ও পবলোক সম মূল্যে মূল্যায়িত। কারণ, যতই স্বর্গ-ঈশ্বর-মোক্ষ-মুক্তি-কর্ম-যল ইত্যাদি প্রচার করা হোক না কেন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন পৃথিবীকে কখনো অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তথাকথিত আর্য ও অনার্যের সমন্বয়ের যুগে তৎকালীন প্রচারিত বিশ্বাস অনুযায়ী বেদ হচ্ছে অলৌকিক [revelation] উপায়ে লব্ধ জ্ঞান সমষ্টি বা ম্যাজিক-প্রজ্ঞা।

মনু বলেছেন—আচারই ধর্ম [মনু সংহিতা—১/১০৭-৮,২/৬-৭]। আচার পুরুষ-পরম্পরা অনুসৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'আচার' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হযেছে যাবতীয় রীতিনীতি, বিধিনিষেধ, কেতা, আদব-কায়দা ইত্যাদি। আচার সামাজিক প্রথা বা custom —কতকগুলি বৈধ আচরণের সমষ্টি যার পিছনে থাকে গোষ্ঠীব সমর্থন। যদিও সামাজিক শ্রেণী ও অর্থনৈতিক স্তর বিশেষে আচারের অদল-বদল অসম্ভব নয়।

লোকায়তিকদের প্রসঙ্গে তথা সমর্থনে প্রাচীন কালের ধর্ম-র ধারক-বাহকগণ বলেছেন—সকল প্রকারে ধর্মচারে মূল হল অর্থ সাধনা। বার্হস্পত্য সূত্রেও এর সমর্থন মেলে। ধন মূলং জগৎ [৬/৭-১১], জগৎ সংসারে ধনই সব। অর্থ-ধর্ম-বিদ্যা-বুদ্ধি-বিক্রম-মিত্র-গুণ সমস্ত কিছু পরিস্ফুটনের কারক। কামন্দকের নীতি শাস্ত্রে এমনকি মহাভারতেও ধর্মের মূলে অর্থ ও বলকে সমর্থন করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে [১২/১৩০/৩৫] বলা হয়েছ কোশমূলঃহি রাজা। কোশ [fance] রাজ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—ধর্মের মূল হলো বল এবং কোশ। অর্থাৎ অর্থই ধর্মের নিয়ন্ত্রক। কিন্তু লৌকিক ধর্মে সামাজিকতার মূল্য মুখ্য হওয়ায় পরমার্থিক রূপে গণ্য হয় না। বিত্ত কৌলিন্যে কেউ উচ্চ হলেও প্রথাগত নিয়মের বৈরীতা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। লোকধর্মে অর্থের গুরুত্বকে যত বড় করে না-দেখা হয় তার চেয়ে ঢের বেশিই প্রাধান্য পায় সমান-সমানাধিকারের বিষয়।

১৪. মার্কস-এঙ্গেলস। ধর্মপ্রসঙ্গে [অনুবাদ]। ১৯৮১।

৩ : ৪ মন্ত্রে যে সুরের ছোঁয়া

আমাদের আদিম প্রপিতামহগণ আহার-সংগ্রহ, আত্মরক্ষা তথা বেঁচে থাকার তাগিদকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন পশু-পাখি, জীব-জন্তুর কণ্ঠস্বব, অঙ্গভঙ্গি, হাঁটা-চলা-লাফানো ইত্যাদি নকল করেছে। এমনকি তাদেরকে প্রলুব্ধ বা বিভ্রান্ত করে হত্যাও করেছে। এই সূত্র ধরেই প্রাথমিক ভাবে মানুষের সংস্কৃতিতে অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পকলার মতো উদ্ভব হয়েছে মন্ত্রের—যার বিবর্তিত রূপ হলো গান। সমাজ-গোষ্ঠীতে বা কোমে যে বা যিনি মন্ত্রচর্চা করেন কিংবা যিনি মন্ত্র বিশারদ রূপে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন, সেই সকল ওঝা-গুণিনকেও গীত-বিদ্যায় নিপুণ গায়ক হিসাবে স্বীকার করা হয়। 'মন্ত্র' এবং 'স্তোত্র'-গানের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র আছে। মন্ত্র 'মায়ামুগ্ধকর ক্ষমতা' সম্পন্ন। মন্ত্র-বিদ্যার অধিকারী ব্যক্তিগণ এই মায়াময় পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে, বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখেন। ইংরাজি 'Charm' শব্দটির ধাতুগত অর্থ 'song' বা 'সঙ্গীত'। আবার 'spell' শব্দের সঙ্গেও 'মন্ত্র' শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'জাদুমন্ত্র' সঙ্গীত পদবাচ্য না হলেও স্তোত্রের মতোই আবৃত্তিযোগ্য এবং বিশেষত পদে সৃষ্টি। একইভাবে 'incantation' যার আক্ষরিক অর্থ 'জাদুবিদ্যা' তার ইংরাজী ধাতুগত অর্থ বাংলায় 'গীত'। সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'স্তোত্র' 'জাদুমন্ত্র' কিংবা 'জাদুবিদ্যা' এই শব্দ ত্রয়ের মধ্যে মারাত্মক কোনো ব্যবধান সৃষ্টি না হলেও : ক. স্তোত্র সাধারণত তাবিজ, কবচ, কোনো গাছের শিকড় বা আংটি ইত্যাদি ধারণের মধ্যে সীমিত, খ. কোনো বস্তু বা দ্রব্য তাবিজ-কবচে ভরবার পূর্বে বিশেষ 'মন্ত্র' গীত হলে তবে তা 'স্তোত্র' এবং 'মন্ত্র' উভয়েরই সম্মিলন হয়। গ. ম্যাজিক বা জাদুতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তুক-তাক বা ক্রিয়া-কৌশলের সমন্বয়। সুতরাং ম্যাজিকের সঙ্গে নানাবিধ যাগ-যোগ, বলি-উৎসর্গ ইত্যাদি যুক্ত হতে পারে।[১]

উদাহরণ নেওয়া যাক :

ক. স্রোত্র : বশীকরণ মন্ত্রের ধূলাপড়া

কোনো স্ত্রী-লোককে বশ করার ইচ্ছা থাকলে তার হেঁটে যাওয়া বাম-পায়ের আঙুলের খোঁজের ধুলো নিয়ে তিন বার মন্ত্র পড়ে উক্ত স্ত্রীলোকের গায়ে দিলে প্রার্থীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে গুণিনেরা মনে করেন।

ধুল্-ধুল্ ধুলের রানী — মন মোহিনী মনোহর শুন মোর বাণী।
হাতেতে তুলিয়া ধূলা নিলাম তিন অঙ্গুলি করে — পড়িলাম যতনে তাহা মহাদেবের বরে।
আমার এই ধূলা পড়া দিলাম অমুকের অঙ্গে — যে জন হেঁটে যায় অতি রঙ্গে-ভঙ্গে।
তাহার মন থেকে এ-ধূলা আনিবে — আমার বশ্যতা সে স্বীকার করিবে।
কার আজ্ঞে কাঁউরের কামুক্ষার আজ্ঞে — হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।[২]

খ. মন্ত্র : সর্প দংশনের গাঁটুলি

গাঁটুলি এক প্রকার রক্ষা কবচ। সাপে কাটলে ক্লিষ্ট রোগীর সারা শরীরে বিষ যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে তার জন্যই গাঁটুলি করা হয় বা ক্ষত স্থানেই আবদ্ধ রাখা

হয়। বিষ ক্ষত মুখেই বেঁধে রাখতে পারলে সর্প-বিদ্যা-বিশারদের পক্ষে চিকিৎসার খুবই সুবিধা হয়। ক. বিষ সারা শরীরের রক্তে বিমিশ্র হতে পারে না। খ. মন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত বিষ ভস্ম করা যায়। গ. প্রয়োজনে চুমুক দিয়ে বিষ টেনে নেওয়া যায়।

'গাঁটুলি' কথাটা গাঁট-কাপড়-বাঁধা ব্যাপার থেকেও আসতে পারে। গাঁট-কোমর [আঞ্চলিক শব্দ]। গাঁটে কাপড় বেঁধে রাখলে যেমন খুলে যাবার সম্ভাবনা কম তেমনি বিষ গাঁটুলি বা বন্ধন করলে রোগীর মৃত্যুভয়, অন্যের ছাড়া বাণে মরা ইত্যাদির ভয় থাকে না। কবচ-তাবিজ-তাগা ভরবার সময় সর্প-চিকিৎসক নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করেন :

শব্দ শুনেছি আমি ওমুক জনে কেটেছে সাপে। ওইশব্দে স্বর্গে দেবগণ আহা আহা করে।
এমন সময় নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করে তাহার। নারদ বলে কি হইয়াছে মহাদেব রাজা
জিজ্ঞাসা করি তোমায়। মহাদেব বলে—নারদ পদ্মযোনি বাঁচিলে পদ্মযোনির জ্বালায়।
পদ্মা কি করিলে? কতকগুলি নাগ রেখে বাকি ছেড়ে দিলে তারে।
পদ্মা বলে লজ্জা দিও না, আমি এই অঞ্চল মুখে দিলাম। এই অঞ্চলে
৬৪ দেবগণ সাক্ষী থাক তুমি। এই গাঁটুলি বান্ধি গির দিলাম আমি।
উপরে না ধায় বিষ নীচে না ওলে। আমার এই গাঁটুলি না খুলি অমনিভাবে থাকবি।
আমার এই গাঁটুলি যদি লঙঘন হয়— চাঁদ সূর্যের মুখে কালি পড়ে শিবের জটা
খস ভূমে নেবে যায়। কার আড্ডা শিব শিব শিব দোহাই তোমার।।[৩]

গ. জাদু : ধাতুরোগের জন্য অষ্টধাতুর জলপড়া বা বাণকাটা :

ঘরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিকানোর পর স্নান সমাপন করে আসেন গুণিন। লোহার ছুরি বা অস্ত্র নিয়ে উক্তস্থানে পূর্বদিকে মুখ করে বসেন। সেখানে পূর্বমুখে রখা হলো অষ্টধাতু মিশ্রিত কাঁসার একঘটি আ-ঘাটা থেকে আনা জল। গুণিন নিকানো মেঝেতে ১২বার দাগ কেটে [দাগটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে কাটা হয়] ১২ বার মন্ত্রপাঠ করে জল অভিমন্ত্রিত করেন। রোগীকে অন্য জল খাওয়ার পূর্বে এই বা পবিত্রিত করা জল খেতে হয়। জল যাতে মাটিতে না পড়ে কিংবা বিড়াল না অতিক্রম করে ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। জলের ঘটি রাখতে হয় কাঠের আসনে।

কারুর যদি ধাতু রোগ হয়, কিংবা কেউ বাণ মারলে গুণিনের অষ্টধাতুর জলপড়া খেলে রোগ নিরাময় হয়ে যায় বলে মানুষের বিশ্বাস।

ধাতু হাতু অমৃত খায়। ঐ নামেতে ধাতুর মরণ হয়।
রক্তধাতু মোহ ধাতু হাজারিয়া পাথারিয়া অষ্টধাতুর জল।
শিবের আজ্ঞায় দুর্গার বর। বিচরেথে বিকার মার।
দুগ্ধমণি দুগ্ধ খায়। ঐ নামেতে তার ধাতুর মরণ হয়।
কোন কোন রীতির কোন কোন নাম। অষ্টধাতুর অষ্ট নাম।
রক্তজবা সহস্র উবাসী উমাদা অঙ্গরিয়া যাগরিয়া যেখানের ধাতু সেইখানে থাক,
অমুকের কণ্ঠের ধাতু আমার এই জলপড়ায় ভস্ম হয়ে যায়।
আতুরে তুতুরে আগুরে মাগুরে আমাকে মিলে আমারে কামারে রক্তে পুঁজে ঝিলে

কামারে রক্তে
এই অষ্টধাতু অমুকের জলপড়ায় করিলাম ক্ষয়।
ঈশ্বর মহাদেবের জটা কেটে পড়ে কালীর পায়।
আমার এই জল পড়ায় অমুকের অষ্টধাতু
আমার এই জলপড়া যদি নড়াচড়া হয়—
কার আজ্ঞে মা কালীর আজ্ঞে
জল হয়ে যাকগে।[৪]

আমরা Charm, spell এবং incantation-কে পৃথক পৃথকভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু লৌকিক মন্ত্রে এরকম বিভাজন সব সময় সম্ভব নয় যদিও বা সম্ভব হয়, তবে তা নিতান্তই বিরল। বর্তমান প্রসঙ্গে যে সমস্ত দ্রব্য-পদার্থ বা ধারণ-ভক্ষণ ইত্যাদির কথা এসেছে তা মন্ত্রেরই আনুষঙ্গিক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন গুণিন। মন্ত্রই চিকিৎসার এক মাত্র উপায় নয়, একটি প্রধান উপকরণ—যেমন বস্তু বা পদার্থ ধারণ, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করা ইত্যাদিও বিশেষ বিশেষ উপকরণ।

চিকিৎসক চিকিৎসা করেন 'স্তোত্র', 'মন্ত্র' বা 'জাদু'-এর সম্মেলনে। দ্রব্য ধারণের মূলে আমাদের মনে সেই আদিম কাল থেকেই একটা লৌকিক ধর্মগত সংস্কার ও বিশ্বাস কাজ করে আসছে, যা থেকে নিজেদের কখনই বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করতে পারিনে। বস্তু বা পর্দাথের অন্তর্লীন শক্তিতে প্রত্যয়-জ্ঞাপনের পশ্চাতে যদি কোনো প্রথাগত দর্শন থেকেও থাকে তবে তা হলো এই। ওঝা-গুণিনের প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে ব্যক্তি বা ব্যষ্টি-মানুষের ধারণা যাই থাকুক না কেন, আমাদের বিশ্বাস বা প্রথার পশ্চাতে দ্রব্যগুণ গুলির কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিমত খুব একটা নেই। তুক-তাক একটি অলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে। রোগী ও অন্যান্য ব্যক্তির মনে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আনায়, ভয় তিরোহিত করে। অবশ্য ওঝা-গুণিনের অভিমত, প্রকৃষ্টরূপে নিয়ম-পালনের কোনো-রকম শৈথিল্য না থাকলে রোগ-ব্যাধি নিরাময়তা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকতে পারে না।

একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, গান বাঙালির এক প্রকার কুল ধর্ম। বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ "চর্যাগীতি" থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে রচিত হয়েছে অসংখ্য গানের ধারা, এবং তা স্বতস্ফূর্তভাবে পরিবেশিত হয়েছে জনসমাজে। charm, spell বা incantation এই শব্দ ত্রয়ের ধাতুগত অর্থ প্রসঙ্গে মন্ত্রকে যে-কারণে 'সঙ্গীত' বলা হয়ে থাকে, সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মতে তা 'বিশুদ্ধ' সঙ্গীত কিনা ভেবে দেখা দরকার। সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন—ক. বৈদিক ধারা খ. লৌকিক ধারা।

কালের বিবর্তনে বৈদিক সঙ্গীত-কলার প্রচলন সমাজে বিলুপ্ত হয়ে এলেও সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মতো লৌকিক সঙ্গীত-কলার প্রচলন কিন্তু সমাজে থেমে থাকেনি। বৈদিক সঙ্গীতের পাশাপাশি বহু পূর্ব হতে প্রবহমান ছিল। অবশ্য লৌকিক সঙ্গীত ধারাকেও বিভক্ত করা হয়েছে, দ্বিবিধ ধারায়—ক. গান্ধর্ব বা মার্গসঙ্গীত, খ. দেশি সঙ্গীত।

গান্ধর্ব সঙ্গীত বা মার্গ সঙ্গীত বৈদিক গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং পবিত্র ও শ্রদ্ধার যোগ্য বলে বিবেচিত। খ্রীঃ ৫ম-৭ম শতাব্দীর মধ্যে এই শাখারও বিলুপ্তি ঘটলে দেশি সঙ্গীত কলার চর্চা ও অনুশীলন সমাজের সর্বস্তরে চলতে থাকে। আবার এই দেশী সঙ্গীত কলাকেও যথাক্রমে দুইভাবে ভাগ করেছেন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ—ক. মাগরীতি আশ্রয়ী দশ লক্ষণ যুক্ত

ও নিয়ম সম্মত আভিচারিক গান, খ. দেশি বা লোকসঙ্গীত, অর্থাৎ নিয়মানুগত্যহীন লৌকিক গ্রাম্য গান।[৫]
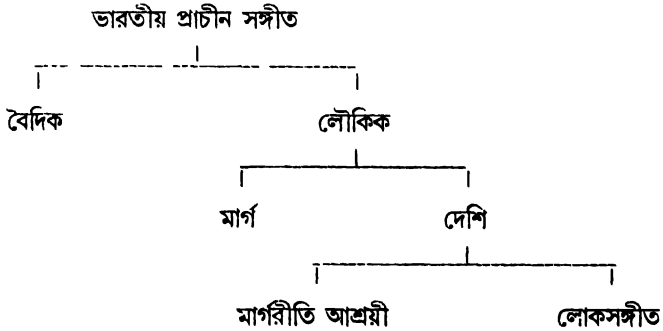
গঠনগত বিন্যাসের দিক থেকে ধ্রুববাদী সঙ্গীতে যে চার কলি থাকে গায়কের ভাষায় যা 'ত্বক' নামে পরিচিত। অস্থায়ী-অন্তরা-সঞ্চারী-আভোগ—যাবতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত নাহলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনুরূপ ভাবে একটি গান সম্পূর্ণ হতে গেলে যে উপাদান সমূহ অর্থাৎ ক. কথা, খ. সুর, গ. তাল-ছন্দ, ঘ. নৃত্যকলা বা অঙ্গভঙ্গিমা, ঙ. বাদ্য যন্ত্র ইত্যাদির প্রয়োজন সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। যদি রীতির প্রশ্ন আসে তো বলতেই হয় লৌকিক গীতি-সাহিত্যের রীতি তিন রকম—ক. আখ্যান রীতি, খ. গীতি রীতি, গ. বাচনীয় বা পাঠ রীতি।

আখ্যান রীতির গান প্রায়শ দীর্ঘ ও কাহিনী সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। গীতি রীতির বিষয় গুলিই কেবল মাত্র গাওয়া হয়, এবং কিছু কিছু কাব্য কবিতা আছে তার সঙ্গে রাগ-তাল সংযুক্ত থাকলেও সাধারণত এগুলির পাঠেরই জন্য রচিত।

বাংলা লৌকিক মন্ত্র-সাহিত্যকেও এই ত্রিবিধ পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। যদিও মন্ত্র সমূহ পরিবেশিত হয় নিম্নলিখিত ভাবে—ক. উচ্চ স্বরে, খ. নিম্ন স্বরে বা গুণগুণানি স্বরে, গ. মনে মনে অর্থাৎ ঠোঁঠ নেড়ে নেড়ে অনুক্ত স্বরে, ঘ. এই তিনটির সম্মেলনে, অথবা দুইটির সহযোগে। এক্ষণে মন্ত্রের ত্রিবিধ পর্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

ক. আখ্যান রীতি : সাপে কাটা মন্ত্র : রহিসচন্দ্রের পুষ্পচয়ণ :

স্নান করি-ডালাধরি রহিসচন্দ্র রায়। পুষ্প তুলিবারে শিশু যাত্রা করি যায়।।
খনেক দাঁড়ায় রহিস খনেক দৌড়ায় খনেতে ফিরে চায়। খনেক কাতর খনেক ফাঁপড় খনেক হাস্যমুখ।
খনেক রঙ্গ খনেক ভঙ্গ খনেক পায় দুঃখ।।
পুষ্পবনে যায় শিশু নাহি চলে পা। মুখশুকায়ে বুক কাঁপে শিকরাইল গা।।
প্রাণ করে ধড়ফড় স্থির হইতে নারে। জলভাঙ্গি ফুলতুলি সভয় অন্তরে।।
জাঁতি তুলি ফুল বক আর বকুল। উর থেকে গন্ধরাজ চাঁপা পারুল।।
ভূমিচম্পা স্বর্ণচিতে মাধব টগর। জানকন্যে বাণী পদ্ম কেশর কেশরী।
কৃষ্ণকলি হংসরাজ সভায় ছিল যত। নানা মতে শত-শত পুষ্প তোলে কত।।

দৈব নিবন্ধ সেথা দারুণ বিধাতা। ব্রহ্মশাপে রহিস দাশ হইল সর্পাঘাতা।।
বুকেতে কামড় মারে দারুণ ফণি। ঘর্ম ছোটে ধরণী লোটে পড়িল ধরণী।।
দারুণ বিষের জ্বালায় দেহ জ্বলে যায়। গড়াগড়ি খায় শিশু বিষের জ্বালায়।
বাম হস্তে ফুলের ডালা ডান হস্তে বুকি। মা বলি ঘুমায় শিশু রক্ত ওঠে মুখি।।

আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর। শিবপূজা না হইল কুপিত ব্রাহ্মণ।
উত্তর দে উত্তর দে শৈব্য তোর পুত্র কোথা গেল। শিবপূজা না হইল সময় বয়ে গেল।।
না ফিরে আইল শিশু না আনিল ফুল। এইবার রাজ ভিখারিনী তোর বিধি হইল

শৈব্যা বলে ওগো ঠাকুর স্থির হও তুমি। না দিও গাল ফুল তুলে দিব আমি।।

আস্তে আস্তে ব্যাকুল হয়ে সভয়ে বামসী চলে। শিশু অন্বেষণে যায় রানী তুল তুলিবার ছলে।।

পথে যেতে যেতে দেখে নানা অমঙ্গল। বামেতে সর্প দেখে দক্ষিণে শৃগাল।।
উল্কাপাত বজ্রপাত সকল আঁধার। অকালে পাকে বৃক্ষফল উজানে বয় জল।।

বামচক্ষু তিন্য করে প্রাণ ওঠে কেঁদে। নয়নের জলে রানীর বুকভাসে হায়।।
কাতর বিকল রানী চারিদিকে চায়। হা-পুত্র কোথায় গেলি ত্যজি করি আমায়।।

পুষ্পবনে গিযা দেখে পড়িয়া ধূলায়। পুত্রপুত্র বলে রানী উচ্চরবে ডাকে।।
উত্তর না দিল শিশু পাশ না ফেরে। মুখ হয়েছে কৃষ্ণবরণ বিবর্ণ শরীরে।।
পুত্র কোলে করে রানী গাছে হানে শির। এতদিনে দুখিনীর শূন্য হইল কোল।।

কেন বিধাতা হরে নিল তোর মা বোল।

তারে মন্দ করিলাম কারে দিলাম গালি। পুত্র শোকে অভাগিনীর তনু হইল কালি।।
রাজার মহিষী হয়ে পরের দাসী হলেম। দুঃখী ধন পুত্র তাও হারা হলেম।।
মা বলিতে কেহ মোর নেই বড় মনস্তাপ। মরাপুত্র লয়ে কোলে অনলে দিব ঝাঁপ।।
মরাপুত্র কোলে নদের কূলে কান্দে উভরায়। ঘাটের ঘাটোয়ারী হাঁকে জমার কড়ি চায়।।
আহা প্রভু হরিশচন্দ্র কোথায় রহিলেন, তোমার রোহিণী কোলে করি কান্দি অভাগিনী।।

শুনে সে দারুণ কথা প্রাণ ফেটে যায়। পুত্র পুত্রবলে রাজা গড়াগড়ি যায়।
পুত্রসঙ্গে মা-বাবা মরিতে চায়। সাজায় চিতে বেড়ে অগ্নি দিল দুই জন।
দুড় দুড় করে অগ্নি উড়িল গগন।। ধরে মায়া অগ্নিবেড়ে—না মরিবে পুত্র তোর হইল দৈববাণী।।

ধর্ম হইল বিরাজমানী, অমৃত নয়নে চান নির্বিষ হইল জীবন।।
জীবন পাইল চক্ষু মেলি চাইল পদ্ম হস্ত বুলাইল গায়। হাড়মাস রক্ত হতে বিষ ঘা মুখেতে আয়।।
ঘা মুখেতে আসতে বিষ যদি করিস রা। ধর্মের আজ্ঞায় বিষ অমুকের অঙ্গে ভস্ম হয়ে যায়।
নেই বিষ নেই বিষ নেই বিষ মা মনসার আজ্ঞায়। নেই বিষ আস্তিকমুনি বিষহরির আজ্ঞায়।।[৬]

মন্ত্র পাঠ করার সময় গুণিন রোগীর মাথার দিক থেকে নিম ডাল টেনে পায়ের দিকে আনেন।

খ. গীতি রীতি : বন্দনামন্ত্র : সর্পাঘাত

ওমা ধর্মযোগ আবাহনী (ধুয়া) ৩৩ কোটি দেবগণ
ভাসুকাতে সবার গমন গো। জয় মা জয় মন্ত্রকারিণী গো।।

এ গঙ্গায় বান্ধিব ঘর-বাড়ি দেবগণ করিবেন ভোজন গো।
জয়-মা জয় মন্ত্রকারিণী আপনি গো।।

সাগর সঙ্গমে গয়া-গঙ্গা আছে গো মন্ত্র স্মরণে বিষ পানি গো।
জয় মা জয় মন্ত্রকারিণী আপনি গো।।

ধর্মযোগ নির্বক্তিয়া দেবগণ গেল চলিয়া
সবাকার আনন্দিত মন। অনাথ বান্ধব হরি
লক্ষ্মীনারায়ণ নাম ধরি লক্ষ্মী যারে সেবেন চরণ।।
জয় মন্ত্র কারিণী আপনি গো মন্ত্র স্মরণে বিষ হইল পানি গো।।[৭]

—বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী এই মন্ত্রটিকে "স্মরণমন্ত্র"ও বলেন গুণিনেরা।

গ. পাঠরীতি : কর্ণমূল শান্নিপাত ঝাড়ন :

ওগো মা হাড়ির ঝি। অমুকির কর্ণমূল কান্নিপাত ঝাড়াইয়ে করি পানি। কোন কোন শান্নিপাত
মিন-মিনে ঝিন-ঝিনে নামাবো পরিপাটি। কালা কালিকা শান্নিপাত ঝাড়িয়ে করিপানি। হাত
শান্নিপাত বাত শান্নিপাত মাথা ব্যথা উর্ধ্ব শ্লেষ্মা শান্নিপাত। গোপনে ফোপানে শান্নিপাত
পচা কফ্ কুরুপ সান্নিপাত ঝাড়িয়ে করি পানি। মা মা রাগে কনকনি টনটনি শান্নিপাত। ঝিকুরে
মিকুরে ঝাঁঝারো খুড়িয়া ঘুড়ি শান্নিপাত খ্যাপা শান্নিপাত ফুঁপো শান্নিপাত ঘোড়া শান্নিপাত

ঘুড়ি শান্নিপাত। শিগ্রি করে ছাড় বেদ শিগ্রি করে ছাড়। নয় তোর মারিব ঝাঁটার বাড়ি। হুকুম
আল্লার হই লঙ্কার বেদ তুই আইলঙ্কায় পড়। বাই দুষ্টু কফ দুষ্ট আর উল্লু বাণ। মাথা নোটন
শিরে নোটন ধনুকে দিল চড়া। মানিক জিঙ্গীর পীর বারোটা হারের মালা করেছ সঞ্জয়। গিরি
সমুদ্র মন্থনে ভাঙ্গে তালের আটি। সেই সমুদ্দুরে পড়ে গেল সাগরের কাটি। অমুকের কর্ণমূল
শান্নিপাত ঝাড়ায়ে করি পানি। দোস্ত নবী কিম্বা ডাকে ভাবে মনে মন। চার ঘাটের রাজা
তোরে করলেন দরশন। কালী ঘাটের কালী মাগো আর বাইশপীর। যাহার চক্রবানে
কেটে করিব চৌচির। মর শান্নিপাত টেনে নে মর ঝাড়নে মর। ফুকারে ফুকরে শান্নিপাত
ফুকেতে মর। কার আজ্ঞে—মা কালীর আজ্ঞে শিঘ্রকরি অমুকের কর্ণমূল শান্নিপাত ভাস্ম

হযে যা শিঘ্র শিঘ্র শিঘ্র। ফুঁ।।[৮]

এই মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় দুরকম পদ্ধতি অবলম্বন করেন গুণিন। ক. ঢাকাই হেন্না দিয়ে ঝাড়ন। খ. জটিল রোগ ঝাড়াবার সময় যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা এইরকম : কাঁচকলার আগুটপাতা, সরিষার তৈল, তুলা, শিসাকন্দের শেকড়, প্রদীপ ইত্যাদি। শিশাকন্দের শিকড়ে তুলা জড়িয়ে, সরিষার তেলে চুবিয়ে প্রদীপে ধরতে হবে। তারপর কলার পাতা রোগীর শরীরের ওপর রেখে উক্ত গরম পলতে ছুপে ধরে শেঁক দিতে হবে এবং মন্ত্র পড়তে হবে।

এ-জাতীয় মন্ত্র পাঠ করার সময় গুণিন হাত তালি দিয়ে মন্ত্রের তাল রক্ষা করেন, শরীর দোলান, কখনো বা নানাবিধ বাদ্য বাজান।

উপরি-উক্ত যথাক্রমে আখ্যান রীতি, গীতি রীতি এবং পাঠ রীতির মন্ত্র ব্যতিরেকেও আরেক প্রকারের মন্ত্র আছে যা অনুক্তভাবে প্রয়োগ করেন মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন। এই মন্ত্র গুণিন কিভাবে প্রয়োগ করেন তা একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারেন না। দেখা যাবে, গুণিন দ্রুত ঠোঁট নাড়ছেন, মধ্যে মধ্যে 'ফুঁ' দিচ্ছেন এবং আনুষঙ্গিকক্রিয়াদি করছেন। উদাহরণ :

ক. পীরের জলপড়া : সর্বারোগের জন্য :

শিবদুর্গা শিবদুর্গা শ্রী নিত্যানন্দ অচৈতন্য মহাপ্রভু
গুরু তুমি শক্তি অমুকের আপদ কর শান্তি। মা
অন্দতন্দ সতীমা প্রভু জগদ্বেশ্বরী। মাকে স্মরি মা
সতীমা গুরু তুমি। তিন সত্যি অমুকের আপদ
কর শান্তি। মাগো মা শিবদুর্গা শিবদুর্গা শ্রী

নিত্যানন্দ অচৈতন্য মহাপ্রভু গুরুতুমি শক্তি। অমুকের
আপদ কর শান্তি। আনন্দচন্দ্র মহাপ্রভু গুরু তুমি
শক্তি অমুকের আপদ কর শান্তি। মা সতীমা
জগদ্বেশ্বরী মা পরমেশ্বরী। মা মাকে
স্মরি মা মা গো মা। বাবার নামের কলঙ্ক কর
না। গুরু তুমি শক্তি তুমি অমুকের আপদ কর শান্তি (৩ বার)।।[৯]

পীরের কাছে শেখা গুণিনের এই মন্ত্রপড়া জল সকল-রকম আপদ-বালাই নিরাময় হয় বলে লোকসমাজে প্রচলিত। গুণিন শুদ্ধাচারে, স্নান সেরে এই মন্ত্র পাঠ করেন। পবিত্রিত এই জল মাটিতে পড়া নিষেধ। এই মন্ত্রে সরাসরি 'দোহাই' দেওয়া হয়নি। তবে 'তুমি গুরু', 'তুমি শক্তি', 'বাবার নামে' ইত্যাদি প্রসঙ্গেই দোহাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আলোচিত "পীরের জলপড়া" মন্ত্রে একটা বিশেষ বিষয় লক্ষণীয়—মন্ত্রের শিরোনাম পীরের জলপড়া হলেও কোথাও পীর-পীরানী বা আলী-আল্লাহ প্রসঙ্গ নেই। লৌকিক মন্ত্রে এও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ জ্বালান মন্ত্র : ভূতের দপে :

কালীঘাটে কালী আছে মা গো তোমার রক্তে উত্তপত্তি তোমার সেই-সেইরক্ত তুমি খাও
কালীর চরণে চলে দৈত্যগণ মারি গণ্ডা ভাগে ভূত ভাগে দৈত্য ভাগে দানব ভাগে
পেতনী ভাগে জলকুমারী ভাগে পৈরী ভাগে। পেঁচা ভাগে পেঁচী ভাগে আর ভাগে রাগ
জলের কামট কুম্ভির ভাগে বনের ভাগে বাঘ অমুকির স্কন্ধে যে করি বে ঘা
মা কালীর নামে তার জ্বলে যাবে গা। কার আজ্ঞে মা কালীর আজ্ঞে।।[১০]

বর্তমান জ্বালান মন্ত্রটি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন গুণিন বা মন্ত্র চিকিৎসক। ছোট ছোট কোলের ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ-হঠাৎ দুধ তুললে বলা হয় 'বাতাসে পেয়েছে' বা 'উপসর্গ' ভর করেছে। বাচ্চার তখন গা-গরম হয় ও বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়।

বাতাস লাগা বা উপসর্গ ভর করাকে গ্রামীণ দৃষ্টিতে ভূতে পাওয়া বলা হয়। ভূতেরও নানান রকম ভেদ আছে—কম জোরী ভূত, প্রতাপশালী ভূত। কম জোরী ভূত হলো সাধারণ মানুষের মৃত-আত্মা, আর প্রতাপশালী ভূতেরা হলো গুণিন-ব্রাহ্মণ চণ্ডাল-কাপালিক ইত্যাদি মানুষের প্রেতাত্মা। বর্তমান প্রসঙ্গ কম জোরী ভূতের। এদেরকে তাড়াতে হলে নিম জল দিয়ে ঝাড়নো হয়। নিরাময় না হলে গুণিন জ্বালান মন্ত্র প্রয়োগ করেন। জ্বালান মন্ত্রের সাহায্যে রোগ সৃষ্টিকারীকে বিতাড়িত করে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়।

গ. কচা (মচকা ব্যথা) ঝাড়ান :

কচারে কচকচীরে ভাঙ্গা হাড় জোড়া দে রে ওরে কচ জানিনে রামের অনলেতে রামের
দোল তেল পড়ে শিঘ্র করে যা কচ ছেড়ে ওল বিচি দল চিচি আদিল বিবি
মা কালীঘাটের কালী যশেশ্বরী আমার এই চৌরিদ্দি যে দিবে পা ওমা জ্বলে যাবে
এছরি মিছরি গা কার আজ্ঞে মাকালীর আজ্ঞে অমুকের কণ্ঠের কচা শিঘ্র ভাল হয়ে
দূরে চলে যাকগে।।[১১]

মচকা ব্যথা ঝাড়নো হয় দুইরকম পদ্ধতিতে—ক. শাবল পোড়া খ. নুন-তেল মালিশ। অবশ্য নুন আর সরিষার তেল উভয় পদ্ধতিরই প্রধান উপকরণ। মিহি লবণ ও সরিষার তৈল গরম করে মচকা লাগা স্থানে মালিশ করতে করতে মন্ত্র পড়েন গুণিন। শাবল পোড়া অর্থাৎ শাবলের এক মাথা পুড়িয়ে টুকটুকে লাল করা হয়। গুণিন হাতের তালুতে নুন তেল মেখে উক্ত শাবলের আগুন ছেনে নিয়ে মচকা মালিশ করেন ও মন্ত্র পড়েন।

মন্ত্র পাঠ বা বিনিয়োগ করার সময় গুণিন যেমন কিছু মন্ত্র উচ্চ স্বরে, কিছু মন্ত্র গুণগুণ করে, তেমনি কিছু মন্ত্র কেবল ঠোঁটটুকু মাত্র নেড়ে বা অনুক্ত স্বরে অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এই ধ্বনি ক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণের উপর মন্ত্রের কার্যকরী ক্ষমতা নির্ভর করে বলে গুণিনেরা মনে করেন। তাছাড়া রোগ ভেদেও মন্ত্রের ব্যবহার বিভিন্ন হয়ে থাকে। সে সকল মন্ত্র সরবে কিংবা গুণাগুণানি স্বরে পাঠ করা হয়, স্বভাবতই তা সুরে গেয়। মন্ত্র বিনিয়োগ করার সময় কান পাতলে স্পষ্ট হবে যে 'আয়-আয়', 'আরে', 'এই', 'আহা', ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় মূলক শব্দ টেনে টেনে উচ্চারণ করেন একটি শব্দ থেকে আরেকটি শব্দ বা একটি কলি থেকে পরবর্তী আর একটি কলিতে গমনের জন্য। এই ধরনের শব্দ [word] ও ধ্বনি মন্ত্রের একটি শব্দের সঙ্গে পরবর্তী শব্দ কিংবা একটি পংক্তি থেকে পরবর্তী পংক্তিতে গমন অথবা একটি মন্ত্র থেকে আরেকটি মন্ত্রে গমনের সংযোজক সেতু রচনা করে যা গুণিনেব একান্তভাবে কাম্য—মন্ত্র বিনিয়োগের বিধি-বিধানের কারণে।

চার্লস ডারউইনের থিওরির উপরে ভিত্তি করে সি.এম. রাওরা তাঁর 'প্রিমিটিভ সঙ'[১২] গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন আদিম মানুষ শিকার-সংগ্রহ আত্মরক্ষা বা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপনের তাগিদে পশু-পাখির স্বর নকল করে প্রাথমিক ভাবে মন্ত্র তথা গানের জন্ম দিয়েছে—একথা ইতিপূর্বে জেনেছি। পরবর্তী স্তরে জীবিকার সন্ধান তথা জীবনযাত্রা যত পরিবর্তিত হতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর ও সুরের তত গোত্রান্তর ঘটতে থাকে। জীবনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষের শৈশব কাল আর মানব সভ্যতার শৈশব কাল এই উভয়ের মধ্যে গানের বা সুরের একটি বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সুরে আবৃত্তি করা বা গেয় ছিল প্রত্ন-নব্য-আর্যভাষার সাহিত্যিক রচনা। গদ্য ছাঁদেও তখন গান রচিত হয়েছে, মন্ত্রও। আসলে কাব্য-কবিতায় গানের সুরের অনুবর্তনই প্রকাশ করে আদিম মনের লক্ষণ। গান ভাব প্রকাশের মাধ্যমও বটে। আমাদের প্রথম সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করেছে শ্লোক তথা সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দেশের ইতিহাসবেত্তারা স্বীকার করেছেন ধর্মকে আশ্রয় করেই উদ্ভূত হয়েছে ভাষা ও সাহিত্যের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গেও এই একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা ভাষা যখন সদ্য জাত, তার রূপ যখন অপরিণত তখন বাঙালি কবি-পণ্ডিতগণ সংস্কৃত লেখা অবলম্বন করে সাহিত্য চর্চায় প্রয়াসী হতেন। অবশ্য যাঁরা তেমন লেখাপড়া জানতেন না বা অভিজাত সমাজের কৌলীন্য থেকে বঞ্চিত তাঁরা জনগণের বোধগম্য ভাষাতেই গান-গল্প-ছড়া ইত্যাদি রচনা করতেন। এই সূত্র ধরেই বৌদ্ধ ও শৈব্য সিদ্ধাচার্যদের দ্বারা বাংলাভাষা-সাহিত্য প্রথম অনুশীলিত হয়। 'চর্যাগীতি' এই উদ্ভূয়মান বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন।

'চর্যা' কথাটি একটি বিশেষ ধরনের গানের অভিধা হিসেবে ব্যবহৃত হয়—অন্যান্য আরো যা কিছু এর অর্থ থাকুক না কেন, অন্তত তার পাশাপাশি বসার সূত্রে তো বটেই। আমাদের আলোচ্য বাংলা লৌকিক মন্ত্রের প্রহেলিকা-ঠাট-উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক ইত্যাদি এই চর্যাগীতির সঙ্গে তুলনীয়। চর্যাগীতির মতো অধিকাংশ বাংলা মন্ত্র গেয়—সব মন্ত্র নয়। আমরা যে অর্থে মন্ত্রকে 'মন্ত্র' বলছি 'চর্যাগীতি' সে অর্থ মন্ত্র নয়। চর্যার সিদ্ধাচার্যগণ মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি খুব একটা আস্থা জ্ঞাপন করেন নি। ৩৪ সংখ্যক গানে দ্বারিক দা বলেছেন :

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্ত্রে কিন্তোরে বানবখানে।
অপইঠান মহা সুহলীলেঁ দুলক্‌খ পরম নির্বাণে।।

অর্থাৎ মন্ত্রেতন্ত্রে ধ্যানে শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোনো লাভ নেই, মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠিত না হলে দুর্লঙ্ঘ্য পরম নির্বাণ লাভ হয় না। যাই হোক, চর্যাগীত ও অন্যান্য সঙ্গীতের মতো মন্ত্রে পদকর্তা বা সঙ্গীত রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না ; যদিও কিছু কিছু মন্ত্র বিশেষ গুরু বা ওস্তাদের নাম গুণিন-সমাজে প্রচলিত। অধিকাংশ গান ছন্দে রচিত। তার একটি নির্দিষ্ট তাল, মান, লয় ইত্যাদির উল্লেখ থাকে যা মন্ত্রে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। মন্ত্র উচ্চ কণ্ঠে, নিম্ন কণ্ঠে এমনকি অনুক্ত স্বরে পরিবেশিত হয়, কিন্তু অনুক্ত স্বরে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় না। বিশেষ বিশেষ সঙ্গীতে ধ্রুব পদ বা ধুয়া আছে—মন্ত্রে তা নেই। মন্ত্র নিজেই ধুয়ার কাজ করে। অর্থাৎ একটি মন্ত্র একাধিক বার আবৃত্ত হয়। নবম-দশম শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে ধর্ম সংক্রান্ত শ্লোক বা পদগুলি গীত হয়ে আসছে মন্দিরা-মৃদঙ্গ-চামর ইত্যাদি সহযোগে কখনো একাকী, কখনো বা বৃন্দভাবে। মন্ত্রে নৃত্য ও বাদ্যের অবকাশ খুবই কম। যদিও সর্পাঘাত জনিত চিকিৎসার বিশেষ কিছু মন্ত্র বিনিয়োগের সময় ঘণ্টা-ঝাঁঝ, শঙ্খ-উলুধ্বনি করা হয়। চামর-নীম বা ঢাকাই হেন্নার ডাল তো মন্ত্র চিকিৎসার চিকিৎসকদের অন্যতম প্রধান উপাদান। চিকিৎসার সময় বিশেষ করে ভূত ঝাড়াবার সময় কিংবা মঙ্গল বিষয়ক মন্ত্র পরিবেশন করার সময় হাততালি দিয়ে থাকেন, সর্প চিকিৎসার সময় শরীর দোলান। 'মন্ত্র'কে বলা চলে একাকী গায়কের গান। এ-গান গুণিন বা ওঝা একলাই পরিবেশন করেন। রোগী বা অন্যান্য শ্রোতাদের শুনলে চলে, না শুনলেই ক্ষতি নেই। তবে বিশেষ শ্রেণীর মন্ত্র না-শুনবার জন্য পরামর্শ দেন। অবশ্য মন্ত্রের আনুষঙ্গিক আভিচারিক ক্রিয়ানুষ্ঠান পালনের জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন পড়ে। মন্ত্র সমূহ কোনো রাগ বা ছন্দে গীত বা আবৃত্ত, তার উল্লেখ অনুপস্থিত—গানের ক্ষেত্রে যা ভাবাই যায় না। প্রায় সমস্ত গানেরই সুর-তাল-লয়-মাত্রা-ছন্দ ইত্যাদি নির্দেশ থাকে। গায়কগণ তা যথাযথ পালন করার চেষ্টা করেন। মন্ত্র কিংবা সংগীত উভয়ই সাধনা বা চর্চা সাপেক্ষ। যদিও মন্ত্র বিশেষ তিথিতে বিশেষ ক্রিয়াচারের মাধ্যমে জাগাতে হয় বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন মন্ত্রবিদগণ। উভয় বিষয়ে সাধনায় সাধক সিদ্ধিলাভ করলেও মন্ত্র গুরু এবং শিষ্য ব্যাতিরেকে তৃতীয় ব্যক্তি শুনলে বা তিন কান হলে কিংবা ছাগলে শুনলে তার কার্যকরী ভূমিকা বিনষ্ট হয়ে যায় বা মন্ত্রের মৃত্যু ঘটে বলে গুণিনেরা মনে করেন। অনিষ্টকারী অশুভ মন্ত্র শিখলে তা নষ্ট করার জন্য ছাগলের কানে দেওয়া বা ছাগলকে শুনিয়ে দেবার রীতি গুণিন সমাজের মধ্যে প্রচলিত। মন্ত্র চিকিৎসকের কাছে ছাগলের কানই মন্ত্রের প্রধান

শক্র। সে কারণে অশীতৃ বিদ্যা যাতে ছাগলে শুনতে না-পায় গুণিনেরা তার জন্য সজাগ থাকেন। মন্ত্রে ধ্রুবপদ বা ধুয়া না থাকলেও একটি মন্ত্র আবৃত্তি করার সময় অথবা একটি মন্ত্র থেকে অপর আর একটি মন্ত্রে গমনের সময় "দোহাই" আজ্ঞা দেবার কালে গুণিন দীর্ঘ 'ফুঁ' দেন, এমনকি "আয়-আয়", "আরে-আরে" 'এই' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় টেনে টেনে উচ্চারণ করে বা গেয়ে দুটি মন্ত্রের মধ্যবর্তী ফাঁক টুকু শাঁড়াশি বন্ধনের মতো জুড়ে দেন। অঞ্চলগত বা শ্রেণী-সম্প্রদায়গত ভাবে বিশেষ ধরনের কিছু গান পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মধ্যে খানিকটা সীমাবদ্ধ থাকলেও মন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিশেষ এক শ্রেণী লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

গঠনগত দিক থেকে স্বাভাবিক কারণে মনে হবে, ছড়া এবং মন্ত্র একই গোত্রের। অনেক ছড়া মন্ত্র হতে পারে কিন্তু সব মন্ত্রই ছড়া নয়। প্রাথমিক অবস্থায় অধিকাংশ বিষয়ই পদ্যে বা ছন্দ সহকারে রচিত হত। সেকারণে বেশির ভাগ মন্ত্রই ছড়ার আকার প্রাপ্ত হয়েছে। 'Poetic primitive' মানুষের সময় হতে ছড়া চলে আসছে এবং যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর বাহন হয়েছে নতুন নূতন চিন্তা-চেতনা। সৌন্দর্য ও সুর চিরকাল ধরে মানুষের প্রার্থিত। সঙ্গীত গীত হয়—ছড়া আবৃত্তি পদবাচ্য। ছড়ার যে ছন্দ-সৌন্দর্য তাও আদিমতম সৃষ্টি প্রয়াস। ছড়ার মধ্য থেকে ছন্দ-সুর এবং দোলা বের করে নিলে তার অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। তবুও একটু সুক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে মন্ত্রকে ছাড়া বলা কঠিন। ছড়া যদৃচ্ছা সৃষ্ট। অন্তরের সহজ আনন্দই ছড়া-সৃষ্টির মূলাধার। ছড়া অনেক সময় শিশুর সাম্রাজ্য অতিক্রম করে ব্যবহারিক-সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক বোধকেও স্পর্শ করতে পারে। ছড়ার মধ্যকার অনায়াস অসংলগ্নতার সঙ্গে মন্ত্রের মধ্যকার অসংলগ্নতার পার্থক্য তুলনীয় নয়। মন্ত্র নির্দিষ্ট কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট। সে-প্রয়োজনের উদ্দেশ্য হতে পারে মঙ্গল-জনক কিংবা ক্ষতিকারক। মন্ত্রের ভাষার দুর্বোধ্যতা, হেঁয়ালি সবই ছড়ার বিপরীতধর্মী। মন্ত্রের ভাব ও অর্থগত গূঢ়তা জাগতিক-ধর্মের নিয়মে সব সময় ব্যাখ্যা করা যাবে না। ছড়ার মধ্যে যে নির্মল আনন্দ প্রধান উপজীব্য তা মন্ত্রের মধ্যে অনুপস্থিত। ছড়া নিয়ত পরিবর্তনশীল। একই ছড়ার একাধিক স্বতন্ত্র পাঠ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। মন্ত্রে আভ্যন্তরীণ কাঠামো পরিবর্তন-সাধ্য নয়। যদিও বিভিন্ন ভাষাভাষির সংমিশ্রণ ঘটেছে। মন্ত্রের ভাষায় অশ্লীলতার দরুণ মন্ত্র অভিজাত সমাজের শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত। এমন কি মন্ত্র শিশুর ব্যবহারযোগ্য নয়। অধিকন্তু মন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকারী-সংরক্ষক-লেখক বিশেষ শ্রেণী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজে সিদ্ধপুরুষরূপে গণ্য। মন্ত্রের শক্তি সম্পর্কে মানুষ এতই আচ্ছন্ন যে মন্ত্র মুদ্রিত হলে বা তৃতীয় কেউ শুনলে সমূহ বিপদ হবার সম্ভাবনা। মন্ত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায়—গোষ্ঠী-কোমের অসীম শক্তি বিশেষ যার সাহায্যে অনেকেই জীবিকা অর্জন করার প্রয়াস পেয়ে থাকেন।

ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে লৌকিক জীবনে মন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। প্রতীক সৃষ্টির কামনা-বাসনা পরিপূর্তিতে মন্ত্র চর্চার মূল কথা। চাওয়া এবং পাওয়ার উপর ভিত্তি করেই আমাদের জীবনের চিরন্তন ঘাত-প্রতিঘাত। মঙ্গল-কল্যাণ-সাফল্য-ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় কি ব্যক্তি জীবন কি ব্যষ্টি জীবনের হয়ে মানুষের নিরন্তন ছুটে চলা—যাবৎ

জগৎ তাবৎ এই চলা। এর জন্য একজনের হিত করতে অন্যের ক্ষতি করা আদৌ অনভিপ্রেত নয়। বিশেষত মন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ছড়ার এমনতর বিষয় একেবারেই অনুপস্থিত। অধিকাংশ ছড়া দুলে-দুলে সুর করে পরিবেশিত হয়। মন্ত্র পরিবেশন রীতি ছড়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চস্বরে কিংবা নিম্নস্বরে যেভাবেই মন্ত্র পরিবেশিত হোক না কেন তার সুর শুনে মনে হয়েছে এর অন্তর্লীন প্রদেশে তরজাগানের ভাঙানি বা কীর্তনের বহুল প্রচলিত ঠাট এবং বিশেষ করে পাঁচালির গায়ন রীতির সুর বর্তমান। পাঁচালীর সুর বলতে একধরনের sing-song বা টেনে-টেনে আবৃত্তি করা অর্থাৎ পাঠ্য গেয়। অনুমান করা হচ্ছে, আদিম কালের টানা সুরের স্বারিক অভিব্যক্তি পাঁচালির সুরে, আদিবাসী ও আঞ্চলিক সঙ্গীতের সুরে ফল্গু ভাবে প্রবাহিত যা শুনলে মন্ত্রগীতি ও মন্ত্রের সুরকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না আদৌ।

তথ্যসূত্র

১. আশরাফ সিদ্দিকী। লোকসাহিত্য-১। ২৪৭-পৃষ্ঠা। ১৯৭৭। প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানীর অভিমত প্রণিধান যোগ্য :

Incation are multered thrice with magical puffs on the body of the affected person to counteract or avert spirite-possession.

Dr. P. K. Bhowmick. Occultism in frienge Bengali. Page-98, 1978.

২. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৩. ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৪. নরেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

৫. বাসন্তী চৌধুরী। বাংলার বৈষ্ণব সমাজ। সঙ্গীত সাহিত্য, পৃঃ—৪৩-৪৫। ১৯৬৮।

৬. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)। প্রাগুক্ত।

৭. দিব্যচরণ মৃধা। প্রাগুক্ত।

৮. মহাদেব মণ্ডল। প্রাগুক্ত।

৯. ঐ

১০. মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)। প্রাগুক্ত।

১১. নগেন্দ্রনাথ বর্মণ। প্রাগুক্ত।

১২. C. M. Bowra. Primitive song. Pages-241-263, 1962.

চতুর্থ অধ্যায়

৪ : ১ মন্ত্র ও গুণিন

আদিম যুগে মানুষ সম্পূর্ণত ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। তাই তখন প্রকৃতিকে শান্ত অথবা বশ করার আকুতিতে মন্ত্রের প্রধান অবলম্বন ছিল প্রকৃতি। অপরদিকে বর্শার নাগালে শিকার পাবার প্রাগৈতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাটা যখন জীবনে ছিল প্রধান উপজীব্য তখন মন্ত্রের অভীপ্সিত আকাঙক্ষা বা কামনাও হতো সেটাই। কালের বিবর্তনে শিকার করাটা আর জীবিকা অর্জনের মাধ্যম রূপে থাকল না উত্তর কালের প্র-সন্ততিদের কাছে, তারা কৃষির উপর নির্ভর করে যে অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে, এবং তাকে কেন্দ্র করে যে ধর্ম-সংস্কার-বিশ্বাস-আচার-বিধি অনুযায়ী পূজা-পার্বণ-প্রার্থনা-উৎসব ইত্যাদি পালিত হয়েছে, তাতে পূর্ব-পিতামহদের শিকার কেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা ধর্ম-সংস্কার বা আচারের রেণু অনিবার্যভাবে অভিক্ষেপণ হয়েছে। আরও পরবর্তী কালে সমাজ ও অর্থনীতি যখন উন্নত হয়, তখন আবার পূর্ববর্তী উক্ত স্তবেরই প্রত্নরেণু সমকালীন চিন্তা-চেতনার সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়। একথা যেমন আমাদের সকল পূজা-পার্বণ, দেবতা-ধর্মের উৎস প্রসঙ্গে প্রযোজ্য তেমনি বৈদিক 'সূক্ত' থেকে 'ব্রতের মন্তর' অবধি সর্বত্রই একই চক্র-প্রবাহ সক্রিয়।

মানুষের জীবনে সমস্যার শেষ নেই, আশা আকাঙক্ষাও অগুণতি। জীবনেব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমস্ত মুহূর্তকে কেন্দ্র করে মন্ত্র সৃষ্টি হয়েছে, এবং এরই সমপর্যায়ে আনুষঙ্গিক উপাদান-উপচারাদির বিস্তার ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে।

সমাজে যারা বা যিনি মন্ত্র ব্যবহার ও বিনিয়োগ করেন--আগেই জেনেছি তারা বা তিনি একাধারে গুরু, গুণিন ও চিকিৎসক। তিনি মন্ত্র দিয়ে রোগীর রোগ চিকিৎসা করেন। এর জন্য যাগ-যজ্ঞ করেন, জাদুগুণ সম্পন্ন দ্রব্য ও পদার্থ বিনিয়োগ করেন, গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা দেন ইত্যাদি। ফলে ম্যাজিক বা জাদু প্রক্রিয়া, ঔষধ ও মন্ত্রের মধ্যে পৃথক কোনো সীমা রেখা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি—কি প্রাচীনযুগে, কি বর্তমান যুগে। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস 'অথর্ববেদ'র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মন্ত্রের মাধ্যমে 'পবিত্র' করে নিয়েছি এই মনে করে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুণিন যে বস্তু ব্যবহার করছেন, তর্কের খাতিরে বিশেষত মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, দ্রব্য মারফৎ মন্ত্র প্রয়োগ করা যেন মন্ত্রের প্রক্রিয়া অথবা মন্ত্রশক্তিকে এক ধাপ নীচে নামিয়ে দেয়। মন্ত্রের যেন নিজের থেকে কোনো কাজ করার শক্তি নেই। সে দুর্বল এবং দোসর চায়। তাকে শক্তি পেতে হলে একটি বিশেষ অবলম্বন দরকার—যেমন লতার দরকার বৃক্ষের। অর্থাৎ, প্রসঙ্গক্রমে প্রত্যেক বস্তু বা পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাস ও আনুগত্য দেখান হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধানে আমরা পুরা-প্রস্তর যুগ থেকেই দেখতে

পাব বস্তু ও পদার্থের রূপ ও বর্ণগুণ থেকেই জন্মেছে তার প্রতি অলৌকিকতার ধারণা। আদিম মানুষ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধাতব-পদার্থ ব্যবহার করতে-করতে দেখেছে—কোনটা হয়ত বৃষ্টি আনছে মাঠে, কারও প্রভাবে সন্তান আসছে ঘরে, কিছু খাওয়ার ফলে মাতৃদুগ্ধ বেশি হচ্ছে, বিশেষ কিছু ব্যবহারে রোগ-ব্যাধি সেরে যাচ্ছে বা ফাঁড়া কাটছে, কোনও বস্তু ধারণ করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে জয়ের জন্য অথবা শত্রুর দ্বেষ কাটাতে ব্যবহার করছে, সৌভাগ্য বৃদ্ধি হচ্ছে, ইত্যাদি। বস্তু বা পদার্থের প্রতি অলৌকিক বিশ্বাসে গড়ে ওঠে কিছু সাংকেতিক অর্থ। সেগুলি এইরকম :

ক. বস্তু বা পদার্থের আভ্যন্তরীণ শক্তিতে বিশ্বাস।

খ. তার প্রতিযেধক শক্তিতে বিশ্বাস।

গ. কোনো উদ্দেশ্য সাধনে তার অলৌকিকত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ইত্যাদি।

গুণিন তাঁর অধীত বিদ্যার সহযোগে সব মিলিয়ে এই সমস্ত বিষয়কেই কাজে লাগিয়েছেন।

গাছ-গাছড়া, লতা-পাতার ভেষজ গুণ ও অমৃতত্ব অদ্ভুত রকমের। এদের প্রকৃতিজ গুণ রোগারোগ্যের ক্ষমতা এত বেশি যে তা রোগীর শরীরে 'মন্ত্রবৎ' কাজ করে। সর্ব রোগের নিরাময় ক্ষমতা যেমন আছে, আবার ক্ষতিকারক গুণও বর্তমান।

গুণিন গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতাকে দুইভাবে কাজে লাগান—ক. সার্বিক প্রতিষেধক প্রতিকল্পে, খ. এদের কাছে-রোগীর হয়ে রোগমুক্তির কামনা বা প্রার্থনা জানানো।

গাছ-গাছড়া দিয়ে যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তা শুধু ব্যক্তি বা ব্যষ্টি জীবনের জন্যই নয়, এর সাহায্যে বিভিন্ন গৃহপালিত পশু-প্রাণীরও রোগ-নিরাময় করেন গুণিনেরা। বলা চলে, গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতার ভেষজ গুণে মানুষ কিংবা পশুর রোগ ভয়ে পালাতো।

গুণিন তাঁর জানা বা অজানা—যা কিছু তাঁর চোখে পড়ে, সকল গাছ-গাছালিকেই মনে করেন এর বিশেষ ধরনের 'মন্ত্রসিদ্ধ' ক্ষমতা আছে। এছাড়া প্রাকৃতিক অপরাপর প্রধান সম্পদগুলি যেমন মাটি-জল-আলো-বাতাস ইত্যাদি তো আছেই—যা প্রকৃতিজগুণে বিভূষিত এবং মানব জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং—ক. গুণিনের দর্শনশক্তি, খ. তাঁর বাচনিক শক্তি অর্থাৎ মন্ত্রশক্তি, গ. বস্তু ও পদার্থের নিজস্বশক্তি। ঘ. বস্তু বা পদার্থের মধ্যে গুণিনের সঞ্চারিত জাদুশক্তি—সব মিলিয়ে যা সৃষ্ট হয়, তাই ঔষধ।

আমাদের কোনো উদ্দেশ্য-পূরণের জন্য মন্ত্রের সঙ্গে বস্তু বা পদার্থ ব্যবহারের উৎপত্তি সম্পর্কে দুই ধরনের মত প্রচলিত—ক. লৌকিক ঐতিহ্যানুসারী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিমত, খ. বেদোত্তর মত।

যে মতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে গুণিনেরা তাঁদের অধীত বিদ্যা ব্যবহার করেন মূলত দুটি কারণে :

ক. সার্বিক ভাবে মানুষের মঙ্গলের জন্য : শুভকারী

খ. ব্যক্তি বিশেষের অপকারের জন্য : অশুভকারী।

এই ধরনের প্রচলিত ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক নীতি ও মূল্যবোধ এবং পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা সম্পৃক্ত থাকে। সে কারণে দেখতে পাই

'ক'-এর কারণে 'খ'-এর ব্যবহার এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে অতি অবশ্যই পরিপূরক। তবে অশুভকারী মন্ত্র বা জাদু মারণ-উচাটন-অভিচার ইত্যাদি বিষয় সঞ্জাত। বৈদিক সাহিত্যে এই শুভকারী এবং অশুভকারী মন্ত্র বা ইন্দ্রজাল পদ্ধতি যথাক্রমে 'কৃত্যা' এবং 'যাতু' রূপে পরিচিত। যাতু যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা যাতুধান অর্থাৎ রাক্ষস-পিশাচ ডাক-ডাকিনী ইত্যাদি অপদেবতার আহ্বান অথবা বিতাড়ন করেন। অশুভকারী জাদুতে ভয় ও বিশ্বাস থেকেই মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে ডাইনী-বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল সেই আদিম যুগেই। আমার অসুখ সেরে গেল, আমি আরোগ্য লাভ করলাম শুধু এতেই চলবে না, অপরে যেন সেই রোগে আক্রান্ত হয়, তবেই তো আমার স্বস্তি ও সান্ত্বনা। কোনো মড়ক বা অপঘাত, শস্যহানি ইত্যাদি ঘটলে তার কারণ হিসেবে 'ডাইনির নজর' পড়েছে বলে মনে করা হয়। নৈতিক দিক থেকে সমর্থন যোগ্যনয় বলেই সমাজ এইসব মন্ত্র-তন্ত্রকে স্বীকার করেনি বরং এই বিদ্যা-বৃত্তির মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে, শত্রু বলে বিবেচনায় দূরে সরিয়ে রাখে ও এড়িয়ে চলে। আসলে মন্ত্রের ক্ষমতা যাই .থাকুক না কেন মন্ত্রকে যখন চাওয়া-পাওয়ার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় তখন অবশ্যই তার ভাবার্থ অন্য রকম হতে বাধ্য।

মন্ত্রের সঙ্গে কোনো কিছুর ব্যবহারই যে সব সময়ে সাফল্য নিয়ে আসবে তা নয়। দ্রব্য-শক্তির সঙ্গে প্রয়োজন দৈবশক্তির। মন্ত্রের মতো একটি দ্রব্যের একটি গুণ থাকতে পারে, একাধিক গুণও থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফলপ্রদ যা দিয়ে শত্রুনাশ হয় তা দিয়ে হয়ত সৌভাগ্যলাভ নাও হতে পারে। বস্তু ও পদার্থের বিভিন্ন গুণ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বিশেষ দ্রব্যটির চিহ্নিত করণ ইত্যাদি সম্পর্কে গুণিনকে সচেতন থাকতে হয়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, দ্রব্যশক্তির যাই ক্ষমতা থাকুক না কেন ঐশী শক্তি ব্যতিরেখে সেই ক্ষমতার বিশেষ সার্থকতা থাকে না। কল্পনা করা হক, মন্ত্রপূত দ্রব্যের মধ্যে যে শক্তির অধিষ্ঠান হয় তার থেকে বিচ্ছুরিত হয় এমন একটি বিশেষ শক্তি যা ব্যবহারকারীকে মঙ্গলময় বর্মের মতো রক্ষা করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দ্রব্য শক্তির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে মানুষের দেহ অভ্যন্তরস্থ শক্তি এবং তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে আরেক নূতনতর শক্তি। এখানেও পরোক্ষভাবে মানুষের বা কোনো প্রাণীর দেহমধ্যস্থ সুপ্ত বা লুকোন বিরাট একটি শক্তিকে শুধু কল্পনা নয়, স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সাফল্য নির্ভর করছে একাধারে মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি, ঐশীশক্তি এবং একই সঙ্গে মানুষের দেহস্থিত শক্তির কার্যকারিতার উপর। এর মূলে Magic বা Religion-এর কতটা সংমিশ্রণতা অথবা একক গুণ বর্তমান তা পৃথকীকরণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। তবুও বলা যেতে পারে, এর মধ্যে কাজ করে কিছু দার্শনিক তত্ত্ব, কিছু লৌকিক তত্ত্ব ও সংস্কার-বিশ্বাস।

মন্ত্র যার প্রতি প্রয়োগ করা হয় সেই ব্যবহারকারীকেও বিশেষ কতকগুলি সাধনা ও সংযম পালন করতে হয়। অবশ্য তা রোগের বিভিন্নতা অনুসারে এবং গুণিনের পরামর্শ অনুযায়ী।

ক. মন্ত্রের চিকিৎসা শুরু হলে তিন, সাত বা নয় দিন বিশেষ ধরনের কিছু মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন জাতীয় দ্রব্য না-খাওয়া। অবশ্য যে সব ঔষধ আমিষ পদার্থে তৈরি তার

ব্যবহার-বিধি স্বতন্ত্র।

খ. চিকিৎসা চলা কালীন স্ত্রী সহবাস, ঋতুমতী নারীর ছোঁয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। রোগী স্ত্রী হলে যাবতীয় কাজ পুরুষ দিয়ে অথবা নিকট আত্মীয় ব্যতিরেকে অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হয়।

গ. জন্মা-অশৌচ, মৃত-অশৌচ কঠোর ভাবে পালনীয়। তাঁদের বাড়িতে না-খাওয়া, না-ছোঁয়া ও মান্য।

ঘ. শুকনো মাছ, কাঁকড়া, ডিম, কুঁচে, বিশেষ ধরনের ডাল ও শাকসবজি না-খাওয়া।

ঙ. ভিন্ন-গোত্রীয়ের ছোঁয়া না-খাওয়া।

চ মন্ত্রপূত দ্রব্য ও পদার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে কঠোর হওয়া। মাটিতে না-পড়া, বিড়ালে না-মাড়ানো, বাসি হলে দুধ-গঙ্গাজল বা ধান-দূর্বা বা তুলসীপাতা দিয়ে শুদ্ধ করণ, অতিরিক্ত থাকলে তা জলে বিসর্জন দেওয়া পালন।

ছ. কোনো কিছু ধারণের জন্য বিশেষ বার, তিথি, নক্ষত্র, পক্ষ, সময়, ক্ষণ ইত্যাদি মানা। ধারণ বা গ্রহণের সময় দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হতে হয়।

জ. রোগ না-সারা পর্যন্ত গুণিনের দেওয়া নির্দিষ্ট মন্ত্র জপ করা।

ঝ. বিশেষ কোনো দেবতা-দেবীর উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করা, শুদ্ধাচারে থাকা, হবিষান্ন গ্রহণ, একাহারী থাকা ইত্যাদি।

সাধারণ ক্ষেত্রে মন্ত্রের সঙ্গে ঔষধ এক বারই বিনিয়োগ করলে রোগী ভাল হয়ে যায়। জটিল রোগের ক্ষেত্রে ঔষধ দ্বিতীয় বার প্রয়োগ করেন গুণিন। অন্য গুণিন ক্ষত স্থান নষ্ট করলে বা বাণ মারলে, ভৌতিক চিকিৎসায়, সর্পাঘাতে বা দীর্ঘ মেয়াদী কোনো রোগের ক্ষেত্রে দুই বা তার বেশি বার মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করেন গুণিন। সব ক্ষেত্রেই রোগীর নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদির অবশ্যই প্রয়োজন। মন্ত্রের সঙ্গে যা কিছু ব্যবহৃত হোক না কেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিপক্ষকে সাবধান করা। তাই বাস্তবের সঙ্গে অভিজ্ঞতা নেই এমন কোনো কিছুই গুণিন তথা লোকসমাজ ব্যবহার করেন না।

গুণিনেরা মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত বস্তু ও বিষয় দ্রব্য ও পদার্থ বিনিয়োগ ও ব্যবহার করেন তার কিছু নিদর্শন :

ক. বৃক্ষ ও লতা-পাতা-শেকড়

শ্বেত আকন্দ, শ্বেত কুরুপ, মনসাসেজী, ঢোল সমুদ্র, ঈষাণমূল, ক্যালেকোঁড়া, মহাসমুদ্র, শিবজটা, কৃষ্ণ তুলসী, শিসাকন্দ, যজ্ঞে ডুমুর, নাগদানা, গুয়ে বাবলা, বন চাঁড়াল, মান কচু, ভূত ভৈরবী, কতবেল, আমাদা, নীল কেদার, কালকচু, বাসক পাতা, চাঁপাফুলের পাতা, নিম পাতা, নিসিন্দেপাতা, ঢাকাইহেম্নার পাতা, লজ্জাবতী পাতা, ছাতিম, অজশৃঙ্গী লতা, মহাদেবী লতা, অপমার্গলতা, পান, বাঁশ-বাখারী, তিলক, ষষ্ঠী, জিবলি, শ্মশান তুলসী, কুল, খদির, মাদার, কুষ্ট, শিংসপা, অশ্বত্থ, দূর্বা, শরবান ইত্যাদি।

খ. শস্য ও বীজ

ধান, যব, মেথি, তিল, তিসি, সরিষা, ধানের তুষ, মরিজ, গুটি পাটের দানা, তেঁতুল বিচি ইত্যাদি।

গ. ধাতু, পাথর

লোহা, তামা, সীসা, রূপা, সোনা, পেরেক, কাঁসা, কড়ি, ঘোড়ার নাল, নীলা. গোমেদ, প্রবাল, পোখরাজ, সাপের মাথার পাথর ইত্যাদি।

ঘ. ব্যবহার্য জিনিস

মেখলা, কোমরের ঘুনসি, চাবির গোছা, সতিন কাঁটা, নতুন গামছার খুঁট, কাপড়ের আঁচলের টুকরো, রজঃপ্লুত কাপড়, পরিত্যক্ত কাপড়-জামা, বালিস ইত্যাদি, জুতা, লাঠি, আয়না, ছড়ি, তাবিজ, কবচ, মাদুলি, লোহার উখার গুড়ো, হাতুড়ি, আংটি, জালের কাঁটি, নয়াপয়সা, বড়শি, শ্মশানের সিঁদুর, চুপড়ি, গায়ের হলুদ, কাজল, হুঁকো, হুঁকোর কাত প্রভৃতি।

ঙ. তৈজস পত্র

থালা, বাটি, ঘটি, কলসি, ডাবুর, কাঠের আসন, পিঁড়ি, ছুরি, মালসা, খলা, মাটির হাঁড়ি, সরা, কুলা, খোলাম কুচি, ঝাঁটার কাঠি ইত্যাদি।

চ. কাঠ

শুষ্ক কাঠ, সমিধ, কঞ্চি, মুগুর, বাঁশ, বাঁশের বাখারি, শুকনো বেত, শ্মশানের কাঠ, শ্মশানের বাঁশ, শ্মশানের ছাই, পোড়া কাঠ, চন্দন, ছাতিম-নিম-মাদার-পলাশ গাছের ছাল ইত্যাদি।

ছ. অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস

আতপ তণ্ডুল, ধুনা, গোগ্গুল, লাউয়ের বস, ঘি. সরিষার তেল, লবণ, চর্বি প্রভৃতি, মধু, বাতাসা, চিনি ইত্যাদি মিষ্টি।

জ. মাটি-জল-আগুন

ইঁদুরের মাটি, কামাক্ষা পোকার মাটি, সাদামাটি, বালি, পায়ের ধুলা, কবর বা শ্মশানের মাটি, প্রদীপ, যজ্ঞীয় আগুন, হোমের আগুন, সমুদ্র ও নদীর ফেনা, আঘাটের জল, বিভিন্ন বর্ণের মাটি, গরুর চোনা, চাল কুমড়ার জল, হুঁকোর জল প্রভৃতি।

ঝ. পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ

সাপ, বাঘ, কুকুর, শিয়াল, গরু, মহিষ, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতির বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিং, দাঁত, নখ, কান, চামড়া, লোম, হাড় ইত্যাদি, টিকটিকির মাথা, শামুক, মুরগি, পেঁচা-কাক-কোকিল-ঈগল-শকুন-পায়রা প্রভৃতির পালক, ডিম্ব, বিষ্ঠা, এদের শরীরের বিশেষ অংশ, কালো বিড়ালের হাড়, বিভিন্ন পশুর গায়ের পোকা, কালো মাছি, কেঁচো, গাং-কাঁকড়া, কাঁচা বা গলিত মাংস, পঙ্গপাল, জোনাকি, ফড়িং ইত্যাদি।

ঞ. ফুল-ফল

চাঁপাফুল, লাল-ফুল, জবাফুল, কলমি, কুরুকফুল, ফুলের কুঁড়ি, কলা, বেল, নারকেল, আদা, পাতিলেবু, আমাদা, আধকপালে, সুপুরি ইত্যাদি।

ট. মানুষের দেহ সম্পৃক্ত

মাথার খুলি, চুল, দাঁত, নখ, চামড়া, গায়ের ময়লা, শিশুর শুষ্ক নাভি, দুধ, রক্ত চাঁড়াল-হাঁটখুড়ো-ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ-ওঝা, গুণিন, আইবুড়ো মেয়ে প্রভৃতিদের হাড় ইত্যাদি।

ঠ. বিভিন্ন দেব-দেবী, দানব-দৈত্য, ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, যাতু-গান্ধর্ব, অপ্সরা-কিন্নর, মানুষেব বংশাবলী, ব্যক্তিগত সম্পত্তির তালিকা, দেবস্থানের মাটি, জল ; বেশ্যাবাড়ির মাটি ইত্যাদি।

আমাদের কাছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাক্ষী বহন করে এনেছে যে অথর্ববেদ আলোচনা প্রসঙ্গে সেখানেও দেখতে পাই, পুরোহিত মন্ত্র দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করছেন এবং এ-ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায় হলো যাগ-যজ্ঞ এবং জাদুগুণমণ্ডিত ও গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি ঔষধ। অথর্ববেদের চিকিৎসক অর্থাৎ পুরোহিত মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত বস্তু-বিষয় ও পদার্থ ব্যবহার করেছেন তার তালিকা সংক্ষিপ্ত দেওয়া হলো।

কবজ, তাবিজ, প্রাকৃতিক গুণে বিভূষিত ঝর্না-মরু-কুয়া-হ্রদ-নদী-সাগর প্রভৃতির জল ও ফেনা, দুধ, মধু, যব-বার্লি, সোম, মুঞ্জঘাস, ঘি, উঁই ঢিবি ও ইঁদুর মাটি, মিহি কাদা বা বালি, বিষানিকা নামক গরুর শিং, অরুন্ধতীলতা, রোহী ও লাক্ষা, কর্পূর, মাজুফল, শর, মন্ত্রপূত আগুন, দুধ-ঘি-এ সিদ্ধভাত, চালের খড় পোড়া জল, চিপুত্র বা পলাশ ফোড়া, সাদা ও হলুদ সরিষা, পৃশ্নিপর্ণী লতা, কুষ্ঠগাছ, তামা-সীসা, লোহা, কাঁসা-সোনার বিভিন্ন পাত্র ও অলংকারাদি, গরু-ষাঁড়, তোতাপাখি-বুলবুল-শুক-হলুদ রঙের দোয়েল, হরিদ্রালতা, বামা-কৃষ্ণলতা, অসিক্নী-নালিলতা, শুকনো গোবর, আসুরা বা শ্যামাগাছ, উক্ষলতা, বভ্রু বা বাদামি বার্লি, তিলের কুঁড়ি, অর্জুন গাছের টুকরো, লাঙল, ঈষ, হরিণের ও ব্যাঘ্রের চামড়া, ছোলা, বনৌষধির সার, বরণগাছ, সিদ্ধ ভাত ও পচামাছের মণ্ড, মদাবতী বিষলতা, বিষলতা, ঝাঁটা, পুরোণো কাপড়-চোপড়, আলাবুর ভিতরকার জল, কুশ ঘাস, ঘোড়ার লেজ, সরষের তেল, নিতত্মী লতা, শামী গাছ, পিপ্পলী, গোমূত্র, অঙ্গিরস, ত্রিধাতু, মেখলা, আতপতণ্ডুল, কুড়ুল, মানুষ, গরু-ঘোড়া-মেঘ,-ছাগলের বিশেষ অংশ বা ছাল, নখ, দাঁত, কান, লেজ, লোম, টিকটিকির মাথা, কুকুর-বিড়াল, ঈগল-শকুনের বিশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি।

শেক্সপিয়রের বহু রচনায় যেমন উদাহরণ রয়েছে তেমনি তাঁর 'ম্যাকবেথ' নাটকেও মারণ-উচাটনের প্রয়োজনীয় বস্তু কিকি হতে পারে তার দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে।

ACT FOUR

SCENE 1. A dark cave. In the middle, a
a cauldron boiling.

Thunder. Enter the three witches

1 witch. Thrice the brinded cat hath new'd

2 witch. Thrice and once the medge-pig whin'd

3 witch. Harpier Cries, 'tistime', its time.

1 witch. Round about the cauldron go,

In the poison'd entrails throw.

Toad that Under cold stone

days and nights has thirty-one
Swelt' erd venom sleeping got
Boll thou first 171'th' Charmed pot
All, Double tail and trouble,
Fire burn and a Cauldron bubble.
2 witch, Fillet of a ferny snake,
In the Cauldron boil and bake,
Eye of neiwt, and toe of frog,
Wool of bat, and tongue a fdog,
Adder's fork, and blind, Worm's sting,
Lizard's legand bowlet's wing.
For a charm of powerful trouble,
like a hell-brath boil and bubble.
All. Double toil and trcuble,
Fire burmand Cauldron bubble.
3 witch mumny, maw and gulf
of the ravin'd alt-sea shark,
Root of Memlock digg'd i' th' dark.
Liver of blaspheming jew,
Gall of goat, and slips of Yew
Silver'd in the moon's eclipse.
Nose of Turk, and Tartar's lips,
Finger of birth-strangled babe
Ditch-deliver'd by a drab–
Make the truel thick and slab,
Add threto a tiger's Chaudron
For the ingredience of our cauldron.
All. Double double toil and trouble,
Fire burn, and cauldron bubble.
2 witch. Cool it with a baboon's blood,
Then the Charm its firm and Good.

Enter HECATE.

Hec. O. Well done ! I commend your pains,
And every one shall share i' th' gains,

And now about the cauldron sing,
Like elves and fairies in a ring,
Enchanting all that you put in
—E L B S Edition
Edited by Petter Alexander 1965

গুণিন তাঁর অধীত বিদ্যা যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তা নিম্নরূপ
ক. সামগ্রিক ভাবে মানব জীবন ও মানব শরীর।
খ. যে কোনো বস্তু, বিষয়, পদার্থ এবং প্রাণী।
গ রোগ-ব্যাধি ও তাদের সৃষ্টিকারী বিষয় সমূহ।
ঘ. শত্রু পদবাচ্য যে কোনো বিষয়।
ঙ. সামগ্রিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে।
চ গৃহপালিত এবং বন্য জীবজন্তু, পোকা-মাকড় ইত্যাদি।
ছ. কীট-পতঙ্গ ও অন্যান প্রাণী।
জ. ঘর-গৃহস্থালি তৈজস পত্রাদি এবং ব্যবহার্য বস্তু, পোশাক প্রভৃতি।
ঝ. প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম যেমন হাঁটা-চলা, খাওয়া-শোয়া-বসা-যাত্রা মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি।
ঞ নানাবিধ গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, পাথর, কাঠ, মাটি, জল ইত্যাদি।
ট. প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যেমন খরা-বন্যা, ভূমিকম্প, রৌদ্র, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, উল্কাপাত, বজ্রপাত, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী, তুষারপাত ইত্যাদি।
ঠ. জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-নামকরণ ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান।
ড. দেব-দেবী, দৈত্য-দানা, ভূত-প্রেত, ডাক-ডাকিনী, যাতু-গন্ধর্ব, কিন্নর-অপ্সরা, অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতা ও উপদেবতা ইত্যাদি।
ঢ. ধর্মীয় ও পবিত্র স্থান সমূহে প্রবেশ-প্রস্থান পথ, যাজ্ঞযজ্ঞ ও ক্রিয়া-অনুষ্ঠানসমূহ।
ণ. পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল, মরুভূমি, স্থানীয় অঞ্চল, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ইত্যাদি।

মন্ত্রে যে-সমস্ত বিষয় বারংবার উচ্চারিত হয় :
ক. হিন্দু ও মুসলমান দেব-দেবী, অবতার কল্প নাম, লৌকিক দেব-দেবী ও অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।
খ. রাজা ও রানী এবং অনুরূপ ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গুরু-গোঁসাই।
গ. বংশ, জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়।
ঘ. বিভিন্ন স্থান-নাম, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগর—কখনো সরাসরি কখনো ব্যঞ্জনায়, যানবাহন, রাস্তা।
ঙ. স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, বিভিন্ন লোকসমূহ, দশদিক।
চ. মাটি, জল, জঙ্গল, আগুন, বাতাস, আকাশ, অন্তরীক্ষ।

ছ. নিকট সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়।

জ. অলংকার, ধাতু, দ্রব্য. পদার্থ, তৈজসপত্র, ব্যবহারিক দ্রব্য।

ঝ মানুষসহ অন্যান্য পশু ও প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মল-মূত্রে, নখ-চুল-দাঁত, যকৃৎ, পিত্তাশয়।

ঞ. বার-তিথি-মাস-বছব, ক্ষণ।

ট. পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, অশবীরী-আত্মা, জলচর-উভচর, খেচর প্রাণী সমূহ।

ঠ. বিষ, বিষের জাতি. বিভিন্ন রং।

ড. মন্ত্র ও মন্ত্রের নাম, বোগ ও রোগের নাম।

ঢ. বিভিন্ন গাছ, লতা-পাতা-ফুল-ফল, শুকনো কাট, শেকড।

ণ. মন্দির, মসজিদ, তীর্থস্থান ও সংশ্লিষ্ট দেবদেবী-পীর-পিরানী।

ত. বাদ্য যন্ত্র, বাদ্যের নাম, ছন্দ-তাল।

থ পোশাক-পবিচ্ছদ ও আচ্ছাদন বিষয়।

দ. বিভিন্ন সংখ্যা।

ধ নদী-পুকুরঘাট, নদী-সমুদ্রতট।

ন বিভিন্ন শষ্য ও বীজ প্রভৃতি।

মন্ত্র প্রয়োগকারী [Pcrforms] অর্থাৎ গুণিনেরা বামুন-পুরুত, আলি-আল্লাহ, ফকির-দরবেশ, মোল্লা-মৌলভী, ওঝা-কবিরাজ. বেদে-বৈদ্য, সাধক-গুরু, ওস্তাদ, ভৈরব-ভৈরবী ইত্যাদি যে নামেই পরিচিতি লাভ করুন না কেন, অধিকাংশ সময়ে সাংসারিক-পারিবারিক ক্ষেত্রে দেখেছি—চলতে ফিবতে বিশেষ অভিজ্ঞতায়. জীবনের তাগিদে প্রায় প্রতিটি বাড়ি কম-বেশি অনেকেই, বিশেষত প্রবীণরা ঠুকো-ঠাকা মোকাবিলা করেন টুক-টাক মন্ত্র-তন্ত্র গাছ-গাছড়ার সাহায্যে। এ যেন গ্রামীণ জীবনে প্রবহমান ধারার একটি ঐতিহ্যময় বিষয়। সবাই যে গুরু বা ওস্তাদ ধরে গুণিন-বিদ্যা শেখেন তা নয়। বাবার কাছ থেকে ছেলে পেল, কিংবা শাশুড়ীর কাছ থেকে বৌমা। এমনিভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে এই জ্ঞান লভ্য। এইরকম জানতে-জানতে, শিখতে-শিখতে যিনি গুরু বা ওস্তাদ ধরে অনেক বেশি শেখেন তিনিই পারিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়ির বাইরে যান বা 'গুণিন' হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ একজন ওঝা বা গুণিনকে ডাকবেন তা নয়। একজন গুণিন সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন না, সম্ভবও নয়। তবে গুণিন মাত্রই একাধিক বিষয়ের মন্ত্র ও প্রয়োগবিধি শিক্ষা লাভে সচেষ্ট হন এবং সেটা প্রয়োজনের তাগিদে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। যাঁর প্রতি মানুষের বিশ্বাস তাঁকেই ডাকা হয়, তাই পাশে মস্ত গুণিন থাকুক না কেন। এনিয়ে পাড়ার কোনো কথা ওঠে না, বিবাদ-বিসংবাদ হয় না। অবশ্য যিনি বড় গুণিন তাঁকে স্বীকৃতি দেন সবই।

গুণিনেরা নিজ গ্রামে বা পাড়ায় কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যেই চিকিৎসা করেন। বড় গুণিনের খ্যাতি দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। রোগী তার বাড়িতেই আসেন রোগ-চিকিৎসা করাতে। আবার অসমর্থ রোগীর বাড়ি গুণিন স্বয়ং যান। আরোগ্য লাভের পর রোগী কৃতজ্ঞতা বশত চিকিৎসককে ভালো-মন্দ খাইয়ে দেন বা বাড়ির ভাল শাক-সব্জী-লাউ-

কুমড়ো-পেঁপে ইত্যাদি পাঠিয়ে দেন চিকিৎসকের বাড়ি। কোনো কোনো গৃহী দেন ধুতি-গামছা-গেঞ্জি ইত্যাদি। সোনার আংটি, গরু এমনকি পাঁচ কাটা পরিমাণ জমি দান করেন স্বচ্ছল কোনো গৃহস্থ-রোগী। আসলে গুণিনদের মধ্যে কোনো পারিশ্রামিক বা সম্মান দক্ষিণা নেবার প্রথা প্রচলন নেই। কোনো কোনো গুণিন আছেন যাঁরা রোগীর বাড়ীতে জল বা আসন গ্রহণ করেন না। প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা সবই তিনি সঙ্গেই নিয়ে যান। গুণিনরা মুখ ফুটে কিছু চান না। তাঁদের চাহিদাও সীমিত। যদিও বা কেউ দক্ষিণা বা পারিশ্রমিক গ্রহণ কবেন তো তার কোনো 'রেট' বা সীমা বাঁধা নেই—সমাজের অন্যান্য চিকিৎসকদের মতো। বড়জোব হরি-কালী-শীতলা-শিব-মনসা বা কোনো দেব অথবা দেবীর নাম করে শ-পাঁচ আনা, পাঁচ সিকে, সাত সিকে পরিমাণ মূল্যের মানত দিতে বলেন, 'লুট' দিতে বলেন। কাউকে কবচ -মাদুলী-পাথর দেবার প্রয়োজন পড়লে উক্ত কবচ-মাদুলি বানাতে যে মূল্য পড়ে সেইটুকুই মাত্র নেন। প্রবাদে আছে মুনি-ঋষিদেরও মনো টলে। তেমনি কোনো গুণিনের যদি কিছু চাহিদা থেকেও থাকে তা তিনি প্রকাশ করলেই পেয়ে যান। তবে এরকম গুণিনের সংখ্যা এতো অল্প যে, সারা অঞ্চল খুঁজে একজনকেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আমবা ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখেছি,শতকরা তিন থেকে সাতজন গুণিন রোগীর গায়ে হাত দিলে দেড় থেকে দুই টাকা নেন। বিনা পারিশ্রমিকে বা স্বল্প দক্ষিণায় এইভাবে গুণিনেরা দিনের পর দিন মানুষের সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন, তাতে তাঁদের কি লাভ হয়—এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত গুণিনদের কাছে গেছি, তাঁরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন—পারিবারিক দায়-দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হয় ঠিক, সময়-অসময় নেই রোগীর বাড়ি যেতে হয় বলে বাড়িতে কম-বেশি কথা ওঠে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। মূল কথা হলো—তিনি মন্ত্র জানেন বলেই লোকে তাঁকে ডাকে। এই ডাকা আর যাতায়াত দুইয়ের সংমিশ্রণে পরোক্ষ ভাবে সংঘটিত হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক, পাওয়া যায় অসংখ্য মানুষের সম্মান ভালোবাসা আশীর্বাদ। গুণিনদের অভিমত—'যদি লাভের কথা বলেন এটিই লাভ।'

গুণিনদের মন্ত্র প্রয়োগের কাল বা সময় সম্পর্কেও বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি মন্ত্র বা ক্রিয়ানুষ্ঠান একই সময় বা একই নিয়মে কখনই সংঘটিত হয় না। গুণিনরা সাধারণত শনি-মঙ্গলবার, অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিন, সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার সময় কিংবা রাত্তির বেলা বেশি পছন্দ করেন মন্ত্র প্রয়োগের জন্য। অতি অবশ্যই দীর্ঘস্থায়ী রোগ-সারাবার প্রয়োজনে, আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হওয়া কোনও কারণে যেমন সাপে কাটা, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ-চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিন বেছে নেন গুণিন। এক কথায় রোগের বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজনেই সময় ও দিন-ক্ষণের গুরুত্ব নির্ভর করে। তাঁদের বিশ্বাস, মন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃতির একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, যেমন আছে জলের সঙ্গে মাছের। তাই জন্য সময় নির্বাচন ও জরুরি।

রোগীদের মতো গুণিনদেরও কিছু-কিছু নিয়ম পালন করতে হয়, বিশেষত মন্ত্র প্রয়োগ বা চিকিৎসার দিন :

ক. স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা, ঋতুমতী নারীর সংস্রবে না থাকা।

খ. নির্জনাবকাশে কাল যাপন।

গ. বিশেষ ধরনের খাদ্য গ্রহণ।

ঘ. বিশেষ ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ।

ঙ. অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত থাকা ও শুদ্ধাচার পালন।

চ. প্রতিদিন ইষ্ট দেবতার পূজা দেওয়া।

ছ. বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে আগে পূজা করে তবে সেই কাজে হাত লাগানো।

যে সমস্ত নিয়ম বিধি গুণিনেরা পালন করেন তা তাঁদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মানুষকে জানবার বড় একটা অবকাশ থাকে না। মন্ত্র মুখস্থ করার সময়ও গুণিনেরা লাল কালি দিয়ে তালপাতায় লিখে ভক্তি সহকারে পড়েন। মন্ত্রের প্রতি যেরূপ মানুষের অগাধ বিশ্বাস তদরূপ গুণিন সম্প্রদায়দের মধ্যেও প্রচলিত ধারণা যে রোগ-দারিদ্র্য ও দুঃখের মতো মন্ত্রও সচেতন। তার মধ্যে অস্তিত্বময় কিছু একটা আছে। গুরু বা ওস্তাদের আশীর্বাদ নিয়ে তাকে সক্রিয় করাতে হয়। মন্ত্রের এই সক্রিয় শক্তির মেয়াদ মন্ত্র বিশেষে তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন বা ছয় বছর। নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে বছরে এক বার করে মন্ত্র সমূহ জাগাতে হয় বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে হয়। যদি মন্ত্র না জাগানো হয় বা তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করা হয়, তাহলে তার কার্যকরী ভূমিকা ব্যর্থ হয়ে যায় বলে গুণিনেরা মনে করেন। গুণিন মন্ত্র জাগান সাধারণত আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে, বিজয়া দশমীতে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন রাত্তিরে বা জাগরণ রাত্তিরে, অমাবস্যা-পূর্ণিমার রাত্তিরে ইত্যাদি। এই দিনে তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ গুণিনদের পালনীয় বিধি-বিধান অনুসারে যথেষ্ট সংযমী থাকেন। সারা রাত্তির ধরে একলা থেকে প্রত্যেকটি মন্ত্র পড়ে যান, কখন বা গুরু মহাশয়ের বাড়িতে শিষ্য গণ এসে, সকলে এক জায়গায় বসে মন্ত্র চর্চা করেন। প্রত্যেকটা মন্ত্রের আদ্যোপান্ত পড়বার অবকাশ যদি গুণিন না-পান তো মন্ত্রের প্রথম এবং শেষ কয়েক পংক্তি পড়ে মন্ত্রসমূহ জাগিয়ে সচল ও সচেতন রাখেন। যেন প্রত্যেকটি মন্ত্র এক একটি সৈন্য শিবির। তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কেবল নির্দেশ পেতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুরই অপেক্ষা। আদিবাসী সমাজে প্রচলিত 'ভুয়াং' বা 'দাঁসায়' নাচ মন্ত্র-তন্ত্র ও ঔষধ-পত্র ইত্যাদি শেখার অনুষ্ঠান। দুর্গা পূজার সময় এই 'দাঁসায়' অনুষ্ঠান হয়। দাঁসায় অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্য উভয়ে অংশ গ্রহণ করেন। গুণিনেরা মন্ত্র জাগাবার দিনে আরেকটি বিশেষ কাজ করেন থাকেন তাকে 'খয়রাত' বা 'ঋনশোধ' বলে। ঋণ শোধ অর্থাৎ গুণিনদের যে সমস্ত আচরণ বিধি ইত্যাদি আছে তা যদি তাঁরা যথাযথ না পালন করেন, মন্ত্র ব্যবহারের সময় যদি মনের অজান্তে কোন ভুল করে থাকেন, সেইজন্য যে অপরাধ বোধ বা পাপবোধ জন্মে তার থেকে মুক্তি কিংবা আত্মরক্ষার আকুতিতে নির্দিষ্ট কোনো দেব-দেবীর কাছে 'ক্ষয়রাত' দেন বা ভোগ-মানত সম্পূর্ণ করেন। কোনো কোনো গুণিন আবার নূতন ঝুড়িতে বা নূতন মেটে হাড়ির সরায় রাখা পাকা কাঁঠালি কলা খেয়ে নেন ভোর-রাত্তিরে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে। পরে স্নান সমাপন করেন। এই ধরনের ক্রিয়াচার করলে গুণিনকে সারা বছর কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলে বিশ্বাস।

প্রাত্যহিক জীবনে সব মন্ত্র মুখস্থ রাখা সম্ভব নয় বলেই গুণিনেরা বর্তমানে মন্ত্র খাতায় লিখে রাখেন। মন্ত্র লেখা হয় খাতার এক পৃষ্ঠায় লালকালি, আলতা বা ভেষজ রং দিয়ে। লাল রঙের শালু কাপড় কিংবা লাল রঙের সুতো দিয়ে বোনা ছোট্ট কাঁথা দিয়ে খাতা ও পুঁথি সমূহ একত্রে বাঁধা থাকে। খাতার উপরে লেখা থাকে ইষ্ট দেবতা ও গুরুর নাম, বিভিন্ন প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ও ছবি যেমন—'ওঁ' সস্তিকা ইত্যাদি। গুণিনদের হাতের লেখা খাতা কিংবা তাল পাতার পুঁথির সঙ্গেও দেখেছি ছাপা অক্ষরের বিভিন্ন পুস্তিকা—ইন্দ্রজাল, বশীকরণ, তন্ত্র, রাক্ষসীতন্ত্র, পশু-চিকিৎসা, নাড়ী-বিজ্ঞান, তন্ত্র বিভূতি, কামরূপতন্ত্রমার, জ্যোতিষ বিদ্যা, লতাপাতার গুণ, দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান, গাছ-গাছড়ার বিচার প্রভৃতি। সব গুণিনদের সাধারণত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় মন্ত্র কিছু মুখস্থ থাকে, মুখস্থ রাখতে হয়। তবে বড় এবং জটিল 'কেস' থাকলে মন্ত্রের বাণ্ডিলটাই ধরে নিয়ে যান গুণিনেরা। অবশ্য যাবার আগে ছাপান পুস্তিকা সমূহ বাড়িতে রেখে যেতে ভোলেন না। যদিও শিষ্যত্ব গ্রহণ ইচ্ছুকদের, শিষ্য প্রতিমদের এবং শিষ্যদের এঁরা সব কিছু দেখান। কিন্তু ছাপার বই পড়তে, ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। গুণিনদের বিশ্বাস অন্যান্য যে কোনো বিদ্যার মতো মন্ত্রও 'গুরু' ধরে শিখতে হয়। গুরুর কাছে 'নাড়া' বেঁধে মন্ত্র না-শিখলে পূর্ণতা হয় না। ছাপার বই পড়ে মন্ত্র শেখা যায় সত্যি, কিন্তু সে মন্ত্র 'মৃত' বলে ঘোষিত। গুরু প্রণামী দিয়ে অথবা গুরুর অনুমতি নিয়ে বিশেষ প্রণালীতে মন্ত্র জাগাতে হয়, কিংবা গুরুই প্রতিমার চক্ষুদানের মত মন্ত্রেরও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে দেন। সে কারণে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত বিশেষ পঞ্জিকার পাতায় বিজ্ঞাপিত বই দুএকটা ঘরে রাখলেও সে মন্ত্র 'শুদ্ধ' নয়। আর মুদ্রিত হয়ে গেলে তা কত জনই না দেখেন, পড়েন। ফলে বহুজন ব্যবহারের দরুণ মন্ত্রের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয় বলে এঁরা মনে করেন।

গুণিনের মতে হাতের লেখা বা ছাপা অক্ষরে মন্ত্র যা দেখা যায় তা হলো মন্ত্রের শব। প্রত্যক্ষভাবে গুরুর তত্ত্বাবধানে মন্ত্র-বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগ্রহ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরু সন্তুষ্ট হলে ব্যক্তিগত ভাবে 'মন্ত্রগুপ্তি' ও শপথ বাক্য পাঠ করান। তারপর মন্ত্রচর্চার অনুমতি দেন। সেজন্য শিষ্যকে অনেক ধৈর্য ধরে নানাবিধ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। গুরু প্রসন্ন না হলে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র শিক্ষা বড়ই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি, একজন গুরু তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এসে তবে শিষ্যকে তাঁর অধীত বিদ্যার অধিকারী করেন। কিন্তু সমস্ত বিদ্যাই শিষ্য পাবেন অথবা গুরু প্রদান করবেন—এমন ঘটনা খুব একটা ঘটে না। কিছু কিছু মন্ত্র গুরু তাঁর নিজের প্রয়োজনে শিষ্যের কাছে গোপন রাখেন।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও বিশেষ কোনো তিথি-নক্ষত্রের দিন গভীর রাত্তিরে গুণিন দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর কাছে মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য পাঠ করেন। পান-সুপারি, নূতন কাপড়-গামছা, দক্ষিণা গ্রহণ করে মাঙ্গলিক ক্রিয়াচারের মধ্যে গুরু শিষ্যকে বিদ্যা সমর্পণ করেন। শিষ্যের তুলনায় গুরু কম বয়স্ক, নীচ জাতি, দরিদ্র হলেও তাঁকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, পায়ে হাত দিয়ে গুরু প্রণাম করতে হয়। যদি একাধিক ওস্তাদের কাছে মন্ত্র শেখা হয় তাহলে প্রথম ওস্তাদ বা গুরুই 'মন্ত্রগুরু' রূপে অভিহিত হন। কারণ শিষ্যত্ব স্বীকার

করে নিয়ে তিনিই গুণিনকে হাতে কলমে মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি শিক্ষা দেন, বিভিন্ন রোগীর বাড়ি নিয়ে যান, এবং শিক্ষানবিশী কালেই বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ সংস্থাপন করেন।

সমাজে লৌকিক মন্ত্রের দুটি দিক প্রচলিত। তার একটি 'সু' অর্থাৎ মঙ্গলজনক, হিতকারী এবং দ্বিতীয়টি 'কু' বা অহিতকারী। 'সু' অথবা 'কু' একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলেও 'সু'-এর সাহায্যে অল্প অনিষ্ট করে বৃহৎ মঙ্গল সাধিত হয় এবং 'কু'-এর সহায়তায় বৃহৎ অনিষ্ট করে ক্ষুদ্র চরিতার্থ হয়। সুতরাং কু-মন্ত্রের প্রভাব শিষ্যের মধ্যে যাতে সঞ্চারিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গুরু মহাশয় 'মন্ত্রগুপ্তির' আয়োজন করেন। সমাজ তথা জনজীবনের মঙ্গলের স্বার্থে মন্ত্রগুপ্তির মাধ্যমে গুণিনকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় :

ক. তাঁর অধীত বিদ্যা সকল সময়ের জন্য জনকল্যাণেই প্রযুক্ত হবে।

খ. গভীর রাত্তির, দুপুর, সন্ধ্যা, সকাল যে-কোনো-সময় এবং যতদূরেই হোক, ডাক পড়লে তাঁকে সাড়া দিতে হবে।

গ. ডাক না পড়লেও অনেক সময় মাত্র কানে শুনে উপযাচক-বন্ধু হয়ে রোগীর বাড়ি যেতে হয়, পরামর্শ দিতে হয়।

ঘ. ব্যক্তি বা সমাজের অকল্যাণকর এমন কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হয়।

ঙ. রোগীকে 'কয়েদ' রেখে বা কষ্ট দিয়ে অকারণ অন্য গুণিনের সঙ্গে মন্ত্রের লড়াই করা অনুচিত।

চ. একাধিক গুণিনকে এক জায়গায় ডাকা হলে রোগীর গায়ে হাত দেবার পূর্বে অন্যান্য গুণিনের অনুমতি, বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ নিয়েই তবে কাজ শুরু করা বিধেয়।

ছ. পারিশ্রমিকের দাবি করা যাবে না।

জ. সাফল্য অথবা ব্যর্থতায় অহংকারী অথবা ভেঙে পড়লে চলবে না। গুরুকে সব সময়ের জন্য স্মরণ করতে হবে।

ঝ. সর্বোপরি গুণিনকে মনে রাখতে হবে তিনি সমাজের একজন বন্ধু, সমাজের জন্যই তাঁর নিবেদিত প্রাণ, সমাজের প্রয়োজনে তাঁর জন্ম।

সমাজে অকল্যাণকারী গুণিনকে লোকে ভয় করেন, এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। এই ধরনের গুণিন এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে যে-কোনো সময় যে-কোনো বিষয় দেখলেই মনে ক্ষতি করার প্রাণতা জন্মে। আদিবাসী সমাজের মধ্যে মন্ত্রচর্চার ব্যাপারে যেমন কোনো পবিত্রকরণের অনুষ্ঠান স্পৃহা নেই, যে যত নোংরা থাকে তার মন্ত্র তত সফল বলে বিশ্বাস করা হয়, তেমনি অহিতকারী গুণিন যে কোনো অবস্থাতেই ক্ষতিকারক মন্ত্র নিক্ষেপ করতে পারেন। নিজের অজান্তে গুণিন নিজের কোনো ক্ষতি করে ফেললে তা নিজের অধীত বিদ্যায় সারানো যায় না। এ এমন এক বিদ্যা যে তার জন্য অন্য গুণিনের প্রয়োজন হয়। আর, সমাজে একবার অপবিদ্যার চাউর হয়ে গেলে যাদুদণ্ড-হাড়-কাঠ-গাছ-গাছড়া-শিকড়-পাথর ইত্যাদি সহযোগে গুণিন যতই মন্ত্র বিনিযোগ করুন, যতই হাড়ে-হাড়ে, হাড়ে-কাঠে, পাথরে-পাথরে ঠোকা-ঠুকি করুন, জোরে-জোরে মন্ত্র পড়ে হাততালি মেরে চিৎকার ছেড়ে

হুংকার দিন না কেন, লোকে তখন আর তাঁকে বিশ্বাস করেন না। সবই 'বুজরুকি' বলে ধরে নেয়। এই শ্রেণীর মানুষের লোভ এবং ধূর্তামি গুণিন এবং তাঁদের মন্ত্রকে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন করছে সমাজে। ব্যক্তিগত জীবনেও এর মূল্য দিতে হয়েছে অনেককেই। গুণিনদের নিজেদের বিশ্বাস তাঁরা একজনের ক্ষতি করে অন্যের মঙ্গল করার চেষ্টা করেন বলে তাঁদের সন্তান হয় না অথবা মারা যায়। সেজন্য সন্তান-সন্ততি হবার পর একটু বেশি বয়সে এই ধরনের মন্ত্র শিক্ষা করেন। অথবা ক্ষতিকারক মন্ত্রসমূহ ছাগলের কানে শুনিয়ে দেন, জাগাবার তাগিদ অনুভব করেন না, কিংবা শিখলে বিনষ্ট করেন। সাধারণত এই ধরনের গুপ্ত মন্ত্রগুলি গুণিন তিন রাস্তার মোড়, শ্মশান, কুঁড়েঘর, বাড়ীর নির্জন প্রদেশে থেকে গোপনীয় ভাবে শিক্ষা ও চর্চা করেন। গুপ্ত মন্ত্রসমূহ প্রয়োগ করার সময় গুণিন নানা রকম ভয়াবহ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। তাঁরা সাবধান করে দেন যাতে এই মন্ত্র কেউ না শোনে, না উচ্চারণ করে। নিষেধ না শুনলে তার ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষতি হতে পারে।

আগেকার দিনে গ্রামের গুণিনদের গ্রামের গৃহস্থ চাষীরাই ধান, চাল, টাকা দিয়ে সহযোগিতা করত। এইভাবে বংশানুক্রমিক ভাবে চলে আসে। কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, গুণিনেরা এখন 'গুণিন' অর্থে আর গুণিন বৃত্তি করেন না। গুণিনে ছেলে এখন আর গুণিন হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে দুঃসহ দারিদ্র্যে সে বাধ্যত অন্য বৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, যদিও উত্তরাধিকার সূত্রে শিষ্য বা পুত্র গুরু বা পিতার মন্ত্রের খাতার অধিকার পায়। পূর্বেই জেনেছি, মন্ত্র-তন্ত্র এখন আর বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সর্বস্তরের মানুষ ব্যবহারিক প্রয়োজনে কম-বেশি মন্ত্র শিক্ষা করেন বা চর্চা করেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তন হচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মানুষ যতই যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা শাণিত হচ্ছে ততই গুণিনের-মন্ত্রের প্রতি মানুষের অনাসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন 'টোটকা-চিকিৎসা', 'হাতুড়ে বিদ্যা', বা গুণিনী-ফিকিরি এবং তাঁদের ঔষধ ও মন্ত্রে শুধু কাজ হচ্ছে না, একই সঙ্গে ডাক্তারের ঔষধ সেবনও চলছে। তারপর যেদিন গোটা দেশটাই শহরের রূপ পরিগ্রহ করবে, অর্থাৎ গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেদিন গুণিনের মন্ত্রের অবশিষ্টটুকুও যা গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকে টিকিয়ে রেখেছে, তা মুছে যাবে বলে বিশ্বাস। সুতরাং এখনই যদি সচেষ্ট না-হওয়া যায়, তবে নিপুণ শিল্পীর সূক্ষ্মতম শিল্প গুণিনের এই মন্ত্রসমূহ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

৪ : ২ গুণিন ও জনজীবন

এখন থেকে বহু সহস্র বছর পিছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষের নানা ভাবে বিভক্ত সমাজ কাঠামোটি তখন কিছুটা সংহত হতে শুরু করেছে। সবচাইতে ছোট একই পূর্বপুরুষ জাত গোষ্ঠী হয়েছে এক একটি পরিবার। এরা এক একটি গ্রামে বাস করে। এমনি কয়েকটি গ্রাম হতে হয়েছে একটি বংশ। কয়েকটি বংশ মিলে এক উপজাতি [Tribe]। এবং এই সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে সাধারণভাবে দু-একটি পরিবার একত্রে বসবাস করতে শুরু করেছে। একই এলাকায় একভাবে থাকতে থাকতে তাদের শিকার করে দিন চলত না। যদিও অরণ্য গুহাচারী এবং যাযাবর শ্রেণীর এই মানুষের কাছে যখন শিকার ও আহার জুটেছে অপর্যাপ্ত ভাবে, তখন দল বেড়েছে। কিন্তু যতই দল বাড়ুক—কেউ সারা জীবনে দু-একশর বেশি মানুষকে দেখেনি। আবার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার মতো পরমায়ুও তারা পায়নি। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, আততায়ীর আঘাত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অনাহার, সংক্রামক রোগ ইত্যাদিতে মানুষের অকাল-মৃত্যু ঘটেছে। এরই মধ্যে যে একটু বেশি সময়ের জন্য বেঁচে যেত, স্বাভাবিক কারণে তার অভিজ্ঞতা বেশি। যে কোনও প্রয়োজনে, আপদে-বিপদে তার কাছে সবাই আসত, পরামর্শ চাইত। কিভাবে সে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করেছে, ছেলে মেয়েদের কিভাবে মানুষ করেছে, লতা-পাতা-গাছ-গাছড়া বা বস্তু ও পদার্থে কিভাবে রোগ সারিয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করেছে ইত্যাদি নানা অভিজ্ঞতার কথা বলত, শুনত এবং পরামর্শ দিত। এইভাবে অভিজ্ঞতা বিতরণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে-করতে সমাজে প্রাচীনরাই বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ও মান্য হয়ে ওঠে। যুক্ত পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে এদের কথা সকলকে শুনতে হতো। সমাজে এই প্রধানরাই নিজেদের থেকে শক্ত সামর্থ্য বুদ্ধিমান দেখে একজনকে নেতা বা সর্দার তৈরি করেছে এবং তার হাতেই তুলে দিয়েছে সমাজের সমস্ত কর্তৃত্ব। সুতরাং প্রভাব প্রতিপত্তিতে সে প্রবল হয়ে ওঠে, সমাজে বা গোষ্ঠীর মধ্যে নানা বিষয়ে বিধান দেবার অধিকার অর্জন করে। শিকার করার কৌশল, অন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বা সম্পর্ক স্থাপন, কখন কোন স্থান ত্যাগ করতে হবে, কোথায় গিয়ে বসবাস করতে হবে, দলের শৃঙ্খলা রক্ষা, শাস্তি বা শান্তি স্থাপন ইত্যাদি সবই করে সে। সকলে তাকে ভয় ভক্তি ও মান্য করতে বাধ্য হয়। তাকে আর অন্যান্যের মত শ্রমে শক্তিক্ষয় করতে হয় না। এমনকি বনে প্রান্তরে পশুর পিছনে না-ছুটেও মাংসের ভাগ পায়। কালক্রমে এই সর্দার বা দলপতিই দেবতার প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাকে আধ্যাত্মিক নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। ইনিই আদি পুরোহিত [Shaman] বা ওঝা [witch doctor]। প্রকৃতির হাতে অসহায় ক্রীড়নক সমস্ত মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক, শক্তি-সাহস ও উদ্দীপনার আশ্রয়স্থল। গুণিনদের উৎস সন্ধানে ঐতিহাসিক পটভূমি হলো এই। এই সূত্র ধরে আমরা আরো দেখতে পাই—সমাজ ও ধর্মের নিজস্ব প্রয়োজনে গুণিনের উদ্ভব হয়েছে। যদিও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রাথমিক পর্বকে বলা হয় আদিম সমাজভুক্ত মানুষের ন্যায়-

অন্যায় কিংবা ভালো-মন্দ বোধের সমন্বয়, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে সাধারণ বুদ্ধি [Sense] ও জ্ঞান [Science]। কালক্রমে বিকাশের ধারায় মানুষ যথাক্রমে বন্য-বর্বর-সভ্য এই তিনটি প্রধান স্তর পর্যায়কে পেরিয়ে এলেও কিংবা তার বুদ্ধিবৃত্তিগুলি আরো সুসমুন্নত হয়ে উঠলেও প্রত্ন-প্রপিতামহদের উত্তরাধিকার হিসেবে উত্তর কালের প্র-সন্ততিদিগের মনের আরণ্যক গহনে কিছু কিছু আদিম সংস্কার ও বিশ্বাস 'ফসিলাইজড' হয়ে থেকে গেছে। ব্যবহারিক জীবনে নানা টানা পোড়েনে যখন মানুষ সেন্স ও সাইন্সের সমন্বয় করতে সক্ষম হয়নি, অনাগত আশঙ্কায় হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত, তখনই যুগে যুগে বিভিন্ন সময়ে মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে গুণিন বা ওঝাদের কাছে। গুণিন বা ওঝা পদবাচ্য 'আদিপুরুত' ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অধীত বিদ্যার সাহায্যে প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত শক্তির আহ্বান করেন। উক্তশক্তি তার উপর,'ভর' বা 'আসর' করলে অথবা উক্ত শক্তিকে তিনি বাধ্য করেন ঘটনা চক্রকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। তাঁর সাফল্য পরিপার্শ্বস্থ মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস বা বাধ্যবোধকে সঞ্জীবিত করে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনই সমাজে গুণিনদের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছে। বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব দূর করা থেকে শুরু করে উপকারক বস্তু এবং ভবিষ্যৎ কথন ইত্যাদি মানব জীবনের সব দিকেই তাঁদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

সাধারণ ভাবে গুণিনেরা যে যাগ-যজ্ঞ বা ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তার দুটি দিক বর্তমান—

ক. রক্ষাকারক খ. ক্ষতিকারক।

রক্ষাকারক ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে অশুভ, বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে অপসারণের প্ররোচনা করা হয়—যা মানুষের সব সময় ক্ষতিকারক চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—অপরের সন্তোষ বিধান। অপরদিকে ক্ষতিকারক ক্রিয়ানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যদিও একই মঙ্গল কামনা, কিন্তু তা পরিচালিত হয় অন্যের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে। লক্ষ্যের এই সাধারণ বিষয়ে 'মাত্রা'—সংযোজিত করার ফলে জীবন কোনো দিনই সহজ সরলভাবে এগিয়ে চলেনি। যদিও মানুষ যৌথ সমবায়িক জীবনে একে অপরের সহযোগিতার মূল্য বুঝেছে। তবুও ঈর্ষা, বৈরীভাব, ঘৃণা, অপরের উপর কর্তৃত্ব করবার স্পৃহা সকল যুগের মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ফলে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য আকার ধারণ করে। বলা যেতে পারে, আদিম গুহা-মানব যেদিন চাষবাস শিখে নিজের জমিতে পাকা বাসিন্দা হয়েছে, সেদিন হতেই স্বত্ব বোধ থেকে লোভ, কাড়াকাড়ি, হানাহানি, সংঘর্ষেরসূত্রপাত। কেউ কারুর অভীষ্ট সিদ্ধির পথে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ালে শত্রুতে পরিণত হয়, আবার অপরের ভালো যে দেখতে পারে না, অসূয়াপরায়ণ সেই-ই সকলকে ঘৃণা করে। লোকে তখন তার শত্রুতে পরিণত হয়। এইভাবে দুপক্ষই একে অপরের ধ্বংস কামনা করে। এইরকম ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা দলের হয়ে গুণিন যাগ-যজ্ঞ, অভিচার-ক্রিয়াদি প্রয়োগ করেছেন সেও চিন্তা করছে তার পূর্বোক্ত শত্রু একই সঙ্গে একই রকমের কিংবা তার চেয়েও বড় রকমের ক্রিয়া-করণাদি প্রয়োগ করছে, এমনকি নিজেকে পাকাপাকি ভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে। এ-জাতীয় প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা—সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যার সহায়, শক্তি, সামর্থ্য বা কৃচ্ছ্র সাধন যত বেশি সেই-ই বেশি সাফল্য

অর্জন করে, জয়ী হয়। নিজের ভাল ও মঙ্গল বিধানের জন্য অন্যের ক্ষতি সাধনে লজ্জা সংকোচ না থাকা--এতে নৈতিকতাব কোনো প্রশ্ন তখন মূল্য হয়ে দাঁড়ায় না। আনুষ্ঠানিক এই সংস্কারগত তাৎপয মাত্র শত্রু-ধ্বংস অথবা প্রতিস্পর্ধী অন্যান্য বিষয়ের প্রতিবোধ কল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, গুণিন সমাজে এর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। যা আমার কাছে গর্হিত, দুর্নীতি অন্যত্র তার বিপরীতটাই ন্যায়। গুণিন এখানে মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালন করেন মাত্র। তাঁর একদিকে ব্যক্তি তথা বাস্তব পৃথিবী, অপরদিকে অলৌকিক নৈর্ব্যক্তিক স্তর, মাঝখানে গুণিন যেন সেতু, যার উপর ভব কবে অনায়াসে এপার ওপাব করা যায়।

শুধু মানুষই কি মানুষের শত্রু? সাধারণভাবে এমন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। উত্তর হলো, যারা অভিচারাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, কাউকে শত্রুতা বা ঘৃণা করে পূর্ণ আয়ুষ্কালকে কমিয়ে দেবার চেষ্টা করে, তারা সকলেই শত্রু পদবাচ্য। আবাব মানুষ শত্রুর মতো দানবিক জগতের অধিকারী, প্রকৃতি ও পার্থিব জগতের নানা প্রকার ঘটনা, ঘটনাতে কারণের নিয়ন্ত্রণকারী, রোগ-শোক-পাপ-মৃত্যু—এ সবই এর মধ্যে পড়ে। সমাজের আদিম স্তবে মানুষের ধারণা ছিল আত্মা-বস্তুর সাময়িক অনুপস্থিতিই বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কারণ, এবং এটা সংঘটিত হয় অপদেবতাদেরই তাড়নায়। এদের অস্তিত্ব সর্বত্র। মানুষের আবাসস্থল, গমনাগমনের পথ সর্বোপরি মানুষকেই ঘিরে তাদের অবস্থিতি। অপদেবতাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারলে আত্মা-বস্তু যথাস্থানে ফিরে আসবে। এরই ফলে রোগ-ব্যাধিরও অবসান ঘটবে। আর ব্যাধি-মৃত্যু, পাপ-মুক্তির জন্য প্রতিকারগুলি বিশেষ বিস্তার লাভ করেছে বিভিন্ন গাছ-গাছড়া-লতা-পাতা-শিকড বা ভেষজের প্রয়োগ, বস্তু ও পদার্থ ইত্যাদি ধারণ বিধির বিনিয়োগে। সৎ এবং অসৎ যে উদ্দেশ্যেই গুণিনকে ব্যবহার করা হোক না কেন তাঁর একান্ত গভীর তপস্যা, উৎসর্গ ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে 'গুণিন-বিদ্যা' অর্জন করেছেন, তার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো আত্মরক্ষা বা আত্মোন্নতি। যদিও তা সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হয়নি, সম্ভবও নয়। কারণ, জনগণের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রাকে মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা, আভিচারিক তথা শত্রু সম্পর্কিত যে কোনো শক্তি অথবা দেবতা তাঁর বিরুদ্ধতা করলে অনায়াসে তাদের পৃথিবী থেকে তাড়াবার ক্ষমতা রাখেন। আর সেই একই সঙ্গে ক্ষমতা রাখেন মানব জীবনকে সুন্দর, সুখময়, ব্যাধি, পাপ এবং আঁধিমুক্ত করে দীর্ঘজীবী করার।

যথাক্রমে জাদু, ভেষজ ও যাগযজ্ঞ—গুণিনের প্রধান অবলম্বন বা স্বাতন্ত্র্যতায় একে অপরের তুলনায় বিচ্ছিন্ন হলেও গুণিন তাঁর বিদ্যা বিনিয়োগের সময় পরস্পরের সাহচর্য ঘটিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। রোগ-চিকিৎসার ক্ষেত্রে মন্ত্র প্রয়োগে কুহক বা অলৌকিকতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার একটা কার্যকরী ভূমিকা আছে। এরই সঙ্গে গুণিন যে ঔষধ ব্যবহার করেন তা প্রস্তুত করতে আশ্রয় নেন বিভিন্ন গাছ-গাছড়া-লতা-পাতা-শিকড়-জল, বিভিন্ন বস্তু ও পদার্থ। যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় ব্যক্তিগত অথবা নৈর্ব্যক্তিক যে কোনো প্রয়োজনে। এই ত্রিবিধ বিষয় বা উপাদান অর্থাৎ জাদু ভেষজ ও যাগযজ্ঞ একই সঙ্গে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার প্রয়োজনানুসারে যে কোনো দুটি অথবা একটি বিষয় ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদের দেশের যে কোনো মন্দির, মসজিদ-দরগা যা

প্রভৃত পবিত্র স্থান বলে প্রসিদ্ধ এ সব স্থানের পুরোহিত একই সঙ্গে পুরোহিত বা সেবায়েত ও গুণিনের ভূমিকা পালন করেন। নানা প্রকার শুভাশুভ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথন, বোগ-ব্যাধি প্রতিকারের জলপড়া. মাটি পড়া, লতা-পাতা, শিকড়-বাকড়, কবচ-মাদুলির ব্যবস্থা দেন, শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ, ডাইনীর প্রকোপ, বাণমারা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রতিকাবের প্রার্থনায় অন্যান্য বিষয়েব চেয়ে গুণিন-ওঝাদের পরামর্শই চূড়ান্ত বলে লোকায়ত মানুষ আজও বিশ্বাস করেন। গুণিন-বিদ্যার গুণিনরা গণনা করে বলে দেন কোন কোন বাড়িতে রোগ-ব্যাধি কেন ও কিসের জন্য হচ্ছে অথবা ছাড়ছে, কেনই বা ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক্ দিনের পর শিশু মারা যাচ্ছে, মৃত্যু বা রোগ-ব্যাধি পূর্ব জন্মের পাপ কিনা, বাস্তু ভিটার দোষ আছে কিনা ইত্যাদি নান বিষয় জেনে প্রতিকারের ব্যবস্থা দেন। নতুন করে ঘর-বাঁধবার সময়, মামলা-মোকদ্দমায় জেতা, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাশ, কোষ্ঠী বিচার, সুখ প্রসব ইত্যাদি সমস্ত কিছু জেনে বলে দেন। গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন গাছটি কাটবার সময়ও গুণিনের পরামর্শ আবশ্যক হয়ে পড়ে। উক্ত গাছ-কাটলে যদি কারুর কোনো ক্ষতি হয়, তাই কেউ বাণ মারলে তা কাটান করার চেষ্টার সঙ্গে প্রয়োজনে তার কণ্ঠরোধ করে দিতে পারেন গুণিন। নানা বিষয়ের জন্য নানা রকমের মন্ত্র ও এই সব বিচিত্র মন্ত্রের সঙ্গে গুণিন বিচিত্র দ্রব্যও ব্যবহার করেন। গুণিন সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করেন যার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে মানুষের। সমাজে প্রচলন নেই, মানুষ ব্যবহার করে না এমন কোনো কিছুই গুণিন প্রয়োগ করেন না। জল পড়া, তামাক পড়া, নুন পড়া, সরিষা পড়া, চুনপড়া, কাঁসা পড়া, গামছা পড়া, আরশি, মুড়কি এগুলির মধ্যে অধিকাংশই মন্ত্রপূত করার পর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরশি লাগে বশীকরণ মন্ত্রে। কাঁসার থালা-রাটি মন্ত্রপূত করে কাটিয়া বা দংশনে জর্জরিত রোগীদের পিঠে বসিয়ে দেওয়া হয়. উপসর্গ বা ভূতে পাওয়া রোগীদের মন্ত্র চিকিৎসা করার সময় ইঁদুরের মাটি, কামাখ্যা মাটি, শ্মশান মাটি, লাউয়ের বস, সরিষা ইত্যাদি লাগেই। আবার পাকস্থলীর বিষ বার করার জন্য গুণিনরা হুঁকোর জল, গোময়-জল, তেঁতুল গোলাজল, পায়খানা মিশ্রিত জল, জুতো ধোয়া জল, কেঁচোর জল ইত্যাদি মন্ত্রপূত করে রোগীকে খেতে দেন। এই সমস্ত মন্ত্রে অতিশয় অশ্লীল শব্দের বাহুল্য দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত জটিল ও দীর্ঘ রোগের চিকিৎসা করার সময় অবশ্য গুণিন যেসব দ্রব্য বা পদার্থ ব্যবহার করেন, তা শুধু দ্রব্য ও প্রকরণ বৈচিত্র্যে শুধু নয়, একটু ভয়ঙ্করতার ছায়াপাত ঘটাতে সচেষ্টা হন। বিভিন্ন বাণ কাটা গাঁটুলি কাটা মন্ত্র প্রয়োগের সময় দ্রব্য ও প্রকরণ এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে গুণিনের নির্দেশ মানুষকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। দ্রব্য ব্যবহার বৈচিত্র্য সঞ্চারী হলেও এর সঙ্গে গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা বা বিশেষ ধাতু ও পদার্থের অনুপানের ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনই রোগ বিশেষে চিকিৎসার সময়, তিথি, বার ইত্যাদিও জরুরি। কারণ সঠিক পালিত না হলে রোগ নিরাময়ের সাফল্য সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়, অধিকন্তু ত্রুটিপূর্ণ আয়োজনের জন্য রোগীর পারিবারিক জীবনে অশুভ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে বলে বিশ্বাস। যদিও সাপের বিষ চিকিৎসার জন্য কোনো সময়-তিথি-বার মানা হয় না।

প্রাচীনতম মানুষের শিকার-জীবনে দেখতে পাই—পেটের দায়ে জন্তুদের তাড়া করে

ফিরেছে, শিকার সহজে মিলবার জন্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান ইত্যাদি করছে। সেই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো—অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশুর আত্মাকে তুষ্ট করা, যাতে সে সহজে ধরা দেয়, স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি হয়, এমন কি সেই আত্মা যাতে ফিরে এসে শিকারীকে অনিষ্ট না করে তার ব্যবস্থা করা। শিকারীর দৃষ্টিতে এই অনুষ্ঠান তথা জাদু মন্ত্র বর্শার মতোই আবশ্যিক অস্ত্র। ঠিক এমনই চিত্র সংঘটিত হয় সুন্দরবনে। বিশেষ করে যারা সুন্দরবনের গহন অরণ্যে কাট-মাছ-মধু-মোম-লতা-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ বা শিকার করতে যায়, তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায় বিশেষ এক শ্রেণীর গুণিনকে। আঞ্চলিক ভাষায় তাঁরা 'বাউলে' বা 'বাব্‌লে', 'মউলে', 'ওস্তাদ', 'সাঁইদার' ইত্যাদি নামে পরিচিত। এঁরা বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তুক-তাকের মাধ্যমে শিকার সংগ্রহ কিংবা আরণ্যক জীবন সহজ ও স্বস্তিদায়ক করে তোলেন, দলের শৃঙ্খলা সহ সকল রকম নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টা করে। ইনিই দলের দলপতি। এঁর কথাই চূড়ান্ত কথা। এঁর নির্দেশই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হয়। এখানে লক্ষণীয় এই গুণিন-বাউলেরা বা তাঁর সাঁইদারেরা জঙ্গলে যে ভূমিকা পালন করেন, যে আচার-আচরণ, বিধি-বিধান পালন করেন তা 'সয়ালে' অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রচলিত সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে এক নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা 'জঙ্গল করতে' বা 'মহল-করতে' যায়, তাদের 'জঙ্গলের আইন' মানতেই হয়। সমাজের আইন জঙ্গলের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অচল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আদিম দ্বন্দ্বে গোষ্ঠীবদ্ধতাই বড় কথা। একক ভাবে এক মাত্র দলপতি বা ওস্তাদ কিংবা বাব্‌লে ব্যতিরেকে সেখানে অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ কম, সে প্রচেষ্টাও কঠিন। অবশ্য বাব্‌লে মাত্র হুকুম-নির্দেশ প্রদান করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন না। তাঁকেও সবার সঙ্গে সমান ভাবে চলতে-ফিরতে হয়, একই খাবার এবং বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, সমস্ত রকম কাজে কম-বেশি অংশগ্রহণ করতে হয়। আবার জঙ্গলের কাজ শেষ করে যখন জনপদে ফিরে আসনে সবাই, তখন ওস্তাদ বা দলপতির অলাদা কোনো মর্যাদা নেই। সমাজের নিয়ম কানুনই আসল কথা। পাঁচ জনের মতো তিনি এবং তাঁর দলের সকলেই তা মানতে বাধ্য থাকেন, সমাজ স্বীকৃত প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা বলেন। কিন্তু এই সময়ই দ্বন্দ্বটি দেখা দেয় একটি নতুনরূপ নিয়ে। কারণ অরণ্যই অরণ্যের শেষ কথা নয়। সে তার কাছাকাছি অঞ্চল বা এলাকাকে প্রভাবিত করবেই। বলা বাহুল্য, সুন্দরবন অরণ্য এবং তার অরণ্য অধ্যুষিত সমাজ-জীবন, ধর্মীয় জীবন, সাংস্কৃতিক তথা অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গেছে। এখানকার মানুষকে নিরন্তর শ্রমের সঙ্গে বুদ্ধির আপেক্ষিক সমন্বয় ঘটিয়ে ক্রমাগত প্রতিকূল শক্তির সংগ্রামে মুখোমুখি হতে হয় বলেই বিচিত্র টানাপোড়েনে এদের সংস্কার ও বিশ্বাসগুলিও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। ফলে বাউলের হুকুমকে যেমন এঁরা সহজেই মেনে নেন, তেমনি গুণিন-ওঝাদের হুকুমও মেনে নেন। যে বাউলে-গুণিন জঙ্গলে মন্ত্রের সাহায্যে বাঘ তাড়ান, বাঘ-সাপ-কুমিরের মুখ-দাঁত-নখ বন্ধ করেন, নদী বন্দ করে সাঁতরে ওপারে গিয়ে ওঠেন, জ্বালান-খিলেন মন্ত্র প্রয়োগ করেন, পাড়াবন্দ করেন তিনিই অথবা তাঁরই মতো অন্য আর একজন গুণিন-ওঝা বিপরীত ভাবে সমাজে গ্রাম প্রচলিত বা লোক প্রচলিত বিধি-বিধান সংস্কার ও বিশ্বাসের সমানুপাতিক দৃষ্টিতে মন্ত্র প্রয়োগ করেন ও ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করেন। কৃষি-সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্ম, মারণ-উচাটন-

বশীকরণ, নানারকম রোগ-ব্যাধি দূরীকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণ, সম্পত্তি রক্ষা, নৌকা চালন, ভ্রমণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যক্তি কিংবা ব্যষ্টি-বিশেষের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অনুষ্ঠান করেন ও মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করেন। এ যেন খানিকটা সমাজ স্বীকৃত প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে প্রেরণা স্বরূপ এবং বিপরীত ক্রমে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ উপাদান হিসেবে পরিগণিত।

প্রাচীনকাল থেকেই গুণিন-বিদ্যার চর্চা ও অগ্রগতির ফলে মানুষের জীবনে গুণিন, গুণিনের মন্ত্র ও মন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত বস্তু-দ্রব্য-পদার্থ এখন যে শুধু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে তা নয়, এ জীবনেরই অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। এই সব বিষয় গুলো যতই জীবন থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করি না কেন, আমাদের অজান্তেই আমাদেরই মন কখন যেন এর আশ্রয়ে এসে দাঁড়ায়। এই গুণিনী বিদ্যার অগ্রগতির ফলে পরোক্ষভাবে বহু পণ্ডিত ও গুণী তাঁদের কাজে সাফল্যে অর্জন করেছেন। এঁদেরই কেউ জ্যোতিষী বা ভবিষ্যদ্বক্তা, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, গুণিন বা ওঝা, বাব্‌লে, পুরোহিত-সেবায়েত, পীর-ফকির বাবা, গুরু-বাবা কিংবা ওস্তাদ-সর্দার। এঁরাই সেই আদিম সংস্কৃতি থেকে বর্তমান স্তর পর্যন্ত কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক বিধি-বিধান অনুধাবন করে বুদ্ধির জোরে, জাদু ও অলৌকিক শক্তির সহায়তায় নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে গোষ্ঠী ও সমাজে জানান দিয়ে আসছেন। বর্তমানে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে বস্তু বা ক্রিয়ার পারম্পর্য সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, যুগ যুগ ধবে সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে অলৌকিক সংঘটনের বিশ্বাসটুকু মনে অনড থেকে গেছে। শ্রেণী-সমাজ গড়ে উঠবার পর সমাজের নিয়ন্ত্রণ যে ওপর তলার মানুষের হাতে মজুত হয়েছিল বহু শতাব্দী অতিক্রমণের পরও সেই পুঁজি ফুরিয়ে যায়নি। ধর্মের মাধ্যমে মানুষকে দাবিয়ে রাখতে কিছুটা আত্মরক্ষারই স্বার্থে বৃহত্তর জনজীবনের অন্তরের জিনিস যা পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বলে গণ্য, তার মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্নতা, অন্ধ বিশ্বাস, এমনকি পশ্চাৎমুখিনতা যদিও থেকেই থাকে, সমাজ বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক গতিতে তা সমন্বয়-সংশ্লেষণে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। এতে উপর তলা বা নীচের তলা কে হেরে গেছে বা কে জয়ী হয়েছে সেটা বড় কথা নয়। সামগ্রিকভাবে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কিছুটা শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে স্বস্তি সাহস ও প্রেরণা যে পেয়েছে সে বিষয়ে দ্বিমতের কোনো কারণ নেই।

১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৮৬ সালের জুন মাস—এই আটমাসের বিভিন্ন সময়ে আমরা সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামের মানুষদের কাছে যাই, কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও সেই আদিম অবস্থার পর্যায়ে পড়ে থাকার দরুন সুন্দরবন পশ্চাৎপদ এলাকা রূপে চিহ্নিত। সমীক্ষার জন্য তাই আমরা বিশেষ কয়েকটি গ্রামকে বেছে নিই। গ্রামগুলি যথাক্রমে গোসাবা ব্লকের রামনগর, হরিশপুর, কচুখালি, গোসাবা সাতজেলিয়া, ছোটমোল্লাখালি, রাধানগর গ্রাম ; সন্দেশখালি ব্লকের আতাপুর, ধুচিনী খালি, হাটগাছা গ্রাম ; হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের যোগেশ গঞ্জ, মাধবকাটি ; হাসনাবাদ ব্লকের পূর্ব খেজুরবেড়িয়া, রূপমারী ; জয়নগর ব্লকের গাববেড়িয়া গ্রাম ; কুলতলি ব্লকের ডোঙ্গাজোড়া গ্রাম এবং বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী মিলে ১৭টি গ্রাম। নিম্নলিখিত প্রশ্নমালার পরিপ্রেক্ষিতে

আমাদের সমীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে ৫০০ জনেরও বেশি পুরুষ ও স্ত্রী।

প্রশ্নগুলি হলো :

ক. এক বা একাধিক গুণিনকে ব্যক্তিগতভাবে জানি।

খ. গুণিনের মন্ত্রে বিশ্বাস করি।

গ. মন্ত্রে সুফল পাওয়া যায়।

ঘ. মন্ত্রে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না।

ঙ. গুণিনেরা কখনই জোর করে প্রভাব খাটান না।

চ. গুণিনের কথামত কাজ না করলে অসুবিধার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ছ. অসুখ বা কোনো সমস্যায় পড়লে আগে ডাক্তারকে ডাকব।

ঝ. অসুখ বা কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য গুণিন এবং ডাক্তার উভয়কেই ডাকব।

ঞ. গুণিনদের ক্রিয়া কলাপের মধ্যে অনেকটাই মিথ্যার আবরণ আছে।

সুন্দরবন এলাকায় নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগী বা পেশায় নিযুক্ত মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। তবুও মোটামুটি ভাবে আমাদের আওতায় আছেন কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, কামার, কুমোর, চর্মকার, বিড়ি কারিগর, ঘরামি, মাঝি, দোকানদার ও কিছু সংখ্যক চাকুরে প্রভৃতি। মোট চার ভাগের আড়াই ভাগ তপসিলী এবং আদিবাসী উপজাতি, ১ ভাগ মুসলমান এবং আধভাগ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের মধ্যে ছাত্র, গ্রামীণ রাজনৈতিক কর্মী ও গৃহিণী আছেন। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে প্রত্যেকেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বা চাষী-মজুর। কাউকে সরাসরি প্রশ্ন করেছি, আবার কারুর কাছ থেকে গল্প করতে করতে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে! পূর্ব হতে কোনো খবর দেওয়া বা উদ্দেশ্যের কথা আমরা কাউকে জানান হয়নি। প্রশ্ন শুনে এড়িয়ে যাওয়া, উল্টোপাল্টা উত্তর অথবা গভীরে না ঢুকে নিরীহভাবে প্রশ্ন কর্তাকেই সমর্থন করা, কিংবা সন্দেহের চোখে দেখা ইত্যাদি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে বেশি। এরই মধ্য থেকে উত্তরদাতা বা শ্রোতার মানস প্রবণতা অনুযায়ী যেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে তার সামগ্রিক ছক নীচে দেওয়া হলো—

এখানে নিরক্ষর অর্থে যাঁরা টিপ সই দেন, লিখতে পড়তে পারেন না। স্বাক্ষর বলতে বুঝানো হয়েছে যাঁরা লিখতে পারেন এবং কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারেন। বাকিদের শিক্ষিত ধরা হয়েছে।

৫০০ জন পুরুষ এবং স্ত্রীকে বয়স অনুসারে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	বয়স	পুরুষ			স্ত্রী			
সংখ্যা		নিরক্ষর	স্বাক্ষর	শিক্ষিত	নিরক্ষর	স্বাক্ষর	শিক্ষিত	
১	১২-২২	১৫	১৫	১০	২০	২০	১০	
২	২২-৪২	৩৫	৩৫	২০	৩০	৩০	২০	
৩	৪২	৫০	৫০	২০	৫০	৫০	২০	
সর্বমোট		১০০	১০০	৫০	১০০	১০০	৫০	৫০০

বয়স বিভাজনের সময় আমরা মানসিক স্তরটাকেই প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেছি—সেটা

আগের ছক থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে ঠিকই ; তবে ১২ থেকে ২২ বছরের মধ্যে বয়স রাখার কারণ—এই সময়ের মধ্যে সুন্দরবনের গ্রামের অধিকাংশ ছেলে-মেয়েদের সংসার জীবনে যাবার জন্য প্রস্তুতি চলে, বিশেষ করে মেয়েদের। তাছাড়া বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি অতিক্রম করার পর যৌবনাগমে পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে বা নিজের থেকে বলার ব্যাপারেও নিজস্ব কিছু মতামত গড়ে উঠতে থাকে। ২২ থেকে ৪২ বছর বয়সের সময় চলে মানুষের পুরোপুরি সংসার-জীবন। এই সময়কার অভিজ্ঞতা মানুষকে পূর্ণতা দিতে সাহায্য করে। মানুষ নিজের মতামত সম্পর্কে অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়। এরপর থেকেই তো পৌঢ়ত্বের আয়োজন। সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ নিজেই এক একজন শিক্ষক। তাঁর বক্তব্যের মূল্য তখন অনেক বেশি। পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় বিভাগে সমান সংখ্যক লোক থাকলেও ক্রমিক সংখ্যা ১নং স্তরে স্ত্রী এবং ক্রমিক সংখ্যা ২নং পুরুষ সংখ্যা বেশি নেওয়া হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা ৩নং স্তরে এসে আবার উভয় বিভাগে পুরুষ এবং স্ত্রী সমান সমান নেওয়া হয়েছে। এই ৫০০ জন পুরুষ এবং স্ত্রী পূর্ব উল্লিখিত ১০টি প্রশ্নের অনুকূলে বা প্রতিকূলে যে রায় দিয়েছেন তার ফলাফল নিম্নের ছকে দেখান হলো :

প্রশ্নমালা	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
পুরুষ	৮৫	৪৫	৪৫	৬০	৩০	৩০	৪০	৬০	২৫	৬৫
স্ত্রী	৮৫	৬৫	৬৫	৪০	৭০	৭০	৫৫	৪০	৭৫	৩৫

৫০০ জনের মধ্যে 'ক' থেকে 'ঞ' পর্যন্ত প্রশ্নমালার উত্তরাধিকারীদের শতকরা হিসাব। এই ছকের প্রত্যেকটি সংখ্যাই হলো এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৫ ভাগের ১ ভাগ ধরতে হবে।

অতঃপর সংক্ষেপে, উত্তর প্রদানকারীদের মতামত বর্তমান ছকের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক. এক বা একাধিক গুণিনকে ব্যক্তিগতভাবে জানি :

দেখা যাচ্ছে, পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই সমান সমানভাবে গুণিনদের জানেন বা তাদের সঙ্গে পরিচয় আছে।

খ. গুণিনের মন্ত্রে বিশ্বাস করি :

এই প্রশ্নের প্রতিকূলে রায় দিয়েছেন প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৪৫ জন পুরুষ। কিন্তু অনুকূলে মতামত ব্যক্ত করেছেন শতকরা ৬৫ জন মহিলা। কারণ : ১. পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারতা। ২. বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ তুলনামূলক ভাবে পুরুষের চাইতে ন্যূনতম হওয়ায় নারী সাংসারিক পারিবারিক—পৃথিবীর মধ্যে নিজস্ব আরেক পৃথিবী বানিয়ে নেয়। ফলে স্বভাবের ভিতর রক্ষণশীল সংস্কার-প্রীতি প্রশয় পায়।

গ. মন্ত্রে সুফল পাওয়া যায় :

'খ' নং প্রশ্নের সঙ্গে বর্তমান 'গ' নং প্রশ্নের অন্তর্লীন মিল থাকায় উত্তরও প্রায় একই পাওয়া গেছে। তবে প্রতি ১০০ জনের ৪৫ জন পুরুষ মনে করেন কেবলমাত্র মন্ত্রে সুফল পাওয়া যায় না। গুণিন বা মন্ত্রের সঙ্গে যে সমস্ত শিকড়-বাকড়, ঔষধ-পত্র খেতে দেন ও

নানা প্রকার বস্তু বা পদার্থ ধারণ করতে বলেন, মন্ত্রের সাফল্য তারই মধ্যে নিহিত। অপবদিকে মহিলাদের গুণিনের মন্ত্রের সুফল সম্পর্কে বিশ্বাস পুরুষের তুলনায় বেশী। কারণ তাদের সংযম, একনিষ্ঠতা ও ধৈর্য পারতপক্ষে বেশি থাকায় কোনো কিছু সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না বলেই গুণিনের মন্ত্রের সুফল সম্পর্কে আস্থা রাখেন।

ঘ. মন্ত্রে সব সময় সুফল পাওয়া যায় না :

'গ' নং প্রশ্নের ঠিক বিপরীত প্রশ্ন বর্তমান 'ঘ' নং প্রশ্নটি, এই প্রশ্নের উত্তর 'গ' নং উত্তরে দেওয়া আছে।

ঙ. গুণিনরা কখনই জোর করে প্রভাব খাটান না :

এই প্রশ্নের সমর্থনে শতকরা ১০০ জন পুরুষের মধ্যে মাত্র ৩০ জন মতামত ব্যক্ত করেছেন। সে-তুলনায় মহিলা সমর্থনকারীর সংখ্যাই বেশি। আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষায় ধরা পড়েছে—গুণিনরা যেসব ক্রিয়াচার, বিধি-বিধান, ধারণ-ভক্ষণ ইত্যাদি করতে বলেন তা অনেক সময় বাড়াবাড়ি বা অতিরিক্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়, যা কিনা আরোপিত প্রভাবকেই সমর্থনের অনুকূলে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। কিন্তু মহিলারা ঐতিহ্যানুসারী বিষয় ভেবে, সরাসরি স্বীকার করার ফলে, আরোপিত মাত্রার অনুপাত অনুমান করতে পারেন না।

চ. গুণিনের কথামত কাজ না করলে অসুবিধার সম্ভাবনা থেকে যায় :

ছক অনুসারে এখানেও পুরুষ শতকরা হিসেবে কম হবার কারণ হলো, মন্ত্রের প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ না থাকা। যাদের মন্ত্রের প্রতি আস্থা আছে তারা সাফল্যের সম্ভাবনায় গুণিনী প্রকরণ-প্রক্রিয়া যথাযথ মানতে চেষ্টা করেন।

ছ. অসুখ বা কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে আগে গুণিনকেই ডাকব :

দেখা যাচ্ছে, শতকরা ১০০ জন মহিলার মধ্যে ৫৫ জন আগে গুণিনকে ডাকার পক্ষপাতী। কারণ গুণিনের চিকিৎসায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। এজন্য অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এমনকি উপকরণেরও বাহুল্য খুবই কম। তা ছাড়া গ্রামে ডাক্তার পাওয়া যায় না। যাদের পাওয়া যায় তারা হলেন 'কোয়াক ডাক্তার'। তা কোয়াক ডাক্তার ঔষধপত্র দেন আবার মন্ত্র চিকিৎসাও করেন।

জ. অসুখ বা কোনো সমস্যায় পড়লে আগে ডাক্তারকে ডাকব :

'ছ' সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরদাতার বিপরীত অর্থাৎ পুরুষের সংখ্যাই বেশি—যারা ডাক্তার আনার পক্ষপাতী। কারণ ১. গুণিনী অনুমান প্রসূত চিকিৎসা। গুণিনেরা আন্দাজেই ঢিল মারেন বা চিকিৎসা করেন। ২. ডাক্তারবাবু শিক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণায় পুষ্ট। তিনি লক্ষণ বুঝে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঔষধ দেন বা চিকিৎসা করেন। এতে করে তিনি রোগের অনুকূলে বা প্রতিকূলে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন যা গুণিনেরা কখনই পারবেন না।

ঝ. অসুখ বা কোনো সমস্যা-সমাধানের জন্য গুণিন বা ডাক্তার উভয়কেই ডাকব :

মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের মানসিক প্রবণতা বা ঝোঁক পুরুষদের তুলনায় অনেক পরিমাণ বেশি। তাঁদের প্রথম কথা—রোগ নিরাময় বা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান। এর জন্য প্রয়োজনে গুণিন, ডাক্তার প্রত্যেককেই ডাকতে তাঁরা ইতস্তত করেন না। মহিলারা

সব কিছুকেই সমানভাবে গুরুত্ব দেন। ফলে নির্দিষ্ট করে কাউকে ছাড়তে বা ধরতে পারেন না--উভয়কেই হাতের কাছে মজুত রাখা চাই। কোনো ক্ষত না হয় ডাক্তার সারালেন, কিন্তু ক্ষত স্থানে বাণ মারলে তখন তো গুণিনের প্রয়োজন পড়বেই। পুরুষের এই মানস প্রবণতা কম থাকায় তাঁদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে ন্যূনতম।

এঃ. গুণিনদের ক্রিয়া কলাপের মধ্যে অনেকটাই মিথ্যার আবরণ থাকে :

গুণিন বিদ্যার মধ্যে কুহক-ভেল্কি, ইত্যাদির প্রভাব থাকায়, ভবিষ্যৎ কথন বা 'ভর' হওয়া প্রসঙ্গ থাকায়, এমন কি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত বা জাহির করবার জন্য এমন সব অতিরিক্ত বিষয় উপস্থাপনা করেন যা দেখে মানুষ স্বভাবতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং নিজের যুক্তি-বুদ্ধির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে গুণিনের তৈরি পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের কাছে ধরা দিতে বাধ্য হয়। গুণিন বলেন--বিষ নেই, তো বিষ নেই! রোগীও গুণিনের কথার প্রতিধ্বনি করেন--'বিষ নেই।' তাহলো, গুণিন রোগীকে গাছ-গাছড়া খেতে বলেন কেন? অন্যান্য দ্রব্য, বস্তু ও পদার্থ ধারণ করতে বলেন কেন? তবে কি শুধু মন্ত্র দিয়ে কিছুই হয় না? আসলে মন্ত্র একটি আবরণ অবলম্বন মাত্র যা লোক ভোলাবার জন্যেই ব্যবহার করা হয়। মন্ত্র গুণের চেয়ে দ্রব্যগুণের কার্যকরী ভূমিকা বেশি। মন্ত্র কাউকে না দিয়ে বা কারুর কাছে ফাঁস না করে, গোপনে শিক্ষা ও চর্চা করে, ঐন্দ্রজালিক কিছু ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করে গুণিন মানুষকে আচ্ছন্ন করেন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সমকালীন যুগরুচিকে খুশি করতে গুণিন, গুণিনদের মন্ত্র তথা তন্ত্রের আনুষঙ্গিক অপরাপর উপাদান সমূহের সৃষ্টি ও ব্যবহার হয়ে আসছে। রোগ হলে গুণিন ডাকা হয়। গুণিন আসেন, চিকিৎসা করেন। কিন্তু মন্ত্রে রোগ সারে না। তবুও তাঁদেরকে ডাকা হয়। গুণিনের প্রতি এই আগ্রহ, ঝোঁক তথা বিশ্বাস লৌকিক ধর্মানুভূতি থেকে জাত। যে অধ্যাত্মচিন্তা আবহমান কাল ধরে প্রবহমান তারই ভাস্বরমূর্তি মন্ত্রের আধারে ফুটে উঠেছে। ধর্ম-চণ্ডী নেতা-মনসা, হর-হাড়ি-ঝি, রাম-রাবণ, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা, বদর-মানিক প্রভৃতি নামের প্রতীকে একই আধ্যাত্মিক চিন্তায় রূপ পরিগ্রহ করে আছে, যা একাধারে মানুষের আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেছে।

৪ : ৩. মন্ত্র বিশ্বাসের সীমা

ক. বাঘ-কুমির-মধু-মাছ-কাঠ :

আমাদের আদিমতম প্রপিতামহদের প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনন্দিন ভাবনা গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল শিকার--যার থেকে তার পেট ভরবে। তাই পেটের দায়ে তাঁরা বিভিন্ন জন্তুদের তাড়া করে বেড়িয়েছেন। তাঁদের আশা ও বিশ্বাস ছিল, তুক-তাক। মন্ত্র-জাদু অনুষ্ঠানের প্রভাবে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শিকার সংগ্রহ সহজসাধ্য। যাতে স্বেচ্ছায় কোনো পশু-পাখি ও প্রাণী প্রাণ দিতে রাজি হয় কিংবা নিহত সেই পশু-আত্মা ফিরে এসে শিকারীর অনিষ্ট না করে। এজন্য মন্ত্র, তথা প্রার্থনার উপকরণ হিসাবে চিত্রিত করতেন নানা প্রকার পশুর চিত্র ও মূর্তি, ফাঁদ-খোঁয়াড় ইত্যাদি। বাস্তব ক্ষেত্রে শিকারীর যা আশা বা প্রার্থনা তারই রূপ। আদিম গুহা চিত্রে তাই কোথাও ফুটে উঠেছে অস্ত্র হাতে মহড়ার দৃশ্য, নাচ-গান-চিৎকার ; কখনো বা মুখোশ বা ছদ্মবেশধারী মূর্তি। শিকারের অভাব-অনিশ্চয়তাই জাদু-নির্ভরতার কারণ। মন্ত্র ব্যবহারের পাশাপাশি হিংস্র পশু-জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হয়েছে বিপদ কাটবে বলে। শিকারে বিপদ মুক্ত এবং শিকার সহজ লভ্য করতে জাদুর ব্যবহার ও মন্ত্র শক্তির উদাহরণ প্রসঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের এক পুরা কাহিনী থেকে জানতে পারি--লেসিন কাইনেন নামে এক ব্যাধ বনে ঢুকে গাইছেন--'হে বনদেব টাপিও, আমার সহায় হও, শিকারের কাছে নিয়ে চল আমাকে।' আর বনদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন--"আমার দিকে শিকার পাঠিয়ে দাও, যদি নিজে কষ্ট করতে না চাও তো তোমার দাসীদের বল আমায় সাহায্য করতে।" তার মেয়েকে বলছেন--"পশুদের পিছনে বেত মেরে তাদের পাঠিয়ে দাও এদিকে, আমি অপেক্ষা করে আছি।" মন্ত্র বলে 'কাজ' হলো। দেব-দেবী ও কন্যারা খুশি হয়ে শিকারীর দিকে হরিণ পাঠিয়ে দিল। হরিণ মেরে ব্যাধটি গাইলেন কৃতজ্ঞতার গান। তারপর তাদের জন্য সোনা রূপা ছড়িয়ে রেখে ঘরে ফিরলেন।

এইভাবে মন্ত্রের সাহায্যে জাদু প্রয়োগ করে, ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, আনুষ্ঠানিক আচার-আনুষ্ঠানে পশুকে বশ অথবা দুর্বল করেছে মানুষ, কাটিয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর হাত থেকে। শিকারীর দৃষ্টিতে জাদু তার হাতের বর্শারই আবশ্যিক অস্ত্র। এই অস্ত্র যদি হার মানে, তাহলে বুঝতে হবে, নিশ্চয় অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি ছিল, কিংবা প্রবলতর কোনও শক্তি বিঘ্ন ঘটিয়েছে।[১] তখন তার জন্য দ্বিগুণতর আয়োজন করতে হয়েছে। আদিম থেকে প্রাচীন যুগ সেখান থেকে মধ্যযুগ--ফের সেখান থেকে বর্তমান কাল অবধি আবর্তিত হতে হতে এর ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় দিকগুলি নিজেদের জাতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়ে রেখেছে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে তার প্রয়োগও হচ্ছে--বর্তমান প্রসঙ্গের উপজীব্য বিষয় হলো তাই।

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অরণ্য এবং অরণ্যের প্রাণী কুলকে বাঁচাতে ও

সংরক্ষণের তাগিদেই বর্তমান শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে সুন্দরবন কেটে 'আবাদ-পত্তন' বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও আবাদ বা পত্তনী জায়গার তুলনায় জঙ্গলের পরিমাণই বেশি থেকে গেছে। ১৯৭২ সাল নাগাদ সুন্দরবনকে 'অভয় অরণ্য' রূপে স্বীকৃতি দেবার পর আইন করে কাঠ-লতা-পাতা কাটা, মোম-মধু সংগ্রহ, হরিণ-বাঘ, শূকর, পশু ও পাখি প্রভৃতি শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এহ বাহ্য, জঙ্গল থেকে নিয়মিত ভাবে কাঠ-লতা-পাতা কেটে আনার কাজ এখনও চলছে। চলছে মধু-মোম সংগ্রহ, মাছ-কাঁকড়া ধরা। মরসুমে প্রতিদিন কত লোক জঙ্গলে যায়, তার একটা হিসাব সরকারি নথিপত্র থেকে জানা গেলেও [প্রায় ৪৫০০ জেলে, ৫০০ মোলে, ৫৫০ জন কাঠুরে জঙ্গলে প্রতিবছর প্রবেশ করেন] সে হিসাব সঠিক নয়। কারণ, জঙ্গলে যাবার জন্য যে 'পারমিট' বা অনুমতি পত্র নেবার ব্যবস্থা আছে, সে-ব্যবস্থার ধার ধারেন না অধিকাংশ মানুষ। জঙ্গলের একেবারে কাছের মানুষ তো দুবেলাই বনে যান। আজকাল মেয়েরাও জঙ্গলে যাচ্ছেন। প্রধান কারণ হলো 'পেট'। সুন্দরবনে একটা প্রবাদ চালু আছে। 'পেটের জন্য পৃথিবী'। যারা কাঠ-মধু-মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে প্রতিনিয়ত জঙ্গলে যান, তাদের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ নিরক্ষর অথবা স্বল্প-স্বাক্ষর। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা দারিদ্র্য সীমার নীচে। 'জঙ্গল করতে' যাওয়াটা এঁদের কাছে জীবিকারই অঙ্গ। মাছ ধরাটা জোয়ার-ভাঁটা, মড়ানি বা অমাবস্যা-পূর্ণিমার দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হলেও মধু-মোম সংগ্রহ চলে বিশেষ একটা মরসুমে। সুন্দরবনে মধু-মরসুম চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। শুরু হয় মাঘ-ফাল্গুনে অর্থাৎ কুলের ফুল এলে এবং মরসুম শেষ হয় তেঁতুলের ফুল এলে। কিন্তু কাঠ-লতা-পাতা কাটা প্রায় সারা বছর ধরেই চলে। যদিও গরাণ-বাইন-হেঁতাল-তরা ইত্যাদি সিজেনেবল-কাঠ। তবুও যে বা যারা মধু, মাছ কিংবা কাঠ সংগ্রহ—যে উদ্দেশ্য নিয়েই যান না কেন, জঙ্গলে এই সমস্ত মানুষের জীবনে বিন্দুমাত্র নিরাপত্তা নেই। 'কাঠালে' বা কাঠুরেদের হাতে তবু কুড়ুল বা 'খাপড়া' আর 'আশা বাড়ি' থাকে, যা দিয়ে বাঘ-সাপ-বন্য শূকর-কুমির প্রভৃতি মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু 'জেলে' ও 'মউলে' বা মধু সংগ্রহকারীদের কাছে থাকে মৌচাক কাটবার জন্য 'কাটারি' বা কাস্তে এবং বড় জোর হেঁতাল লাঠি। মউলেরাই সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে চলে যান। 'পাশ' থাকলে আগে বল্লম, পটকা দেওয়া হত। এখন তাও দেওয়া হয় না। তিন থেকে দশ বারো জনের এক একটি দল থাকলেও একের সঙ্গে অপরের একটু ব্যবধান রেখে, জাল ঘেরা বা 'সাঁড়াশি' পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেন। চলতে-চলতে একে অপরের উপস্থিতি জানাবার জন্য 'কু' দিয়ে কিংবা 'হুম' শব্দ করে সাড়া দেন।

আর যে সমস্ত কাঠালে বা মউলেগণ 'পাশ' নিয়ে বনে আসেন, তাঁরা 'সরকার চিহ্নিত' এলাকায় একসঙ্গে অনেকেই থাকেন বলে কিছুটা নিরাপদ মনে হয়। কিন্তু বে-পাশে ও চোরাপথে যাঁরা আসেন, তাঁরা তাড়া হুড়ো করে কাঠ কাটতে গিয়ে কিংবা মধু সংগ্রহ করতে যেয়ে অথবা নদী খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হন বেশি। এঁদেরকে একই সঙ্গে তিন দিকে নজর রাখতে হয়। ক. বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, খ. বন রক্ষক বা ফরেষ্টার, গ. ডাকাত, জলদস্যু ইত্যাদি।

জঙ্গলে তাঁরা কাজ করেন, কিংবা নৌকায় থেকে সহযোগিতা করেন—প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। এছাড়াও নিজস্ব সুবিধা অসুবিধা তো আছেই। সবদিক লক্ষ্য রেখে কাজ করতে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে আচমকা ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে বাঘের হিংস্র থাবা। বাঘে আক্রান্ত হবার ঘটনা ঘটে সকাল ৭টা থেকে ৯ টা, বিকাল ৩টা থেকে ৫টা ও রাত ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে। বাঘ পিছন থেকে আক্রমন করে। ধরে ঘাড়ের ডান দিকে। এ জন্য বাবুলেরা ডান কাঁধে লাঠি রাখেন। বাঘ আগে খায় পাকস্থলি, পরে দেহের অন্যান্য অংশ। শতকরা ৮০ ভাগ ঘটনা ঘটেছে নৌকা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া। যদিও বাঘের একটা নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে ধরবে বলে সে মনস্থির করে, তাকে ছাড়া শত অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও অপর কারুর উপর 'তাক' করে না। তবে যে কোনও ভাবে বাঘের মুখে দলের কোন সঙ্গী চলে গেলে, তার লাশ ফিরিয়ে আনতে পারলে, সেখানেই অথবা দেশে ফিরে গিয়ে কবরস্থ করা হয়। গোসাবা সহ অন্যান্য জঙ্গল সংলগ্ন হাসপাতালে ব্যাঘ্র চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও, সে পর্যন্ত আসা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। 'বাঘের সঙ্গে লড়াই করে' লাশ ফিরিয়ে নিতে পারলেও, রোগী রাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রবাদে আছে—সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। আবার বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। জঙ্গলকারীদের একমাত্র ঔষধ হচ্ছে 'বনদেবীর থানের মাটি'। 'পাশ' থাকলে সেই অমূল্য জীবনের বিনিময়ে সরকার 'টাইগার ভিকটিম সিলেকশান সেন্টারে'-র মাধ্যমে মৃতের শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে এককালীন দুই হাজার টাকা অনুদান দেন। কিন্তু বে-পাশীদের ভাগ্যে কিছুই জোটে না। এমনকি তাঁদের মা-বোনদের গলা-ছেড়ে কাঁদবার উপায় নেই। শোকে পাথর হয়ে পাঁচজনেব সঙ্গে পাড়ায় বাস করতে হয়। নইলে সরকার টের পাবে। তাই বে-পাশীর মৃত্যু সরকারি স্বীকৃতি পায় না, বরং বিধবা পল্লীর বিধবার সংখ্যা বাড়ে। এঁদের মৃত্যু কথা লোকমুখেই থেকে যায়। কালে, কারুর কথা 'রূপকথা' হয়, কারুর কথা একদম হারিয়ে যায়।

সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে যে সমস্ত মানুষ কাঠ-মধু-মাছ সংগ্রহ করতে যান, তাঁরা জঙ্গলকে সরাসরি 'জঙ্গল' বা 'বন' বলেন না। জঙ্গল এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী জঙ্গল-নির্ভর মানুষেরা বিশেষ নামকরণ করেছেন। জঙ্গলের পরিবেশে সৃষ্ট বলেই সুন্দরবনের শিকার-সংগ্রহের ভাষা 'জংলাভাষা' বা 'জঙ্গলা ভাষা'[২] নামে পরিচিত। জঙ্গলে যে সমস্ত মানুষ যান, যেমন কাঠালে, মৌউলে, বাউলে, জেলে, আবাদকারী মানুষ, দেশিয় শিকারি ইত্যাদি প্রত্যেকেই এই 'জংলাভাষা' বা 'লাঙ্গুয়েজ কোড' ব্যবহার করেন। জঙ্গলের ভাষা অনুযায়ী জঙ্গলের নাম 'মহল' বা 'মাল'। অনেকে আবার 'বাদা' বা 'মোকাম' বলেন। জঙ্গলকারীরা মাছ-মধু—কাঠ সংগ্রহ তথা শিকার করাকে বলেন 'জঙ্গল করা' বা 'বন করা' কিম্বা 'মহল করা' বা 'মাল সারা'।[৩] মহলে যাবাব জন্য তাঁরা 'বনের সাজন' সাজিয়ে দশ বারো জনের একটি দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রত্যেক দলে থাকেন একজন করে দলপতি। তিনিই 'পাট-বারলে' বা ওস্তাদ। পাট-বাবুলের হাতেই থাকে দলের যাবতীয় দায় ও দায়িত্ব। তিনি বনে গিয়ে মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করেন, 'হুকুম' দেন। হুকুমের অধিকারী বলেই তাঁর নাম 'হুকুমদার' কিংবা মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করেন বলেই 'মন্ত্রবিৎ'। জঙ্গলকরাদের জঙ্গলে

এসে এই হুকুমদারের বা 'সাঁয়দারের' কথা মানতেই হয়। তাঁর হুকুমই সব। এই হুকুম ও নিয়ম-কানুন সরকারের সংবিধানগত কোনো নির্দেশ ও আইন নয়, তা অদৃশ্য নিয়তির কাছে জীবন বাজি রেখে মধু-মাছ-কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করার বৈপ্লবিক দুঃসাহসিকতা। 'জঙ্গলের মন্ত্র' এক মাত্র পাটবাব্‌লে জানেন তা নয়, দলের প্রত্যেকেরই কম-বেশি জানা থাকে। 'দলপতি'র মর্যাদা পান একজনই। সমাজেও এঁরা 'গুণিনের মর্যাদা পান। জঙ্গলের এসে আর পাঁচজন সঙ্গী-সাথীদেরই মতো পরিশ্রম করেন। কিন্তু জঙ্গলে প্রথম নামার অধিকার তাঁর। যে-কোন রকম বিপদ দেখা দিলে, কোনও সমস্যার সমাধান করতে হলে, তাঁকেই এগিয়ে যেতে হবে আগে। তাঁরই ইঙ্গিত পেলে সবাই কাজ শুরু করেন। জঙ্গলের এইসব গুণিনই আবার 'ফকির' নামে পরিচিত। পূর্বে যারাই জঙ্গলে যেতেন তারা সকলেই 'বাওলে' নামে অভিহিত হতেন। বর্তমানে কেবলমাত্র যিনি জঙ্গলের মন্ত্র জানেন, সেই গুণিনই 'বাওলে'। বছরের বেশির ভাগ সময়ই জঙ্গল করাদের জঙ্গলে থাকতে হয়। কখনও তিন থেকে দশ দিন কখনও টানা দুই মাস, কখনও এক টানা ছয় মাস জঙ্গলে থাকেন, থাকতে বাধ্য হন। ফলে জাদুর প্রতি বিশ্বাস তাঁদের জঙ্গলের জীবনকে যে প্রভাবিত করবে—এটাই স্বাভাবিক। এঁরা জঙ্গলে গিয়ে মন্ত্রের সাহায্যে বাঘ তাড়ান, বাঘের দাঁত-নখ ইত্যাদি শিথিল করেন, নদী-সমুদ্র বন্দ করে হাঙ্গর-কুমিরের আওতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার চেষ্টা করেন ; অসুখ-বিসুখ সারাতে চেষ্টা করেন ; সাপের মন্ত্র ঝাড়ান ; প্রচুর মোম-মধু, মাছ-কাঁকড়া, কাঠ ইত্যাদির সন্ধান চান কিংবা নিরাপদে জঙ্গলে বিচরণ করার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এই সমূহ মন্ত্র এক কথায় 'কালামের সাজন' নামে পরিচিত। কালামের সাজন অর্থাৎ কোরানের বানী, হুকুম বা কথা বাক্য যা ভক্তি সহকারে মুখে আনতে হয়, সাধনা করতে হয়। 'সাজন' সজ্জিত উপকরণ ও মন্ত্র।

'জঙ্গলের মন্ত্র' জানা 'বাওলে' দুই ধরনের—ক. হুকুমের বাওলে। খ. গুণের বাওলে।

হুকুমের বাওলেকে স্থানীয় ভাবে 'হুকুমির বাব্‌লে' এবং গুণের বাওলেকে 'গুণির বাব্‌লে' বলা হয়।

হুকুমের বাব্‌লে অর্থাৎ হুকুম ও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়ে যে-সমস্ত বাব্‌লে মহলে যান। হুকুমির বাব্‌লেকে 'মত' বা 'সত'র বাব্‌লেও বলা হয়। এঁরা কোনো হুকুমদার পীর বা ফকিরের শিষ্য। এঁরা মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় গুরুর নাম নেন। কোনও বিপদে পড়লে স্বয়ং হুকুমদার রক্ষা করেন বলে বিশ্বাস। এঁদের কাছে 'গুরুহি কেবলম' বা 'এলাহি ভরসা' হলো মূলমন্ত্র। গুরুর আদেশ কিংবা বনবিবি, আলিমাদপ, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি দেব দেবীর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হলে, 'হুকুম' হলে অথবা অনুগ্রহাদেশ প্রাপ্ত হলে তবেই মহল করতে যান। খুব বেশি মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় এঁদের নিতে হয় না। তবে বনের বাচক-গোচক সব মানতেই হয়। মন্ত্র শুধুমাত্র বনে নয় ; বন-করারা যখন বনে থাকেন তখন তাঁদের নিরাপদ জীবনের বা উদ্দেশ্যের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে বাড়িতেও কম-বেশি বিধি-নিষেধ পালন করার নিয়ম রয়েছে যা বউদেরকেও মানতেই হয়। জঙ্গলে গিয়ে বাঘে ধরা, সাপের কামড়ে মারা যাওয়া কিংবা ভয়ে ও অসুখে মারা গেলে—যে কোনও কারণে দলীয় সাথীর মৃত্যু হলে নিজেই দায়ী থাকেন। হুকুমির বাব্‌লেদের 'হুকুম' না হলে অনেক সময় 'জঙ্গল করা'

অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটানা তিন-চার বছর বন করতে পারেন নি এমন হুকুমের বাব্‌লে অনেক আছেন, যাঁদের মরসুম এলে ছটফট করে কাটাতে হয়। সেজন্য তাঁদের লোভ সম্বরণ করার ক্ষমতা তথা সংযম শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

গুণের বাব্‌লে অর্থাৎ যে সমস্ত বাব্‌লে বনে যান কেবল মাত্র মন্ত্র-তন্ত্র ভরসা করে, আত্মনিয়ন্ত্রণে। এঁরা সাধারণত জঙ্গলে 'কর' দেন। 'কর' অর্থে দলীয় সাথীর মৃত্যু। 'জঙ্গলা ভাষা'-য় এর প্রতিশব্দ 'লোকপড়া'। জঙ্গলে গিয়ে বাঘের কবলে পড়ে মৃত্যু, কাটি ঘা, অসুখ-বিসুখ বা যে কোনো কারণে মৃত্যু হলে 'লোকপড়া' বুঝায়। দলের একজন 'লোকপড়লে' বা একবার 'কর' দিলে সাধারণত সেই বাব্‌লে বনের থেকে প্রচুর পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত কাঠ-মধু-মাছ ইত্যাদি নিরাপদে সংগ্রহ করতে পারেন। গুণির বাব্‌লেদের 'কর' না দিলে মধু, মাছ, কাঠ পাওয়া যায় না। জঙ্গলের দেব-দেবী ছলনা করেন। এও একটা বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত পৌরাণিক 'বলি প্রথা'। একজন গুণের বাব্‌লেকে তাঁর ৪০/৪৫ বছরের 'জঙ্গল করা জীবনে ' দুই তিনবারও 'কর' দিতে হয়েছে। গুণের বাব্‌লের 'মন্ত্রগুরু' থাকলেও হুকুমদার-গুণিনের মতো হুকুম নেই বলে, গুরুর প্রতি খুব একটা দায়িত্ব থাকে না। এঁরা প্রচণ্ড সাহসী হন। মন্ত্র এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সাহায্যে বনের দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, বাঘ-ভাল্লুক, হাঙ্গর-কুমিরকে বশীভূত করে বা বাধ্য করে উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হন। অবশ্য দেবদেবীর প্রতি আনুগত্য থাকে অটুট। গুণের মন্ত্র দুই ধরনের-- ক. ডাকের মন্ত্র, খ, অন্যান্য মন্ত্র।

ডাকের মন্ত্রগুলি বাব্‌লে বা গুণিনরা উঁচু গলায় হেঁকে পাঠ করেন অন্যান্য মন্ত্রগুলি পড়েন নিচু সুরে। এই সমস্ত মন্ত্রের কতটা সময় বা কার্যকাল তা নিয়েও তাঁদের মধ্যে অনেক রকমের বিশ্বাস চালু আছে। আবার ঠিক সময়মত মন্ত্র উচ্চারণ না করতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। একটি মন্ত্রের কার্যকরী মেয়াদ শেষ হবার সময় এবং নতুন করে পরবর্তী মন্ত্রের কাজ শুরু হবার সন্ধিক্ষণটি গুণিনের পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচ্য।

গুণের মন্ত্রের কার্যকরী ভূমিকা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্র আছে। এক এক ধরনের মন্ত্রে এক এক ধরনের নাম। যেমন--সরকারি নাম, বাইশ, ভেল্কী, নিদ্রালী, নদীবন্দ, বিল ঝামটা, ফকিরের নাম, পাড়া বন্দ, মালতাড়া, জ্বালান, খিলেন, পরখকরা, খাঁকী সাধন, বিন্দুজাল, সনঝে পড়া, সাঁয় বন্ধ, তিকুট, আতালকুর্সি, লক্ষ্মণগণ্ডী, চালান, ছড়িপড়া, ডাকভাসান, তুফান কাটা, বাঁকবন্দ, পাখি ধরা, বনে নামা, তুফান কাটা ইত্যাদি ১০৮টি মন্ত্র।

অতঃপর মন্ত্রগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক। তবে তার পূর্বে সুন্দরবন সম্পর্কে একটি প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হব--যে কাহিনীটি সুন্দরবনের গুণিন-ফকির-বাউলেদের মুখে মুখে ফেরে। কোন কোন বাউলের মন্ত্রের খাতার প্রথমেই এই কাহিনী মূলক মন্ত্র-ছড়াটি লেখা থাকে। কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে রচিত এই মন্ত্রে আছে ইতিহাসের কথা। মন্ত্রটি "বাইশ-ফকিরি নাম"--

ক. জগদীশপুরবাসী বেচু ঘোষ নাম। শিশুরাম কানাই নিতাই নিধুরাম।।
ছোট অভিরাম, বড় রমানাথ দাস, দেদোকৃষ্ণ, গদাকৃষ্ণ, মনোহর দাস।।
ভোলা-নেড়া-বিনু-ব্রজহরি-- হুটু ঘোষ--গোবিন্দনয়ন লক্ষ্মীকান্ত।

ইহাদের ভক্তি-প্রেম অতি সরল শান্ত।। পূবির আনন্দ সহিত এই বাইশ জন
এরাই করিল আশি-হাটের পত্তন।। এই আন্‌দিরাম নিত্যানন্দ বিশ্ব পাঁচকড়ি—
দহাই আলি মদত।।—ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

বলা হয়েছে, বাঘ-কুমিরের খেলা ঘর সুন্দরবন ৮০ হাটের দেশ। ২০০ বছরেরও আগে ২২ জন ফকির বা গুণিন জঙ্গল হাসিল করে 'হাট' বা 'বাদা' পত্তন করেন। অর্থাৎ জঙ্গল কেটে আবদ-পত্তন করার সময় এঁরা বর্তমান ছিলেন, ভয়ংকর জঙ্গলকে কব্জা করবার জন্য মানুষকে দুর্জয় সাহস দিয়ে গেছেন। সরকারি নথিপত্রে এঁদের স্বীকৃতি না থাকলেও গুণিনেরা স্মরণে রেখেছেন। মন্ত্রে উল্লিখিত নামগুলি হিন্দু হলেও গুণিন অর্থে সবাই 'ফকির'।

খ. সরকারী নাম :

এ আলী মদত দোহাই তোমার। এ আলেক দরবেশ নামের দহাই লাগে।
দহাই ছুয়েদ মনোরা দ্দিন সাহা। দহাই ছুয়েদ আলাউদ্দিন সাহা।
দহাই ছুয়েদ মঙ্গলেজ দহে বাছের সাহা। দহাই তোমার এ আলেক দরবেশে
দহাই আলি মদত, দহাই আলিমদত।—ঐ

গ. মায়ের হুকুম :

মা খাঁকী জাগো (৩) দহাই মা বনবিবি আমার এই মালে
উপরি-ফুপারী ডাক-ডাকিনী ভূত-প্রেত হাঁকোর-কুমির বাঘ-বাঘিনী সাপ-খোপ
কামট-ভাল্লুক যে দিবে পা দহাই মা বনবিবি তার জ্বলে যাবে গা।
দহাই মা বনবিবি তোমার সাহাজঙ্গলীর ছেরে কেটে খাওয়।।—ঐ

ঘ. পাড়াবন্ধ :

'পাড়া' অর্থাৎ নদীর পাড়, কূল বা তীর। পাড়াবন্ধ মানে নদীর পাড় বন্ধ। 'জঙ্গল করাদের' জঙ্গলে গিয়ে নৌকা নোঙর করে রাত্রি বাস করতে হয়। রাত্রি বাস জনিত এবং 'বায়ের কামাই'[৪]-র দিন পাড়াবন্ধ করা হয়। পাড়া বন্ধ—নৌকা থেকে সোয়া আশি রসি চৌহদ্দি বেড়ে আনুমানিক ১০ থকে ১০০ হাত দূরত্ব বজায় রেখে মন্ত্র দিয়ে গণ্ডীবদ্ধ করা হয়। পাড়া বন্ধের অপর নাম 'লক্ষ্মণ গণ্ডী' বা 'চাপান সারা'। লক্ষ্মণ গণ্ডী বা চাপান সারা পাড়াবন্ধের অন্যতম নাম হলেও এই ধরনের বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্র বর্তমান। 'পাড়াবন্ধ' নৌকায় বসে সম্পন্ন করেন গুণিন। তার পূর্বে অর্থাৎ রাত্তিরে ভাত-জল-তামাক সরিয়ে [জঙ্গলে খাও, দাও, নাও প্রভৃতির পরিবর্তে সরাও, সরিয়ে ইত্যাদি ব্যবহার করেন বাওলেরা] গা-হাত-পা-মুখ ধুয়ে বাউলে নৌকার কোলাস বা পাটাতনের উপর বসে মন্ত্রপাঠ করেন। মন্ত্র পাঠের সময় গুণিন প্রার্থনার ভঙ্গিতে পূবমুখো হয়ে হাঁটু গেড়ে বসেন। মন্ত্র পাঠ করবার সময় গুণিন-বাব্‌লে ৪টি ঢিল মন্ত্রপূত করে চারদিকে ছুঁড়ে মারেন। এইবার উক্ত ঢিল গুলোকে নিয়ে একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে বৃত্ত বা গণ্ডী এঁকে নেন মনে মনে।

সাহাদুল্লাহ ভাই—সেলাম (৩) দোহাই মা বনবিবি (৩)
দোহাই বাবা আলি মুর্শিদ (৩) দোহাই তোমার ধর্মের (৩)
সেখ ছয়েদ জাললাং শা হাঁকর-কুমির-কামোট-বাঘ-ভাল্লুক
ভূত-প্রেত-দূত-দানা-ডান-ডাকিনী যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর, সাপ-সাপিনী হিংস্রজন্তু

পাঁচ প্রহর দিন-রাত্তির মধ্যি
আমার এই মাল-পাড়ায়ে যে দিবি ঘা
আলি মদত বনবিবির হুহুংকারে জ্বলে যাবে গা
দয় আলি মদত দোহাই তোমার ধর্মের (৩)
এও আলি
শত্রুর মুখে মারি বজ্রের তালি
দোহাই মা বনবিবি দোহাই বাবা আলিমুর্শিদ
দোহাই বাবাগজী দোহাই শাজঙ্গুলী
দোহাই গুরুমুর্শিদ দোহাই খাঁকমা
দোহাই রঙ্গিনী মা দোহাই মা কালী
দোহাই তোমার ধর্মের (৩)।।—কেনারাম মণ্ডল

ঙ. গোরবন্ধম বা জঙ্গল বন্ধ :

আদ্যাশক্তি বসুমাতা
শ্রীরামচন্দ্র চল্ল বনবাসে সঙ্গে লয়ে সীতা।
অরণ্যেতে কুঁড়েঘর পাতার ছাউনি
আমার এই মালের ডাক-হাঁক ভোর বেড়ে করলাম
গণ্ডী-আমি লক্ষ্মণ গুণমণি
আমার এই গণ্ডীর মধ্যি দিনভোর-রাতভোর
যে দিবি পা
আল্লার আহাদ্দে জ্বলে যাবে তার গা
পশ্চিমে কছ্‌ম আল্লার নবী, দমের মসজিদ
দক্ষিণে কছ্‌ম জহর আউলী
পূর্বেতে কছ্‌ম শ্যাম মোরতোজা আলী
উপরে বন্দিলাম মা বরকত জননী
আমার এই মালের ডাক হাঁক ভোর বেড়ে
গোড়বন্ধির মধ্যি যে দিবে পা
দোহাই তোর আল্লার নবী
মা বরকতের মাথা খা (৩)।।

—সৃষ্টিধর সর্দার

চ. জ্বালানো মন্ত্র :

জঙ্গলে কাজ করার সময় গুণিন বাউলেরা জ্বালান মন্ত্রের সাহায্যে বনের বাঘ-সাপ-ভাল্লুক-গণ্ডার-কুমির-হাঙ্গর, ভূত-প্রেত প্রভৃতি অনিষ্টকারীদের গা জ্বালিয়ে দেন। গুণিন জ্বালানো মন্ত্রের সাহায্যে বাঘ বা অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের গতি নির্দেশ কবে দিতে পারেন না। জ্বালানো মন্ত্র ক্রিয়া করলে বাঘ-ভাল্লুক তথা অনিষ্টকারীদের শরীর যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে। তখন আর বনকরাদের আক্রমণ করতে পারে না। ছটফট করতে করতে অন্যত্র চলে যায়। জ্বালানো মন্ত্রের প্রভাবে গাছের পাতা পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠে। গায়ে লাগলে ফোসকা পড়ে। গুণিনদের মতে জ্বালানো মন্ত্র চরম মন্ত্র। ব্যবহার এবং প্রয়োজন অনুসারেই প্রয়োগ করেন তাঁরা, নইলে নয়।

লবে কুল জ্বলিল সবে কুল জ্বলিল পথে আলী
গোপনে আছে আল্লার নাম করিম করতা
মুর্শিদ ভরসা রহিম করিম নাম আল্লা
লবে কুল জ্বালিল হেঁও আলি হো আলি
আলি হো আল্লা রসুল কেন কর বনের
বাধা বাধা কর দূর আলেক দম দম ভরে
আয় দম ভরে না এলে তোর ভক্ত মারা যায়
দম ছিটি দম মাওলা দম ছিটিদর দমের ঘরে
আল্লা মাদল দম দম মাদার অদ্দম দম
বাইদম ত্রয়োদম জিগিদম সেইদমে

আল্লার নাম আলী তোমার আসরেতে একবার চলে আয় তুমি জ্বল আমি
জ্বালি তোমারি কামান জ্বলে যা করে খোদায় আলির হুকুমে সেই

জ্বালান দোহাই মা বনবিবি দোহাই তোমার জ্বালান জ্বালিল বাপরে জ্বালান জ্বালিল ও জ্বলিল
ভয়ে ভূতো জ্বালা বাপরে জ্বালিল জ্বালান উপরী ফাপরি জ্বালাও বাঘ-কুম্ভির জ্বালাও
জ্বালাও সাপ খোপ গণ্ডার ভাল্লুক বাপরে জ্বালার জ্বালিল ভূত-প্রেত জ্বালাও বাপরে
জ্বালান জ্বলিল গেছো ডাইনী জ্বালাও বাপরে জ্বালাল জ্বলিল আমার এই মালের
মধ্যে বাঘ-ভাল্লুক জ্বালাও বাপরে জ্বালানো জ্বলিল আমার এই ডাইনে-বামে জ্বালা বাপরে
জ্বালান জ্বলিল আউসাত বাউসাত মাটি জ্বালাও বাপরে জ্বালান জ্বলিল দোহাই মা বনবিবি

দোহাই তোমার দোহাই তোমার ধর্মের (৩)।। --পঞ্চানন কয়াল

জ্বালানো মন্ত্র বিনিয়োগের সময় বাওলেরা গরাণ-হেঁতাল অর্থ কুল কাঠের মশাল বানিয়ে, উনুনে পুড়িয়ে, অভিমন্ত্রিত করেন। অভিমন্ত্রিত মশাল জঙ্গলের কাদা মাটিতে অথবা নদীর জলে ছুপে ধরেন, আর মন্ত্র পাঠ করেন।

ছ. খিলেন :

এই মন্ত্রের সাহায্যে বাঘের দাঁত-নখ সবই খিল দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়। তখন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে বাঘ-সাপ ইত্যাদি থাকলেও তারা সায়দারদের আঘাত করতে পারে না।

বিচমে আল্লা নীল। লাগল বাঘা-বাঘীর খিল
বাঘা-বাঘীর খিল যদি ছোটে। আল্লা মহাদেবের দহাই লাগে
হুকলাইল্য এল্লালাহ মহম্মদ রছুল আল্লা দোহাই শ্রেত আল্লার।
আমার এই সাই বন্ধ আজকার দিনভোর রাতভোর শিঘ্র শিঘ্র থাক।

দোহাই মা বনবিবি দোহাই তোমার ধর্মের। নগেন্দ্রনাথ বর্ম্মন

জ. নিন্দিল মন্ত্র :

এড়িমেড়ি রাকামি মেড়িয়ে ডাল। পাড়া বেড়ে লাগল নিদ্রার কাল
কাঁকে কলসি উদম চুল নিদ্রা জায় মানুষ আর কুকুর
নিদ্রা জায় আতা আর বাতা ছুনাতে ছুনাথপুর। কিরূপে বন্দনা করি মায়ের স্বরূপ।
আয় মাটি মাটি পঞ্চ অঙ্গুলী ফেলি মাটি মাটিরপর
চালে উভু মাটি চুলে পড়ে বন খড় নড়ে
শেল-কুকুর ডাকে এই নিদিল তায় লাগে।
লাগ লাগ নিদিল লাপ পাড়া-সরা.জুড়ে লাগ। কার আজ্ঞে দোহাই মা কালীর আজ্ঞে
কামরুল কামাক্ষের আজ্ঞে আমার এই নিন্দিল শিগিরী লাগগে

দোহাই মা কালীর আজ্ঞে (৩)।। --ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

'নিদ্রালী' মন্ত্র প্রয়োগ করার সময় গুণিন-বাউলে জঙ্গলের শুকনো মাটি অথবা ইঁদুরের মাটি ব্যবহার করেন।

ঝ. পরখ মন্ত্র ·

নির্বাচিত জঙ্গলে অনিষ্টকারী কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বিশেষ করে বাঘ আছে কিনা তা পরখ মন্ত্রের সাহায্যে যাচাই করেন বাব্‌লে। দলের প্রত্যেক সাঁই-র জন্য একটি করে বাইন পাতা নিয়ে তাতে এক একজনের নাম লেখেন। এরপর পাতাগুলি একটি গাছের গোড়ায় পাশাপাশি রেখে, প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে নিম্নের মন্ত্র পাঠ করেন।

মন্ত্র পাঠের সময় পাতার উপরে অবশ্যই হাত রাখতে হয়--ডান হাতের উপর বাম হাত। মন্ত্র পড়ার পর ফুঁ। অতঃপর বাম হাতের কেড়ে বা কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে মাটি নিয়ে ডান হাতের উপর বিঘেত মাপতে হয়। দুই বার বিঘেত ফেলে যদি পুরো হাত-পূরণ হয়, তা হলে বুঝতে হবে মাল 'মুক্ত'। আর যদি বিঘেত কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে, এক থেকে দুই রসির মধ্যে বাঘ রয়েছে বা 'কুলোপাক' দিচ্ছে। তখন 'ঞ নং' 'চালান' মন্ত্র দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে মহাল সারেন মউলেরা।

আগে আল্লা পিছে নবী ডাইনে মাদার বামে বিধি
বসুমতী তুমি আমার মা আমার এই মস্তকের উপর কর ভর।
কুথায় আছিস বেটা শুঙ্কিতোর জলা খসে পড়ুক তোর হাত খসে পড়ুক নলা
তুই যা শ্মশানে আমি যাই ঘরে কালির বচনে বেটার ঘাড় ভেঙ্গে পড়ে
আমি ব্রহ্মার পো পরখ করি আল্লার হুকুমে জ্বলে যাবে গা তারি।।

--সৃষ্টিধর সর্দার

ঞ. চালান মন্ত্র

আগে যায় দুর্গা পিছনে যায় দূত মুই যাই চণ্ডীর পুত।
পথের কাঁটা-খোঁচা সাপ-খোপ-বাঘ তোমরা পঞ্চ ভাই।
পথ ছেড়ে দাও চল মহাদেবের কাছে যাই।
মহাদেবের কাছে যে করিবে ঘা শিক্ষে তার গুরুর মাথায় পাকলের বামপা।
কার আজ্ঞে ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে বাঘ-বাঘিনী সব দূর চলে যাকগে্।
ইলি আল্লা মহম্মদ লছুর আল্লা হুকুম তোমার হনু আল্লা খাঁ আল্লা জয় আল্লা আল্লা জয়-জয়
তোমার বিচমিল্লা দোহাই তোমার লই আল্লা ফতেমা আল্লা ফজা ফজর জার জাহান
করম দি ছাওয়াল পীর—খোদের পীর এচমান সেলাম সেলাম তোমার
নবী আল্লা হায় হাত হায়া তোমার হায়া তোমার কায়া আমার এই হাঁক জদ্দুর যায়
বাঘ-ভাল্লুক ভূত-প্রেত সব জন্তু-জানোয়ার তদ্দুর পালায়--তবাত্‌ তবাত্‌ তবাত্‌
দোহাই তোমার দোহাই আল্লার।—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

এই মন্ত্র পাঠকরার পর গুণিন খুব জোরে একটা 'কুই' দেন।

ট. আলসে মন্ত্র :

'আলসে' মন্ত্রের প্রভাবে জন্তু জানোয়ারের অনুভূতিতে অলস মাধুর্যতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ফলে অসময়ে আলসেমিতে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন কাঠুরিয়ারা বা মউলেরা গোলপাতা নিয়ে বাঘের শরীর ঢেকে দিয়ে নিজ-নিজ কাজ সেরে নেন।

কুকুরে মুকুরে আলির পো। যেখানে আছিস সেখানে শো।
ধেয়ে এসে করিস বল খোদা করিম পারতল।
খোদা মহম্মদের নীর লাগল বাগাপীর তোরপীর।
আমার 'বন্দ' যদি নড়েচড়ে। আসমানের চন্দ্রসূর্য খসে পড়ে।
রাগিনী দিল রাগ আজকার দিনভর কালকার দিনভর
আড়াই প্রহর থাক। দোহাই কালীর আজ্ঞা বীর ফতেমা।
যেখানে আছিস সেইখানে পড়ে থাকগ্যে যা।।—ঐ

ঠ. কুম্ভির খিলন :

আল্লার কলমা হিল কুমুরের হাতে মুখি লাগে সপ্তাহ ভর বজ্রের খিল।
আমার এই খিল যদি নড়ে সনাতন গোঁসাই-এর দোহাই লাগে
দোহাই বাবা আলি, মাকালী দোহাই মাদার, দোহাই গোরাচাঁদ।
দোহাই বনবিবির দোহাই লাজ্ঞে। আমার এই কথার তালাক যদি নড়ে
দোহাই বনবিবির ফতেমার দোহাই লাজ্ঞে।।—মহাদেব মণ্ডল

ড. কুম্ভির চালান :

খিলেন মন্ত্রের দ্বারা কামট-কুমিরদের যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে না দিয়ে, গুণিনরা অনেক সময় তাদেরকে দূরে চালান করে দেন। তারপর নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন।

চলে জাতি ঘুঙুর বাজে সোনার নুপুর পায় পথ ছেড়ে দে রাখাল ঠাকুর তোর শিষ্য যায়।
তোর হাত বন্দম্ পা বন্দম্ আর বন্দম্ মুখ আমার এই বাঁক থেকে চলে যা সুখ।
আমার এই বাঁকের মধ্যি না করিস ঘা দোহাই তোর—রায় ঠাকুরের মাথা খা।।
এ আলি মাদার হক তোমার এই আলি নামে দোহাই ছয়েদ। মনি রদ্দি মদ্দহাই ছয়েদ মগলেম।
দোহাই ছয়েদ আবদুল রহমান শা, দোহাই ছয়েদ জালাল শা, আমার এই লোকজন যদি করিস ঘা।
দোহাই জালাল শার নামে তোর জ্বলো খাবে গা।—ঐ

ঢ. নদীর বাঁক বন্দ :

শুকনো ঢেলা ও জল হাতে নিয়ে তিন বার মন্ত্র পড়ে ফেলে দিতে হবে, অথবা গাছের শেকড়ের মধ্যে রেখে দিতে হবে।

থাকমধ্যে সূর্যবরণ পূজপে তোমার রাঙাচরণ।
রাঙা চরণ পূজপ পায় তোমার শত্রু সব বন্দি রয়।

ডেলা ফেলে দিই আজকের দিন-রাতি কালিকার দুপুরের জল পড়ে দেই।
ঘা শত্রু—এক বাঁক পিছিয়ে থাকগে ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে।
আমার এই বাঁক সাতদিনভর বন্দ থাকগে আল্লাহি হাঁকোর কুম্ভিরের মুখে মারি
· বজ্রের তালি
দোহাই বারা গোরাচাঁদ বাবা আলি স্বর্গের ধুলো মর্ত্যের মাটি
লাগল হাঁকোর কুম্ভিরের দাঁত কপাটি দোহাই হরপার্বতী, দোহাই রামসীতা।।
—সৃষ্টিধর সর্দার

খ. নদী-সমুদ্র-নৌকা :

নদীমাতৃক সুন্দরবনের মানুষ বিশেষ করে জেলে মাছ-সংগ্রহ করে বিক্রি করা জীবিকার প্রধান অঙ্গ। শুধু জেলেরা নয়, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে নিস্পেশিত অধিকাংশ মানুষই পেটের দায়ে নদী-সমুদ্রে পাড়ি জমান, মাছ-কাঁকড়া ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। নিরাপদে নৌকা-যাত্রা, মাছ-কাঁকড়া সংগ্রহ কিংবা অবস্থান গত সময় সমূহ যাতে নিশ্চিত রূপে ফলপ্রসূ হয়, তার জন্য মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এঁরাও 'জঙ্গল করা' বা 'মহালসারা'র অন্তর্ভুক্ত। এঁদের সঙ্গে যে সব গুণিনেরা যান, তাঁরাও একই সঙ্গে জঙ্গল বিষয়ক সকল রকম মন্ত্রের ব্যবহার করেন। জঙ্গল বিষয়ক সমস্ত মন্ত্রের নামই 'কালামের সাজান'। তাঁর মধ্য থেকে আমরা 'নদী-সমুদ্র-নৌকা' বিষয়ক কয়েকটি মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবো।

ক. ডাক ভাসান :

নিরাপদে নৌকা চালাবার জন্য গুণিন এই সব মন্ত্র প্রয়োগ করেন। নদীতে নেমে, হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে, অঞ্জলি করে জল তুলে, গলবস্ত্র হয়ে, পূর্ব দিকে মুখ করে মন্ত্র পড়তে হবে। পরে অঞ্জলি বদ্ধ জল নৌকা ও দলের প্রত্যেকের গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ভাটিশ্বরী মা মাগো তুমি কুথায় রহিলেন গো তোমার মোকাম ছেড়ে আমার নৌকায়
কর ভর।
আমার নৌকা, আমার এই পাড়া, সাঁই ছাড়া যাও যদি অন্য ঠাঁই
আর কি বলির, তোমার আল্লার দোহাই। ভূত-প্রেত-দান-দৈত্য আর বাঘ-বাঘিনী
আমার হাঁকভর, ডাকভর, বাঁকভর যে দেবে এলাহির হুকুমে তার জ্বলে যাবে গা।
পা
আগে বন্দী বসুমতী ; পরে বন্দী ইষ্টকালী কালিকার চরণে সহস্র প্রণতি।
তব নাম শিরে করে এই ভাসান করিলাম সাগর মাঝারে।
সাগরে বসিয়া মাগো ছাড়িলাম বাণ ধর্ম্মের দিকে চেয়ে।
কৈলাস ছেড়ে এসো মাগো ত্রিনদী যায়ে। আমার এই ভাসান কিম্বা সাই যদি
ছাড়ো
তোমার ধর্মের জটায় বাম পা নাড়ো। দোহাই তোমার ধর্মের কার আজ্ঞে মা
কালীর আজ্ঞে।।
—শিবপদ মৃধা

ডাক ভাসান ক্রিয়া করলে নদীতে ডুবে যাবার ভয় থাকে না, বাঘ-কুমিরে ক্ষতি করতে পারে না, দলের লোকজন নিরাপদে থাকতে পারে।

খ. নদী ঝামটা :

সুন্দরী অথবা খেজুর গাছের গোড়ার দিককার ডাল নিতে হবে। উক্ত ডালের এক হাত চার আঙুল পরিমাণ কাঠ নিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। অতঃপর মন্ত্রপুত কাঠটি এক নিশ্বাসে চেপে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে নদীর বিক্ষুদ্ধতা বন্ধ হয়ে যায়।

আল্লার বিন আল্লার কিরে
সেই দিকে যাবি ফিরে।
হাঙ্গর-কুম্ভীর সব চলে যাও
বরকতের মাথা খাও।
শত্রুর মুখে মারি বজ্রের তালি
যেদিক থেকে আসবি ঝামটা
যদি না যায় তোর আল্লার কিরে।
না যাস তো খাস খোদার রক্ত।
দোহাই বাবা আলি
দোহাই বাবা আলি মাদপ।।

—মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)

গ. তুফান কাটা মন্ত্র :

তুফান কাটা মন্ত্র নৌকার গলুইতে বসে জল নিয়ে পাঠ করতে হয়।

পাষাণে গঠনকালী তুফানে ভাসাইলাম
তোমার অধম সন্তান নদীতে আইলাম
জয় গঙ্গা গোদাবরী ভাটিশ্বরী জননী
দোহাই মাগো বদর আলি
আমার গাঙ্গের তুফান হয়ে যাওরে পানি।
দোহাই কালী (৩)।।

--শিবপদ মৃধা।

ঘ. ছড়ি পড়া :

দলের প্রত্যেকের নামে এক ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা গরাণ কাঠি নেওয়া হয়। প্রত্যেক লাঠিতে প্রত্যেকের নাম ধরে মন্ত্র পড়ে গুণিন গামছার খোটায় গিঁট বেঁধে দেন। এতে কামোট কুমির মাছ বা কাঁকড়া ধরবার সময় কামড়ে নিতে পারে না।

বিচ-মে-আল্লা হে-নের-রহিম
এই লাঠি পড়ে দিলাম
এই লাঠি এই খুঁটে বাঁধা রয়
কার আজ্ঞে—মহাদেবের আজ্ঞে
লাঠি আমার পর্বত, লাঠি আমার ধার
একলাখ আশি হাজার পীর।
বিষের জানোয়ার ফিরে নাহি চায়।
শিঘ্র করে লাগ্‌গে (৩)।।

—সৃষ্টিধর সর্দার

ঙ. নদী বন্দ :

নদীতে নেমে, 'মশাল পট্টি' জলে ছুপে ধরে মন্ত্র পড়তে হবে। নদীবন্দ করার পর সাঁইদাররা নদীতে নেমে ইচ্ছা মতো মাছ-কাঁকড়া সংগ্রহ করতে পারেন।

মহাল করি আমি চণ্ডীর পুত
চাঁদ মারতে পারি সূর্য মারতে পারি
মায়ের ডান হস্তে ধুনুচি, বাম হস্তে সরা
রণে বন্দ করি খাঁড়া, নদীতে কুম্ভির,
পুত বলে তুমি কি করিতে পার?
আর মারতে পারি রাগ।
তোর মা সেজে এল দক্ষিণ পাড়া।
গর্তের সাপ বন্দি আর বন্দম রাগ।

বনেতে বাঘ

খিলরে বিল বজ্রের খিল
সাপ-সাপিনী শত জন্তুর মুখে দিই খিল।
আমার এই বাঁকভর নদী করি বন্দ
কাজ না ফুরালি নেই কোন সম্বন্ধ।
কার আজ্ঞে--দোহাই আলি
রক্ষা কর তুমি মা কালী।।

--নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

চ. জল পড়া :

নদীতে জঙ্গলে অবস্থান কালে, বাও-বাতাস লাগলে, ভয় পেয়ে জ্বর হলে তাব নিরাময় কল্পে গুণিন জলপড়া দেন।

কালীর আদেশে চলে দান-দূত
মারি কোঁত্‌কা ভাগে ভূত।
ভূতভাগে প্রেত ভাগে আর ভাগে রাগ
পানীর কুম্ভীর ভাগে বনে ভাগে বাঘ।
আলীর তালাক লাগে--আমার এই মালে যদি থাকো
মালেতে মরো। তোমার মোক্কা মদিনার মাথা খাও।
ধুত্‌-ধুত্‌ মারি কোঁত্‌কা ভাগে ভূত,
যারে যারে সব ভস্ম হয়ে যা।
ব্রহ্মার অনলে জুড়িলাম বাণ
ছোট বড় বীর না সয় টান।
ধর্মের বরে বাণ তুলে নিলাম হাতে
এক্কেতে পড়ে এক তিকের চাঁদ
দুইয়েতে পড়ে দুই তিকের চাঁদ।
তিন্‌কে পড়ে তিন্‌কে পৃথিবী
চারিতে পড়ে চতুর ভুজ নারায়ণ।
পাঁচেতে পড়ে পঞ্চভাই পাণ্ডব
ছয়েতে পড়ে সাঁতালী পর্বত।
শ্বেতকাটে ভেদ কাটে, বাও-বাতাস কাটে
ডাকিনী-যোগিনী আল্লার হুকুমি ভস্ম হয়ে যায়।
লৌহার কোট আমার এই নৌকার।
আল্লাকে হাই হজরত আলি
শত্রুর মুখে পড়ুক বজ্রের তালি
আল্লাকে হাই হজরত আলি
আমার এই নৌকার পাশাপাশি থেকো।।

--শিবপদ মৃধা

ছ. নৌকা বন্দ :

আমার এই মাল-খাল-নৌকা বন্দী
জ্বালাও জ্বলিল জালাল লবকুশ
জ্বলিল পথে আছে গোপনে আল্লার
নাম করিস করতী মুর্শিদ ভরসা
আলি এসে হও হেক আল্লা লায়লাহা
মহম্মদ রসুল আল্লা আল্লা হুতমাল
কুত জবরুল দেহে দোহাই আল্লা আলি
মদতের এই রাত্রির মধ্যে আমার এই মালে-খালে
এই নৌকার উপরে যে দিবি পা
যে করবি ঘা যে করবি হাঁ
জ্বালাল শার হুকুমি জ্বলে যাবে গা
দোহাই জালাল শা (৩)।।

--ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

গ. ঝড়-ঝঞ্ঝা :

ক. বিল-ঝামটা :

অমাবস্যা মঙ্গলবার খাকিনিংড়ে ধিক্‌ড়ে পা
ঝড়-ঝামটা বাত-বাতাস সব যাও দূরে ভূত।
আর মারতে পারে বাসুকি।
বাঘ-দানবের মধ্যি-মারি দু'হাতিয়া বাড়ি।
হাজার বিঘা জমিন লইয়া পড়ল লোহার গড়।
হুড় মুড়িয়া ঝড় ঝামটা পালায় উর্ধ্বমুখে
থাক বন্দম তিনমাস এই দুনিয়া জুড়ে

আমি যাত্রা করিলাম চণ্ডীর পুত
চণ্ডীর পুতকে কে মারতে পারে
বাম-হস্তে লোহার মুদ্‌গুর, ডানহাতে দড়ি
বাড়ি খেয়ে বাঘ-দানক করে ঝড়ফড়
তিন দাগে পুত আঁকি হানি তার বুকে।
দেখিয়া বলেম চণ্ডী চামুণ্ডা মুখী
মক্কা-মদিনা-তালাক লাগে

বিল-ঝামটা দিলাম গেড়ে (৩)।। —ঐ

বিল ঝামটা দেবার সময় মাটিতে স্বস্তিকা চিত্রের মত মূর্তি আঁকেন গুণিন।। মূর্ত্তি আঁকা হয় লোহার কাটারি দিয়ে। সুন্দরী-গরাণ-কুল-বাইন-কেওড়া প্রভৃতি পাঁচ গাছের কাঠ দিয়ে উক্ত মূর্তির উপর হোম করা হয়। অতঃপর ছাই-ভস্ম হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাই-ভস্ম যত দূর যাবে তত দূর পর্যন্ত ঝড়-ঝামটার হাত থেকে মুক্ত থাকা যাবে বলে বিশ্বাস করেন গুণিন-বাওলেরা।

খ. আতাল কুর্সি :

কালীর চলনে চলে যত দৈত্যদূত
বাও ভাগে বাতাস ভাগে আর ভাগে নাগ
যারে যা সব করি হুহুংকার
আতাল কুর্সি বন্দম পাতাল কুর্সি বন্দম
পশ্চিমে কালীঘাটে বন্দম কালকে কালীমা

ঝড়-ঝামটা মারি কোঁক্‌তা ভাগে ভূত।
পানীর কুম্ভীর ভাগে বনের ভাগে বাঘ।
কার আজ্ঞে—কালীঘাটের কালীমার।।
কেতাব-কুরাণ বন্দম
উত্তরে বন্দম হিমালয় গিরি বন্দম জগত-যম্

আকাশে বন্দম চন্দ্র-সূর্য পাতালে বন্দম নাগ
শূন্যে বন্দম বাও-বাতাস আর ঝড়-ঝামটা
তিন কোন পৃথিবীর বন্দম করিয়ে যতেক
হাত মোর গড়ুর, পা মোর গড়ুর গড়ুর সর্ব্ব গা
আমার সাঁই ছাড়া যদি আর কোথাও রও
চলে জ্যাতি ঘুঙ্গুর বাজে নূপুর বাজে পায়
হাত মোর গড়ুর পা মোর গড়ুর গড়ুর সর্ব গা
ইন্দুর-বান্দর মহিষ-গণ্ডার বাও-বাতাস ঝড়-ঝামটা

দেশে-দেশে মনুষ্য বন্দম বনে বন্দম বাঘ।
ভূত-প্রেত বন্দম বন্দম নিরাকার।
আমার আশীষ থেকো উনচল্লিশ পবন
ব্রহ্মার খিলোলাম সাপ আর বাঘ
এমাম্ হোসেনের মাথা খাও।
পথ ছেড়ে দাও পোকা-মাকড় গড়ুর গোঁসাই যায়
ব্রহ্মার বরে খিলোলাম সাপা আর বাঘা।
আমার এই সাঁই ছাড়া লোকজন ছাড়া

যাও অন্য ধাঁই এমাম-হোসেনের দোহাই।।
কা বা কা বর্বে কা ফিকা আমি কা
ফুলি কা মাল-খাল থুয়ে দূর-দূর পাল্লায় যা
দোহাই সম্রাট জোঃ আলি খাতেজের নাথ তুমি বনবিবি
মা আমার সাই সমেত রক্ষা কর আলেকের মা সুভদ্রা
আমার এই সাই ছাড়া যদি যাও অন্য ঠাঁই এমাম হোসেনের মাথা খাও
দোহাই এমাম হোসেন (৩)।।—দিব্যচরণ মৃধা

'আতাল কুর্সি' পাঠ করবার সময় গুণিন দলের প্রত্যেকের জন্য ঢাল চাকার পাতা নিয়ে, তাতে প্রত্যেকের নাম লিখে মন্ত্রপূত করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেন।

গ. হাওয়া বন্দি :

মালেক মালেক লাগিবে না হয় রাহিবে
ভুবন মণ্ডলে করিলাম রামের গণ্ডী আড়ে দিকি দশ রসি
নৌকার পাড়া রহিল বন্দি আড়ে দিকি দশ রসি
পাড়ার পশ্চিমে থেকো লক্ষ্মণ পূর্বে থেকো রাম
দক্ষিণে রহিল অর্জুনের বাণ উত্তরে বন্দ করিলেন পবনের বন্দন
আড়ে দিকি দশ রসি
পাড়া বন্দ করিলেন বাবা বীর হনুমান সীতার সঙ্গে বন্দিলাম দিনে দশরথ
গঙ্গাদেবী বন্দিলাম দশের ভগীরথ খোদার তক্তে দিয়ে হাত
ঝড়-ঝামটা করিলাম তফাত্‌ এই কথার সাক্ষী নির্ঘাত দিননাথ
দোহাই তোমার ধর্মের শিঘ্র শিঘ্র লাগ।।—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

যথাক্রমে ক. বাঘ-কুমির-মধু-মাছ-কাঠ, খ. নদী-সমুদ্র-নৌকা, গ. ঝড়-ঝঞ্ঝা এই তিনটি ভাগে জঙ্গলের মন্ত্রকে ভাগ করে দেখান হলেও 'হাওয়া-বন্দী, দিয়েই আপাতত 'জঙ্গলের মন্ত্র' শেষ করা হলো। এছাড়া বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, জঙ্গলের মন্ত্র একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। 'জঙ্গলের মন্ত্র' কি প্রত্যেকটা বিষয়ে কাজ করে? বন সংলগ্ন এলাকায় যুগের প্রভাব পড়ায় এ রকম সংশয়, অবিশ্বাস জিজ্ঞাসার চিহ্ন হিসেবে প্রকট হয়ে উঠেছে। যদিও যাত্রা করার পূর্বে দেবদেবী ও পীর-পিরাণীর হাজত-মানত, পূজো প্রার্থনা, নৌকা পূজা, নদী পূজা, লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা সবই চলে। নৌকা ছাড়তে ছাড়তে স্মরণও নেন পাঁচ পীরের :

আমরা আছি পোলাপান
গাজী আছে নিখা বাণ
শিরে গঙ্গা দরিয়া
দক্ষিণ রাখে স্মরিয়া
পাঁচ পীর বদর বদর।

কিন্তু সমানুপাতিক হারে জীবন যাত্রার পরিবর্তন, শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনের তাবড় তাবড় গুণিনগণ বাঘ-কুমিরের পেটে গেছেন ; মন্ত্র তাদেরকে

বাঁচাতে পারেনি। তবুও আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা বিশ্বাসের গায়ে এতটুকু চিড় ধরেনি। সরল বিশ্বাসে তাঁরা বলেছেন--'হয়ত কোথাও-না-কোথাও ফাঁক ছিল'। গুণিন বাওলেদের অবশ্যই মনে রাখতে হয়—যে সব মন্ত্র বনে প্রয়োগ করা হয় তা আবার বনেই ছেড়ে আসতে হয়। কাজ সারা হয়ে গেলে, মন্ত্রের মেয়াদ অতিক্রান্ত না হলেও এ-নিয়মের নড়-চড় নেই। এমনকি মন্ত্র পাঠ ও নির্বাচন কালে সঠিক সময়ে সঠিক মন্ত্র বিনিয়োগ করতে না পারলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। সুন্দরবনের গুণিনদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে :

"যদি মন্ত্রের করেছ ভুল
করবে নির্মূল।"

কে নির্মূল করবে? উত্তর—মন্ত্রের সাহায্যে যাদেরকে হেনস্থা করা হয়েছে, তারাই। কারণ :

"মন্ত্রের ফাঁক
জীবনের ফাঁক।"

সম্পূর্ণ মন্ত্রের একটুখানি ভুল হলে, রক্ষা নেই। সেই কারণেও মন্ত্র শেখা সবার হয় না, সবাই মন্ত্র শিখতে আসে না। প্রবাদে আছে :

"মন তোর
রাখ্ আন্তোর"।।

কিন্তু মন্ত্র 'আন্তরে' তথা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন নি গুণিনেরা। সব মন্ত্রে কাজ হয় না জেনেও এই মন্ত্রকেই সম্বল করে সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে পাড়ি জমান জঙ্গল নির্ভর মানুষেরা।—'কিছু একটা তো আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। নইলে লড়ব কিভাবে?' আসলে লড়াই যেখানে আদিম এবং প্রধান দ্বন্দ্বটা যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, এই মূল কাঠামোটারই বদল হানি বলে, আধুনিক জীবনের চিন্তা চেতনার প্রভাব জনজীবনে শিকড় বিস্তার করলেও সেই আদিম কালের বিশ্বাসটুকু রয়ে গেছে। 'কিছু একটা হাতিয়ার না থাকলে জঙ্গলে কাজ করা যায় না'।—মন্ত্র হলো সেই হাতিয়ার।

ঘ. সাপ :

নদী-নালা-খাল-বিলের দেশ সুন্দরবনের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সাপকে এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। সমস্ত দিনের মধ্যে কোনো-কোনো সূত্রে সাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবেই। সাপের ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ যুগযুগ ধরে কত না প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। কখনও দুধ-কলা দিয়ে সাপকে পূজা করা হয়েছে, কখনও মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক কিংবা গাছ-গাছড়া প্রয়োগ করে সর্পাঘাতের চিকিৎসা করা হয়েছে—এই প্রয়াস আজও অব্যাহত। যাঁরা মন্ত্র বলে কিংবা বিভিন্ন ঔষধাদি বিনিযোগ করে সমাজে তাঁরা 'বিষ-বৈদ্য' বা 'ওঝা' নামে পরিচিত। ওঝাদের মধ্যে কেউ কেউ গুণিন আবার 'রোজা' নামে খ্যাত। এঁরা কানে ও গায়ে ফুঁ দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে, ঝাড়-ফুঁক করে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বিপন্ন মানুষকে নিরাময় করেন। সাপ কয় প্রকার, কোন সাপের কেমন বিষ, কোন সাপ কিরকম সময় কামড়ালে তার প্রক্রিয়া এবং চিকিৎসা কেমন হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে

ওঝাদের জেনে রাখতে হয়। তাঁদের মতে—সাপ এমনিতেই কামড়ায় না। সাধারণত দু'রকম পরিস্থিতিব উদ্ভব না হলে সাপ দ্বিতীয় জনকে দংশন করে না। পরিস্থিতি দুটি—ক. কোনো রকমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে, খ. নিজস্ব-অতিবিক্ত বিষে জর্জরিত হলে।

সাপ যে-সময় গর্তের বাইরে থাকে অর্থাৎ শীত মরসুম ব্যতিরেকে, আর যে কোনো সময় দংশন করতে পারে। বস্তুত, বর্ষা ও শরৎকালে সাপের প্রাদুর্ভাব বেশি। আবার এই সময়ই তাদের বাচ্চা দেবাব কালও বটে।

প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, জলে কিংবা স্থলে সর্বত্রই সর্পাঘাত হয়। প্রত্যক্ষভাবে সর্পাঘাতের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্পাঘাত হয় ব্যক্তির অবচেতন মুহূর্তে অথবা ঘুমের ঘোরে। মাটিতে বিছানা পেতে শুলে, সাপ মাটি ফুঁড়ে উঠে দংশন করে, মাঠে-ঘাটে, খালে-বিলে, জঙ্গলে কাজ করার সময় ব্যক্তির অসতর্ক মুহূর্তে দংশন করে। সাপ মশারির মধ্যে ঢোকে, ছাদের উপরেও ওঠে। সর্পাঘাতকে নিযতির সঙ্গে তুলনা করেছেন বিজ্ঞজনেরা। বলা হয় 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। নিয়তি যার কপালে সর্পাঘাতেব কথা লিখেছেন তাকে সাপে কাটবেই। সেই কারণে প্রবাদে বলা হয় "সাপের লেখা আর বাঘের দেখা।"

সর্প বিশেষজ্ঞ ওঝা-গুণিনেরা বলেন—বাগানে, উঠানে, শ্মশানে দেবায়তনে, শুকনো গাছে, বটগাছের মূল বা কোটরে, পাকুড-চালতা-সজিনা গাছের মূলে মানুষ দংশিত হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। শনি-রবি-মঙ্গলবারে পঞ্চমী-অষ্টমী চতুর্দশী ; অমাবস্যা-পূর্ণিমা তিথিতে ; পূর্ববষাড়া-চিত্রা-অশ্লেষা-মূলা-শ্রাবণা নক্ষত্রে সর্পাঘাত হলে মৃত্যু-বিশ্বাস গাঢ় হয়। তাছাড়া প্রত্যুষে, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা, মধ্যরাত্তিরে সর্পাঘাত বিপদজনক বলে গণ্য। ব্যক্তির মাথায়, ভ্রূ মধ্যে, ঠোঁটে, চোখে, হাতের তালুতে, স্তনে, কাঁধে, উদরে, লিঙ্গে, নাভিতে দংশন হলে মৃত্যু—রোধ কঠিন হয়ে পড়ে।

সাপে দংশন করলে চোখের রং তাম্র বা নীল বর্ণ হয়। গাল দিয়ে লালা ঝরে। ক্ষত স্থান তীব্র বেদনা যুক্ত হয়। সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। ক্ষত স্থান চাকার মতো গোলাকার, পাকা জামের মতো নীল-সাদা-রক্তবর্ণ হয়। শরীরের তাপ মাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে—জল দিলেও ঠাণ্ডা অনুভূত হয় না, রোমাঞ্চিত হয় না। দংশিত ব্যক্তি বারংবার মল ত্যাগ করে, তৃষ্ণার্ত হয়, সর্দি হয়, বুক ব্যথা করে, নাকি সুরে কথা বলে, সন্ধি স্থান গুলো ব্যাথা করে, হাই ওঠে, শরীর কাঁপতে থাকে, হিক্কা ওঠে, শ্বাসকষ্ট হয়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে—ইত্যাদি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

লিঙ্গভেদে পুরুষ এবং স্ত্রী সাপ থাকলেও জাতি হিসেবে সাপ চার প্রকার।

ক. ব্রাহ্মণ—যাদের শরীর উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত এবং সুগন্ধযুক্ত।

খ. ক্ষত্রিয়—বেশ ঝকঝকে তকতকে দেখতে, এবং ক্রোধ পরায়ণ।

গ. বৈশ্য—যাদের শরীরে চন্দ্র-সূর্য, ছাতা বা পায়ের চিহ্ন দেখা যায়।

ঘ. শূদ্র—যাদের গায়ের রং সাধারণত হাতি বা মহিষের মত।[৫]

শ্রেণীগত বিন্যাসে সুন্দরবনের সাপকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ক. বিষধর, খ. বিষহীন, গ. ফণাহীন, ঘ. সংকর [কেউটা ও গোখুরার সঙ্গে আইজার মিলন]।

বিষধর সাপের মধ্যে চৌসাপা আবার চার প্রকার। যেমন ১. কেউটা আট প্রকার, ২, গোখুরা পাঁচ প্রকার, ৩. আইজার নয় প্রকার, ৪. কানড় চার প্রকার, বোড়া চৌষট্টি প্রকার এবং বিজজর্ড়ির শ্রেণী নির্ণয় সবসময় সম্ভব না হলেও বহু প্রকারের দেখা যায়। বিষহীন সাপ হল ১. দাঁড়াশ প্রজাতীয়, ২. বরাহ-চিতে-ময়াল প্রজাতীয়।

শরীরের রং অনুযায়ী ও সাপের শ্রেণী বিভাজন সম্ভব। যেমন :

ক. অনন্ত জাতীয়—মাথায় ও পিঠে শ্বেতপদ্মের চিহ্ন।

খ. কুলিক জাতীয়—মাথায় শঙ্খ চিহ্ন

গ. বাসুকী জাতীয়—পিঠে পদ্মচিহ্ন

ঘ. তক্ষক জাতীয়—পিঠে শশকাকৃতি চিহ্ন

ঙ. কর্কেট জাতীয়—পিঠে ত্রিনেত্র চিহ্ন

চ. শঙ্খপাল জাতীয়—মাথায় ত্রিশূল ও অর্ধ চন্দ্রকার চিহ্ন

ছ. মহাপদ্ম জাতীয়—পিঠে রক্তবর্ণের বিন্দু, পঞ্চবিন্দু ইত্যাদি চিহ্ন থাকে।[৬]

সুন্দরবনের ওঝা-গুণিনেরা সর্প দংশনকে 'কাটিঘা' 'পোকায় কাটা' 'কালে খাওয়া' 'সাপে কাটা' ইত্যাদি বলে থাকেন। লোকসমাজেও এই অভিধা প্রচলিত। ওঝা-গুণিনরা সর্প বিষয়ক মন্ত্রকে দুটি কারণে প্রয়োগ করেন। ক. সর্পাঘাতের চিকিৎসা, খ. সর্প বশীকরণ।

সর্প বশীকরণ বলতে সাপকে জীবন্ত অবস্থায় ধরা, পোষ মানানো, সাপ খেলা ইত্যাদি। বশীকরণ মন্ত্রও আবার দুই ধরনের কাজে প্রয়োগ করেন ওঝা-গুণিন। ক. দংশনকারী সাপকে খুঁজে অকুস্থলে আনা। এজন্য কড়ি মন্ত্রপূত করে দিলে, তুলা রাশির হাত মন্ত্রপূত করে চালালে, কিংবা বিশেষ ক্রিয়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে মেটে হাঁড়ি জ্বালালে সাপ আসে বলে বিশ্বাস করা হয়। খ. সাপ সংগ্রহ। সাপের আহ্বান মন্ত্র, চালান মন্ত্র, দুধ কলা মন্ত্রসহ বিশেষ গাছের শিকড়-লতা-পাতা প্রভৃতির দ্বারা সাপ সংগ্রহ করা হয়।

ওঝা-রোজা-বৈদ্য-গুণিন-ওস্তাদ যে নামেই তাঁদেরকে অভিহিত করা হোক না কেন, তাঁদের মধ্যে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, কাটি ঘা হলে ৬৪ কাহন মন্ত্র রোগীকে বিষহরির স্মরণ করে ঝাড়াতে হবে। কারুর কাটি ঘা হয়েছে, রোগীর বাড়ি থেকে গুণিনকে ডাকতে পাঠান হলো। ওঝা সংবাদদাতার কাছ থেকে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে নিলেন। এবং সংবাদ দাতারাই বুকে অথবা ব্রহ্মতালুতে চাপড় মেরে মন্ত্র পড়লেন :

ওঁ খণ্ডে হাঁচুনি মুণ্ডেদাক্যনুকে গুল   পত্রে শুনিলাম মা—
মো যাইয়ে করব কিশো   মারি চাপড়
নাহি বিষওঁ ও (৩)।।—বিদ্যচরণ মৃধা

সংবাদদাতার বুকে অথবা ব্রহ্মতালুকে মন্ত্র পাঠ করার পর তিন চাপড় মেরে গুণিন বললেন—"নাহি বিষওঁ।" অর্থাৎ বিষ নেই। অথবা কোনো কোনো—গুণিন 'তামাক পড়া' খাইয়ে বললেন—"নাই বিষ মা মনসার আজ্ঞায়।" সংবাদদাতাও একই কথা উচ্চারণ করলেন। রোগী দূর থেকেই বিষমুক্ত হলো। অথচ মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে সংবাদদাতার

উপর। এই রকম করলে অর্থাৎ সমপ্রক্রিয়া জাদুর প্রভাবে রোগীর দেহের বিষমুক্ত হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে।

সংবাদদাতা বাড়ি ফিরে যাবার পর ওঝা সেজে-গুজে বেরুবার আগে 'আপন সারেন', 'ঘরবন্ধ' করেন। তারপর মন্ত্রপাঠ করে ফুঁ দিয়ে নিজের কাপড়ের খুঁটে গিরু দিয়ে 'বিষকুণ্ডলী', করে নেন। অতঃপর রোগীর বাড়ি এসে রোগীব ক্ষত স্থানের উপরে 'তাগা বাঁধেন', চুলটানা 'ঝরা-মন্ত্র', কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস প্রভৃতি মন্ত্রপূত করে ক্ষতস্থানে বসিয়ে রোগী পরীক্ষা করেন। একই সঙ্গে খেতে দেন ঈষেন মূল, মরিজ, নিম শেকড়, আকন্দ, আদা, তুলসী ইত্যাদি। অতঃপর মনসা মায়ের 'আসর' পেতে, লক্ষণ অনুযায়ী পর্যায় ক্রমে মন্ত্র প্রয়োগ করেন ও বিভিন্ন গাছ-গাছড়া খাওয়ান, তাবিজ-মাদুলি দেন, নীলা-পাথর প্রভৃতি দেন, পালন করেন নানা প্রকার ক্রিয়া-অনুষ্ঠান। মন্ত্র পাঠ করার সময় হাতে রাখেন চামর অথবা নিম, হেন্না, নল প্রভৃতির ডাল কিংবা কামাক্ষা-মাটি বা সরিষা।

একজন ওঝা একটি রোগ উপলক্ষে এক ধরনের মন্ত্র ব্যবহার করেন, আবার অন্যত্র সেই একই রোগের কারণে অন্য ওঝা অন্য বয়ানের মন্ত্র পাঠ করেন। বিশেষ বিশেষ সাপের দংশনের জন্য বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বর্তমান। কোন সাপে কামড়েছে তা জানতে পারলে এক ধরনের মন্ত্র, আবার না জানতে পারলে অন্য ধরনের মন্ত্র ; দংশনের পর সাপের মৃত্যু হলে তার জন্য আরেক মন্ত্র। অর্থাৎ নানাদিক থেকে বিষ ক্রিয়াকে বিনষ্ট করার জন্য নানা ধরনের মন্ত্র বিনিয়োগ করেন সর্প-চিকিৎসক।

মন্ত্রের শিরোনাম গুলোও বিভিন্ন ধরনের। যেমন—মুয়াঝাড়ন, পুছন, গাঁটুলি, তাগা, কুণ্ডলি, বগী, লক্ষণ গণ্ডী, ধূনোপড়া, টুসকি সার, ব্রহ্মাচাপড়, ঝাপান, ভাসান, বাণ, বাণকাটা, জ্বালান, শিবসার, রাধাসার কৃষ্ণসার, অগ্নিগড় ইত্যাদি।

পুরুষ এবং স্ত্রীভেদে যেমন মন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান, তেমনই দিন ও রাত্তির ভেদে মন্ত্রের তারতম্য সূচিত হয়। স্থান ও পরিবেশ বিশেষ মন্ত্রের প্রয়োগ বিভিন্নতাও অন্য গুণিনেরা মানেন। আবার পরিস্থিতি অনুসারে অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে সাপে কামড়ালে তাঁর গর্ভের শিশুকেও ঝাড়াতে হবে। নইলে উক্ত বিষে শিশু আক্রান্ত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়।

মন্ত্র : ১. আপনি বন্ধন বা আপন সারা :

আগে যায় দুর্গা পিছনে যায় দূত — আমি যাই চণ্ডীর পুত
কাঁট খোঁচা বনের বাঘ — পানির কুম্ভির খাদের সাপ
তোমরা ভাই—পঞ্চভাই ছাড় পথভাই — ঈশ্বর মহাদেবের কাছে যাই।
কার আজ্ঞে-হজরথ মুক্তোজা আলীর আজ্ঞে — আমার এই বন্দন সাতরাত সাতদিন থাকগে
আমার এই বন্ধন যদি নড়ে — হজরথ আলীর ছের কেটে দোজাকে গে পড়গে

দহাই হজরথ (৩) দোহাই তোমার ধর্মের।।—পরেশচন্দ্র হাউলী

মন্ত্র : ২. ঘরবন্ধন :

বন্দ বন্দ বেড়াজাল ঘরের বন্দ চারিচাল
আড়ে দীঘে বন্দিলাম অক্ষরে অক্ষরে ইন্দুরের খাল-গর্ত্ত ইটের বন্দ
নাকেব নক্. সাপ-শোক-করাত ভূত-প্রেত-গয়-গরু সর্ব্ব
আমার এই বন্দেবের বাইরে থাক কার আজ্ঞে—বড়বীর বাপ নরসিংহের আজ্ঞে
১২ বছরকে ১৩ মাস জুড়ে থাক হুম হাম বয়ছ।।—ঐ

মন্ত্র : ৩. হুল ঝরা মন্ত্র :

ইড়কি ফিড়কি দোরে আনা সবকিছু বিষহরির জানা।
মা মনসা দিলেন বর হুল ঝরাতে নেই ডর।
কি কি সাপ কাকে খায় বিষহরির ভরসা পায়।
চিতা কাল আর গোখুরা আরও কত ভাঙা-চরা।
খালে-জলে কত যায় কেবা তার খোঁজ পায়।
একবার কড়ি চুপচুপে দেহ জ্বলে বিষের কাঁপে।
কি করি করি কি উপায় ধনন্তরী ধাইয়া আয়।
চৌসাপার মন্ত্রে ওঝা তখন বিষ করিল উৎপাঠন।
কালকুটির বিষ জ্বলে অঙ্গ জ্বলে আঁধার ঘরে মানিক জ্বলে।
বিষহরির স্মরি বিষ উপড়াই তিন শিষ্য মোর রহিম মর্দনা আউল্যা সাঁই
ইহার অঙ্গে আর নাই বিষ নাই মনসা দেবীর আজ্ঞায় বিষ দাঁত নাই।।

—মহাদেব মণ্ডল

সাঁপের দাঁত ক্ষতস্থানে আছে কিনা তা জানার জন্য লম্বা চুল নিয়ে, তার দুই মাথা ধরে, ক্ষত স্থানের উপর থেকে নীচে টানতে টানতে মন্ত্র পড়তে হয়।

মন্ত্র : ৪. থালাপড়া :

উঁচু নীচু কুটরি তাতে ওঠে গোয়া লোট্ পোট্ নর মন খন্দ খায়
বিষ থাকে খোদা নির্বিষ করুক পদ মন চলে পানিকে
তায় তোহনুয়া লাগ নর সিংহ মহাবীর পূজা করে বিষ হরে
বিষ থাকে খোদা নির্বিষ করে দোহাই গোড়ুনিয়া নাগ মহাবীর
দোহাই নরহরি বাপ (৩)।।—দিব্যচরণ মৃধা

মন্ত্র : ৫. বিষ বন্ধন :

আদ্যের দেবতা বন্দ বন্দ নিরঞ্জন ধর্ম্মের বন্দনা করি ধর্ম্মেরই কারণ।
বন্দির জয়-দুর্গা হয়ে সাবধানে মনসা মাতার বন্দি নাগেরই প্রণামে।
শিক্ষা দীক্ষা গরু বন্দ বন্দ ব্রহ্মার চরণ যাহা হইতে দেখিলাম এই মরুত ভুবন।
রোহিণী যোগিনী বন্দ মনস্থির হয়ে গুণিন মনেরি বান্দ সাবধান হয়ে।

বন্দিতে বন্দিতে যে বা এড়া হয়ে যায় কটি কটি প্রণাম করি তাহার পায়।
থাক থাক বন্দন আমার সাড়ে সাতদিন থাক আমার এই বন্দন অমুকের গায়ে গিয়ে লাগ
বিষবিষ মহাবিষ বন্দিলাম মনসার বরে তিলমাত্র হয়ে বিষ থাক খুঁটের ভিতরে।
দোহাই মা মনসা (৩) দোহাই তোমার ধর্মের।

—লক্ষ্মীকান্ত হাউলী

এই মন্ত্র পড়ে ওঝা নিজের কাপড়ে খুঁটে গিঁট দিয়ে বিষ বন্ধন করে' রাখেন—যাতে রোগীর গায়ের বিষ সারা শরীরে আর ছড়িয়ে না পড়তে পারে।

মন্ত্র : ৬. তাগা বা ডোর বন্ধন :

অহমেশ্বর ব্রহ্মাতাগা ব্রহ্মা দিলেন রূপে থরহরি কোথা বিষ ধর্ম তাগা দেখে।
হে ধর্ম তাগায় দাও দৃষ্টি তাগা ছুটে অমুক হলেন নির্বিষ।
উজান তাগা বাদ শংকা মহাদেবের বব উজান তাগা ছুটে বিষ অন্তরীক্ষে মর।
কামাক্ষ্যা হতে এল শ্বেতকাক অমুকের অঙ্গের কালকুটা চৌসাপার বিষ
তাগা ছুটে হও নির্বিষ দোহাই ব্রহ্মার আজ্ঞা
বিষহবি কালীর আজ্ঞা।।—ঐ

শরীরের ক্ষত স্থানের উপরে টিপ ধরে মাটি নিয়ে অথবা দড়ির বাঁধনে তাগা মন্ত্র পড়েন গুণিন।

মন্ত্র : ৭. হাত চালা :

হাত চণ্ডী হাত চলে অচল চলে সুচল চলে
মনসা চলে মহাদেব চলে ভূত চলে মাটি চলে
গঙ্গা চলে যমুনা চলে এ হাতে খুলি চলে
চলরে হাত তাড়াতাড়ি চল দোহাই তোর রামসীতার দোহাই লাগে
মা মনসাব আজ্ঞে শিঘ্র শিঘ্র করে লাগগে।।

—মহাদেব মণ্ডল

তুলারাশির হাতে তামা-তুলসী-গঙ্গাজল-দুর্বা-ধান-দিয়ে, মন্ত্রপূত করে ক্ষত স্থানে রাখেন গুণিন। মন্ত্র প্রভাবে যত দূর বিষ বিস্তার লাভ করেছে হাত তত দূর পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। এর দ্বারা ওঝা বুঝতে পারেন, বিষ দেহের মধ্যে কি পরিমাণ আছে।

মন্ত্র : ৮. বিষ চালা :

ওরে আল্লা কি করিলি ওরে ঘা চাইতে মুখ ঘা মুখেতে মরে
সাপের নাম মোহন কলা বিষের নাম ফণি মা মনসার স্মরণে বিষ হয়ে খাওরে পানি।
আচাল চালি সুচাল চালি কণ্ঠ দেবী তোমায় চালি হাড়েতে-হোড়েতে চালি চৌষট্টি বিষ চালি।

শোনরে বিষ আমার বচন
আগোম-পুরাণের কথা শোন দিয়া মন।।
যে শিব সেই শিব সর্বলোকে জানে
আঘাতে খামারের বাণ সর্বলোকে মানে।।
আঘাতে খামারের বাণ নরগঙ্গার ধারে
হাড়ে যাতে হাড়ে মর
রক্তে থাক রক্তে মর।
সঞ্চে থাক সঞ্চে মর
যে স্থলে ধরিতে বিষ সেই স্থলে মর।
আয় চন্দ্র রোহিনী বয় চন্দ্রগুরু
আমার এই হুকুম যদি নড়ে
শিবের জট কেটে ভূমিতে পড়ে।
কার আজ্ঞে--দোহাই মা মনসার আজ্ঞে
শিঘ্র শিঘ্র করে লাগগে।।

--লক্ষ্মীকান্ত হাউলী

তিন বার এই মন্ত্র পাঠ করে গুণিন দীর্ঘ ফুঁ দেন। এতে রোগীর শরীরের সমস্ত বিষ এক জায়গায় অর্থাৎ ক্ষত মূলে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।

মন্ত্র : ৯. আসর বন্ধন বা লক্ষ্মণ গণ্ডী :

মাটির থানের উপর মনসা সিজের ডাল পুঁতে, পরিষ্কার পিঁড়ির উপর রাখা স্বস্তিকা আঁকা ঘটি, আমের পল্লব, লাল ফুল, পূর্ণ পাত্র, পাঁচ সিকে পয়সা নিয়ে গুণিন আসর পাতেন রোগীর বাড়ি। রোগীকে আসরের কাছে আনা হয়। বাঁট হীন ছুরি দিয়ে আসরও রোগীর বিছানা সমেত ঘরে দাগ কেটে দেন গুণিন। দাগ কাটার সময় পূর্ব দিক থেকে শুরু করেন। একেই 'আসরবন্দি', 'লক্ষ্মণগণ্ডী' বা 'বিছানাবন্দি' বলা হয়ে থাকে।

রাম লক্ষ্মণ সীতা এঁরা তিনজন যান বনে
রাম বলেন—লক্ষ্মণ ভাই বসে করি কি
লক্ষ্মণ বলেন—ধনুক বাণ জুড়ে আমি গণ্ডী করেছি।
গণ্ডীর উপরে উপরি ফুপারি বাও-বাতাস।
উপসর্গ, মহিষ গণ্ডার বাঘ ভাল্লুক ভূত প্রেত
ডান ডাকিনী যোগিনী যক্ষরক্ষ কিন্নর
আমার এই গণ্ডীর গায়ে যে কবিরে ঘা
ঠাকুর লক্ষ্মণের বাণে তার জ্বলে যাবে গা
পোহাই রাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী (৩)
দোহাই তোমার ধর্ম্মের (৩)।।

--দিব্যচরণ মৃধা

মন্ত্র : ১০. জান কয়েদ :

জান কয়েদ করার সময় ওঝা রোগীর চোখে-বুকে-নাভিতে তুলসীর পাতা রাখেন, আর আলো মাটি পড়ে মাথায় দেন। 'জান কয়েদ' অর্থাৎ শরীরটাকে বন্ধ রাখা হয় মন্ত্র-স্বরূপ-বর্ম দিয়ে, যাতে অশুভ শক্তি আক্রমণ করতে না পারে। দীর্ঘস্থায়ী রোগে অনেক সময় জান কয়েদ করে মৃতপথযাত্রীর পরমায়ু বৃদ্ধির চেষ্টা চলে ও প্রায়শ্চিত্ত করানো হয়।

কড়িকড়ি মহাকড়ি = ব্রজভূমে রেখেছিলেন =
ধড় রাখেন ব্রহ্মা = জীব রাখেন লতা = নাড়ী
রাখেন নাল কুণ্ড = বাও রাখেন বাত দণ্ডী = দন্ত
রাখেন নরপতি = জিহ্বা রাখেন সরস্বতী = নাক
রাখেন পবন = চক্ষু রাখেন তারা = কপাল রাখেন

চন্দ্র = হেটের উপর বন্দম = চৌদিকে ভুবন = ছালে
বন্দম = পালে বন্দম = রামে দিলেন কলা = লক্ষ্মণ
দিলেন মাটি = এই কাট কেটে ঘুমেছিল বাবন =
এলাসী বেলাসী = গণ্ডী দিলেন ভাববাণ =
অমুকের বুকে পোল লোহার চারচাল = এই
লোহাব চারচাল ঠেলে যে করিবি ঘা =
তাব শিক্ষা গুরুর মস্তকে পা = খালাই বাম
পা।।--নগেন্দ্র নাথ বর্মণ

মন্ত্র : ১১. বাণ কাটা মন্ত্র :

যে কালে কৃষ্ণচন্দ্র বনবাসে এল
অহিকালে সংসার
তাহা স্ফু ধীরু উপজিলা
শ্ববাণা সজ্জতে তজুন্তে
কতপ জপ ভাং জন্তে
বিষ্টি কাট সৃষ্টি কাট।
দেহান্ত চাহান্ত কাট।
শ্বর কড়া লওনি কড়া কাট।
আট খাপিস গণ্ডাপিষ্ট কাট।
কাট কাট বলি তাহার আজ্ঞে--
তেত্রিশ কোটি দেবতা জিনি বাণ সাধিল।
বিশ্বকর্মা হইলেন কামার।
কুতুরি স্বর ব্রহ্মারে।
রশি সানক্কর আসন টলন্তে
হাই কাট হাই কাট
ওড়া সন্দর কাট শাক্ষী সামল কাট
ওলট পালট কাট
খজুরি পিতা শুনি চিরকাল কাট
কালমো ভোবন করোয়াছি যাহা তাগো কাট
পিতা রামাক্কর কটি কটি আজ্ঞে।।

—মহাদেব মণ্ডল

২	৬	২	৬	২
৬	২	৬	২	৬
২	৬	২	৬	২
৬	২	৬	২	৬

বাঁট-হীন ছুরি দিয়ে মাটিতে উপরের এই আঙ্কিক-ছক কাটেন এবং মানুষের চিত্র আঁকেন। অতঃপর ছুরিটি উক্ত চিত্রের উপর ধরে রেখে মন্ত্র পাঠ করেন।

মন্ত্র : ১২ জলসার [মোথন] :

একটি মেটে হাঁড়িতে আঘাটের জল নিয়ে তিনটি দুর্বা ঘাস তুলসী পাতা ও আতপ চাল নেন গুণিন-ওঝা। এরপর হাঁড়ির গায়ে সিঁদুর দিয়ে ত্রিশূল আঁকেন ও মন্ত্র পাঠ করেন।

প্রথম মন্থনে বিষ ওঠে নাই জানি
দ্বিতীয়বার দেব-দৈত্য করে টানাটানি।
দ্বিতীয় মন্থনে বিষ উঠি উপছিয়া পড়ে
তাহা দেখি দেব দৈত্যে হা-হা হা-হা করে।
শিবের কাছেতে তখন ছুটিয়া যায়
বল বল দেবেব দেব কি হবে উপায়
এতেক শুনিয়া হর দেব মহেশ্বব
বারংবার বলেন হরি রক্ষ সত্বর।
তাই হরির তথাতে আসিল
হরেরে হরি আগে করে নিবেদিল
আপন কণ্ঠে বিষ করগো ধাবণ
নির্বিষ তুমি বিপদ তারণ।
হরির বাক্যে বিষ হর পান করে
গরল রহিল তাই সে-কণ্ঠভরে।
কণ্ঠভরা বিষ তাব নীলকণ্ঠ নাম
নির্বষ করিলেন তিনি এই ধরাধাম।
হরি হরি এইবার বিষ আন জলে
কোন সাপ কারে খায় কার বিষ জ্বলে।।

—মহাদেব মণ্ডল (মাদাই)

মন্ত্র : ১৩. ঝাপান :

'ঝাপান মন্ত্র' পাঠ করার সময় চামর অথবা নিম ডাল ব্যবহার করেন বিষ-বৈদ্য।

১২ মাস থাক জলে কাটে জলে করে আহার
ইহার ঘায় ঠেকিল প্রভু নাই কো নিস্তার।
গঙ্গা বলে ওগো দুর্গা তুমি বড় রাগো
বিষ খেয়ে ঢুলেছে নাকি তোমার প্রভু।
এই কথা শুনে দুর্গা বলেন মনে—
কালকূটীর বিষ-তোরে
ঋতু-ভরসা-রাগিণী
আনিলাম ফুলের সাজিতে করে
সোম-মঙ্গল বারে বিষের জন্ম উদিয়া কাল-কাল
কাল বলছে জুড়িয়া হাল
মধ্যে দিয়া ঈশ
ঝাপানে উড়িয়ে পুড়িয়ে মাবি।
চৌসাপার বিষ আগুনের হাটি
আমার রোগীর অঙ্গের বিষ চলে যায় ভাটি।
মা মনসার স্মরণ জানাই
দোহাই মা মনসা
নাই নাই বিষ বিষ হরির আজ্ঞায় নাই।।

—ঐ

মন্ত্র ঋ ১৪. উড়ন :

উড়ন মন্ত্রের সাহায্যে বিষ উড়িয়ে দেওয়া হয় বা ভস্ম করে দেওয়া হয়।

আপনি বাটেন বিষ মা মনসা হাতে করে ডালা
নির্মিনিয়া বিষ তুই কত জান ছলা।
লখিন্দার ঢুলে ছিল লোহার বাসর ঘরে
বেহুলা জলে ভেসেছিল মরা কোলে করে
ত্রিবেণীর সঙ্গে হইল সম্ভাষণ অস্তি-চর্ম-ছাই
মা মনসা দেখে ঝাড়েন তার আদ্য গরিমাই।
এক সতী আলি পাঠতে দিল অজাতী কমলা
সেই ঘাটে ভাসিতে ভাসিতে গেলেন সুন্দরী বেহুলা

বলেন—নেতা দিদি কি উপায় করি পতি জিয়ায়ে দাও তোর পায়ে ধরি।
নেতা বলে মারি বিষ চাপড়ের ঘা পড়ুক হুহুংকারে বিষ ভস্ম হয়ে যায়।
শ্বেত কাওয়া নীল বর্ণ বিষ উড় ত্রিভুবন
সেই নীল যেই খেল চুষতে বিষ উড়ে গেল।
নাই বিষ বিষহবিব আজ্ঞে শিঘ্র শিঘ্র করে ছাড়গে।।

—লক্ষ্মীকান্ত হাউলী

মন্ত্র : ১৫. খিচের ঝাপান :

এই মন্ত্র পাঠ করার সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, অবিবাহিত মেয়ে বা পুরুষকে থাকতে দেন না গুণিন। শাঁখ-ঝাঁঝ-ঘণ্টা বাজান হয় এই সময়। এই ধরনের মন্ত্রে আদি রসাত্মক শব্দাধিক্য অতি প্রকট।

একজন রসিক নারী রাস্তা দিয়ে যায় আর একজন রসিক পুরুষ ফিরে ফিরে চায়
চাহিতে-চাহিতে মিলন হইল ইশারায়। অবশেষে উভয়েতে নিকটে আইল
দক্ষিণ দুয়ারের ঘরে বিছানা পাতিল দুইজনেতে বিছানায় শয়ন করিল।
দুইজনাতে কথাকয় মুচকি মুচকি হাসে দুই হাতে মাই ধরে ঠাপ মারে কোষে।
চালে চাল-কুমড়ো গাছের শোভাফল জলের জল-কুমারী ছুড়ির বুকের বেল
এইবলে দুজনেতে চোদনে দিল মন চুদিতে চুদিতে বিষ ধুতরা হয়ে যায়
নেই বিষ মা মনসার আজ্ঞায়। বল হরি হরি—নমঃ শিবায় জয় বিষ হরি।।

—মহাদেব মণ্ডল

মন্ত্র : ১৬. অগ্নিসার :

সরিষার তেলের সলতে পাকিয়ে, আগুন ধরিয়ে, মন্ত্র পাঠ করার পর গুণিন সেই সলতে ক্ষতস্থানে বসিয়ে দেন। এতে যন্ত্রণা নিরসন হয়। 'অগ্নিসার' শেষ লগ্নে বিনিয়োগ করেন ওঝা।

অগ্নিমুখো ব্রহ্মা জানি চোটের বিষ ঘাটতে পানি।
ব্রহ্মাবলে বিষ্ণুরে ছাড় চোটের বিষ ছারখার।
ধালিলি তুই দেখিলাম মুই
আমার অগ্রিম তোর দুই। খোদার চরণে ঝাড়াতে ঝাড়াতে নেই বিষ।
চামরে পুতুলি কাঁকে বিনোদিনীরাই অনন্ত গুরুর দোহাই আর বিষ নাই।
শংখের সুধা শিশি খেদাধাই ছামনা মনে জটার ভিতরে বিষ সামাল—ঝাড়ার কেমনে
ঐ আসতেছে শঙ্খচূড়া নটবরের বেশেতে হরিল গরল যত এক চুষতে
উড় যা উড় বিষ উড় যা জ্বল বিষ জ্বল—পুড়ে যা।
চমচম বিষ তুই উড়েপালা আকাশ পাতাল সব ফালা ফালা
নাই বিষ নাই কার আজ্ঞে মা মনসা হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে

শিঘ্র শিঘ্র করে রোগী ভালো হয়ে যাকৃগে।।—ঐ

ওঝা-গুণিনেরা এইভাবে একের পর এক মন্ত্রপাঠ করেন এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদি পালন করেন। রোগী সুস্থ বোধ করলে তবে ক্ষান্ত দেন।

অতঃপর সর্পাঘাতের রোগ চিকিৎসার কয়েকটি প্রয়োগ রীতির সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োগবিধি যথাযথ জানা-না থাকলে মন্ত্র চিকিৎসা পূর্ণতা পায় না বলে গুণিনেরা মনে করেন।

ক. সাপে কাটলে, সংবাদদাতা সংবাদ নিয়ে আসলে ওঝা আগে তাঁকেই মন্ত্র-পুত চপেটাঘাত বা 'চাপড়' মারেন।

খ. সাপে কাটা রোগীকে বসিয়ে ঝাড়ান হয়।

গ. চামর বা নিমের ডাল, ঢাকাই হেন্না—যা কিছু দিয়ে ঝাড়ান হক-না-কেন, সব সময়ের জন্য মাথা থেকে পায়ের দিকে ঝাড়িয়ে আনেন ওঝা-গুণিন।

ঘ. সব গাছ-গাছড়া একই সঙ্গে খাওয়ান হয় না। লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন গাছ, গাছের ছাল, গাছের শিকড়, লতা-পাতা ; দুধ, ঘি, মরিজ, লেবু প্রভৃতির সঙ্গে বড়ি করে খেতে দেন। এমনকি বিভিন্ন গাছের রস দিয়ে জাব বেঁধেও দেন।

ঙ. গুণিন বিষ তোলেন তিনরকম ভাবে :

প্রথমত—মন্ত্রের সাহায্যে
দ্বিতীয়ত—নিজে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে
তৃতীয়ত—কড়ি, বগি প্রভৃতি মন্ত্রপুত করে সাপকে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

মন্ত্রপুত কড়ি বা বগি দংশনকারী সাপ তাই সে যেখানে থাকুক না কেন, ধরে আনে। তখন সাপ নিজেই ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে বিষ টেনে নেয়।

চ. হাত চলা, থালা চালা প্রভৃতির সাহায্যে বিষের বিস্তার বুঝে নিয়ে পুচ্ছন, ঝাড়ন, ঝাপান, চাপান ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ করেন।

ছ. প্রয়োজনে তাবিজ-কবচ-মাদুলি দেন বর্মের কাজ করবে এই বিশ্বাসে পথ্যের ব্যবস্থা দেন।

জ. তাগা বাঁধার সময় ধুলোর মোড়ক, দড়ির মোড়ক ইত্যাদি বাঁধেন মন্ত্রের সাহায্যে

ঝ. দাঁত আছে কিনা পরীক্ষার জন্য চুল বা সূতা দিয়ে উপর নীচে টেনে দাঁত ঝারিয়ে দেন।

ঞ. গামছা মোড়নের সাহায্যে মন্ত্র পাঠ করলে দেহের বিষ নিঙরে বের করে এনে ভস্ম মন্ত্রের সাহায্যে ভস্ম করে দেন।

ট. গুণিন মন্ত্র প্রয়োগ করার পূর্বে নিজেকে 'বন্দ' করেন, বাড়ির প্রত্যেককে বন্দ করেন, প্রয়োজনে বাড়ি-ঘর-গৃহস্থালি সবকিছুকে বন্দ করেন।

ঠ. ডাক্তাররা যেমন ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেন তেমনি ওঝা-গুণিনেরা সাপে যাতে না কাটতে পারে তার জন্য 'সাপানী' করে রাখেন।

ঙ. ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানা :

মানুষ মরলে ভূত[১] হয়, বা প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় এ বিশ্বাস আবহমান কালের। ভূত-প্রেতের নামে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়াটা জনসাধারণের মধ্যে সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের যুগে মানুষের ভূত-বিশ্বাস ছিল প্রবল। যারা পাপ কাজ করে মৃত্যু বরণ করে, গলায় দড়ি দিয়ে, বিষ পান করে বা অস্ত্রাদির আঘাতে মারা যায়, কিংবা বজ্রাঘাতে, সর্পাঘাতে, দস্যুদের হাতে বা অসংযত অবস্থায় যাদের মৃত্যু ঘটে তারাই ভূত-প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে—সমাজে কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এখনও এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ভূতের আরেক নাম 'অপদেবতা'। বেদে ভূত কথাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'প্রেত' বা 'পিশাচ' শব্দ দিয়েই বোঝান হয়েছে। প্রেত-তাড়াবার মন্ত্র অথর্ববেদে একাধিক জায়গায় উল্লেখ আছে। পিশাচ কথাটা অবশ্য পিশিত বা মাংস ভক্ষণ করে যারা, তাদের বোঝান হয়েছে। আকাশে নিরলম্ব বায়ুভূতও নিরাশ্রয় হয়ে সহস্র বৎসর দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পর প্রেত পিশাচে পরিণত হয়। পলিনেশিয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী পাপীদের নরকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। নরক হচ্ছে চির মরণের রাত্তির দেশ—আকাশ অর্থাৎ স্বর্গের যেদিকে নক্ষত্র পুঞ্জ ঝুলতে থাকে, তারই পশ্চাতে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশই পিশাচদের আবাসস্থল। এদের রূপ অতি বিকট। চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ। চুল সব সময় উর্ধ্বমুখী। শরীরের রং কৃষ্ণবর্ণ। লক লক জিহ্বা, লম্বা ওষ্ঠ, দীর্ঘ জঙ্ঘা, দীর্ঘ হস্ত, শুষ্ক মুখ ও ভীষণাকৃতি দেখতে। এরা পৃথিবীতে অতৃপ্ত ছিল বলেই পিশাচরূপ প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুধাতুর থাকে। ভোগ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। পুত্র-পুত্রাদির ছল ধরে প্রাক্তন গৃহে এসে উচ্ছিষ্টাদি পান ভোজন করে, মল-মূত্র ত্যাগ করার স্থানে অবস্থান করে। এরা নিজ কূলকেই সব থেকে বেশি অনিষ্ট করে বা পীড়ন করে। জীবিতকালে যে যত বেশি যত্ন-আত্তি করত, প্রেত-পিশাচরই তাকে অনিষ্ট করতে হয় সচেষ্ট। ভূত-প্রেতের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত দানের জন্য পিণ্ড সম্প্রদান বা ক্রশ সঞ্চালনের মাধ্যমে সদ্গতি করা হয়। ভূতকে পূজার্চনার দ্বারা বা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় বশীভূত করা হয়। আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে, কখনও বা আশ্বিন মাসের এক পক্ষ কাল ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ তর্পণ করে প্রত্যহ পিতৃ-পুরুষগণকে কয়েক কোষ জলদান করেন এবং বলেন—তাদের পরিবারে যেন কারুর কোনো অমঙ্গল কর না, তোমরাই দেখ এবং প্রত্যাবর্তন কর। যারা বিভিন্ন সৎকর্মের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার পর মারা যায় সেই সমস্ত জীবাত্মাকে দেবতা, জ্ঞান করা হয় এবং তাদেরকে পূজা বা আহ্বান জানাবার রীতি বহুকাল ধরেই প্রচলিত। বেবিলনে খৃস্ট জন্মের ৩০০০ বৎসরের পূর্বে যে সকল প্রস্তর ফলক পাওয়া গেছে, তাতে প্রাচীনকালে সে দেশের লোকেরা যে ভূত পূজা করতেন তার উল্লেখ রয়েছে। আমাদের দেশে পুরোহিত মহাশয়গণ যে কোনো পূজা-উৎসবাদির প্রাক্কালে শাস্ত্র-বিধি অনুযায়ী ভূত-পূজা বা ভূতশুদ্ধি পালন করেন। এমনকি, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে 'ভূতচতুর্দশী' পালন করেন গৃহস্থ মানুষেরা। এই দিনে সূর্যোদয় কালে কপালে ঘৃতের ফোঁটা দিয়ে মাথায় অপাং গাছের পল্লব ঘুরিয়ে মন্ত্রপাঠ করা হয় :

ওঁ শীতলোষ্ণ সমযুক্ত সকণ্টক দলান্বিত।
হর পাপসপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ।।[২]

ভূত এবং...। সুভাষ মিস্ত্রী। লোকশ্রুতি ১৩। ১৯৯৭

ভূতশুদ্দির মন্ত্র চতুষ্টয় হলো সংক্ষেপে :

ক. ওঁ মূলশৃঙ্গাট্ট্রাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেনজীবশিবং
পরম শিরপদে যোজয়ামি স্বাহা।।
খ. ওঁ যং লিঙ্গ শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।।
গ. ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।।
ঘ. ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন
মূল শৃঙ্গীটমল্লাসোল্লম জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
হং সঃ সোহ হং স্বাহা।।[৮]

এই সমস্ত মন্ত্রের সাহায্যে ভূতশুদ্ধি বা ভূত পূজা করেন পুরোহিত মহাশয়।

সব দেশেই ভূতের 'প্রতিপত্তি' আছে। স্পুক, স্নিকি, গবলিন, প্রভৃতি বিলিতি ভূতেরা ঘোষ্ট বা স্পিরিট। জিন, জান, আফ্রিদ, মারীদ প্রভৃতি আরবী, কাকুলী ভূতের মতো আমাদের দেশের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ভূতের নাম লক্ষ্য করা যায়। এদের স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন স্থানেই গতিবিধির ক্ষমতা আছে। একস্থানে একাধিক ভূত বাস কবতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। মৃত দেহ শূন্য গৃহ, মন্দির, গাছ ইত্যাদি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। মানুষের ছায়া যেমন ধরা যায় না, তেমনি ভূতকেও ধরা যায় না। অথচ তাদের আকার আছে, কথা বলে, তাদের দেখতে পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

ভূতদেরও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। আছে কম জোরী ভূত এবং প্রতাপশালী ভূত। সাধারণ লোক মারা গেলে কম জোরী ভূত হয়। আর গুণিন, ব্রাহ্মণ, ক্ষমতাবান লোক মারা গেলে প্রতাপশালী ভূত হয়। স্ত্রী-পুরুষ কিংবা কমজোরী বা প্রতাপশালী ভূত যাই থাকুক না কেন মানুষ সরাসরি এদেরকে 'ভূত' না বলে 'উপসর্গ' আখ্যা দিয়েছে। উপসর্গের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বা উপসর্গ প্রাপ্ত মানুষের ব্যাধি মুক্ত করার জন্য নানা প্রকার ক্রিয়া-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সমাজে। এই কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা সমাজে 'গুণিন', ওঝা, রোজা, গুঠবেন, শামান প্রভৃতি নামে পরিচিত। এঁরা প্রেতাত্মাকে পেটিকা তথা পাত্রবদ্ধ করে রাখতে পারেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর স্বপ্নে এঁদের সঙ্গে দেখা দিয়ে কথাবার্তা বলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এঁরা সকল শাস্ত্র, সকল বিষয় ও অতি পুরাতন স্মৃতি এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যাবতীয় জ্ঞানের আধাররূপে বিবেচ্য। একজন সাধকের প্রার্থনায় তাঁর ইষ্টদেব কর্ণপাত নাও করতে পারেন কিন্তু একজন গুণিন বা ওঝা-রোজার আহ্বানে ইষ্টদেব যমপুরী যেতেও প্রস্তুত। ভূতগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসা করার সময় ভূত-প্রেত বা আত্মাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করেন এবং ব্যবহার করেন বিভিন্ন জীবজন্তু, মানব, রাক্ষস ও অদ্ভুত আকৃতির মুখোশ। এই সমস্ত মুখোশের মধ্যে থাকে অর্ধেক ইন্দ্রজাল। এঁদের শাস্ত্রের বিধি নিষেধের সীমা পরিসীমা নেই। অথচ মানুষ তা মানতে বাধ্য।

জন্মান্তরবাদে ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী মানুষ সামাজিক সমস্যায় পিষ্ট হয়ে অনেক সময় সকল বাসনা তৃপ্ত করতে পারে না। তাই মৃত্যুর পরেও ঈপ্সিত বাসনার চরিতার্থতার প্রয়াসে সেই আত্মাই পার্থিব জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুলে। এইসব অতৃপ্ত আত্মার প্রভাব মুক্ত হবার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন্ত্র প্রয়োগ ও মাদুলি-তাবিজ-কবচ বা

গাছ-গাছড়া প্রভৃতি ব্যবস্থা করে থাকেন গুণিন। লক্ষণ ও বিষয় ভেদে নানান ধরনের মন্ত্র ব্যবহার করেন তিনি। যেমন-দেহবন্দ, ঘরবন্দ, কয়েদ, আগুনভারা, সরষেবাণ, চালান, গণ্ডীকরণ ইত্যাদি।

মন্ত্র : ১. আপনসার :

গুণিন ভূতগ্রস্ত রোগী ঝাড়াতে যাবার আগে 'আপনসার' বা 'আত্মসাধনা' সেরে নেন। 'আপনসারে'-র মধ্যে দেহবন্দ, বাস্তুবন্দ, রাস্তাবন্দ প্রভৃতি সমাধা করে নেন। আপনসারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমস্ত দিক থেকে নিজেকে অপ্রতিহত দুর্গের রূপ দেওয়া।

ক. দেহবন্দ :

হাট বলতে হাট বন্ধন
বাট বলতে বাট বন্ধন
ঘাট বলতে ঘাট বন্ধম।
ভূত চালতে ভূত বন্ধন
প্রেত চালতে প্রেত বন্ধম
বন্ধম কালী ঘাটের কালী করিয়া মনস্থিব
সপ্তঘাটে বন্দীলাম সাতসমুদ্র পীর
তেত্রিশ কোটি দেবতা বন্ধম
সর্বঘটে গয়-গঙ্গা দেবতা-দানব বন্ধম
বন্ধম-ডান-যুগিনী সাপ খোপ
লাগ বন্ধম আমার অঙ্গে
আজ দুপুর কাল রাত্রির সাত দিন সাত রাত থাক
এই বন্ধম আমার অঙ্গে শিঘ্র শিঘ্র লাগ
কার আজ্ঞে নরসিংহ গুরুৰ দোহাই
হাড়ির ঝি চণ্ডী বড় মাই।। —নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

মন্ত্রটি তিন বার পাঠ করার পর গুণিন নিজের গায়ে ফুঁ দেন। এর ফলে ভূত-প্রেত অপদেবতা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত শক্তি তাঁকে আক্রমণ করতে পারবে না বলে বিশ্বাস করেন।

খ. বাড়িবন্দ :

আদ্য রুরহিনী অমূল্য ধরনী
রুরহিণী মহিনী শঙ্করী তুমি আমার মা।
উপরি ফাঁপরী রাও বাতাস
যক্ষ রক্ষ কাঁটা খোঁচা ডান দানব দৈত্য
আমার এই বাড়ি যে আসিবি তারে খা।
যে মড় মড়ায় যে শড় শড়ায় যে ভাঙ্গে খড়ি
একে কোঁকতায় ভাঙ্গি তার নাড়ি।
কার আজ্ঞে—সীতে সীতামার আজ্ঞে
আমার এই বাড়ি বন্দম সাড়ে সাতদিন থাকগে।।—ঐ

ইঁদুর মাটি নিয়ে অভিমন্ত্রিত করার পর সেই মাটি বাড়ির চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর বয়স অনুসারে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের 'কায়দা-কানুন' করে দেন অর্থাৎ মাটিপড়া, জড়ি-বুটি বেঁধে দেন যাতে তাঁর বাড়ির ছেলে মেয়েদের উপসর্গ না আক্রমণ করতে পারে।

গ. ঘরবন্দ :

ঘর বন্দম দোর বন্ধম
আর বন্ধম পাড়
সাতশ ভূত বন্দম
দিয়ে লোহার হাড়।

আমার এই ঘরের মধ্যে তেত্রিশ গণ্ডা দেবতাগণের খেয়ে যে করিবে ঘা
দোহাই আল্লা নবীর নামে জুলে যাবে তার গা। দোহাই আল্লা দোহাই রামসীতা
দোহাই নরসিংহ রাসুকী মাতা।। —ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

ঘর বন্দম করার সময় গুণিন তিন তালি সারেন।

ঘ. রাস্তাবন্দ :

ঘর থেকে বেরুনু আমি ভূমে দিয়ে পা শোল পাথর হইল আমকোর গা।
ঘর থেকে বেরুনু আমি পথে দিলাম পা তুমি রক্ষা কর আমার কামাখ্যা মা।
হাত গরুর পা গরুর গরুড় সহদর পালারে জীবজন্তু কারু নাহি পর।
পথ মধ্যে যে আছে দাও পথ ছেড়ে ভাই আমি ঈশ্বর মহাদেবের কাছে যাই।
রুপে হুপে আমকোর রঙ্গে সঙ্গের সঙ্গতির সাথের সাথি।
যে করিবি ঘা সাপ খোপ যে টি
লাগ-বন্দ সেটি ঈশ্বর মহাদেবের জটে বাড়াবি ডান পা।
দোহাই হাড়ীর ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে শিঘ্রশিঘ্র আমার পথ মুক্ত হয়ে যাকগে।।
—ঐ

মন্ত্র : ২. উপসর্গের জলপড়া : ঝাড়ান

হাতে করে নিল দেবী রামজয় বাণ ত্রিভুবন পিটি পিটি করে টলমল
পল পল ডাকিনী পল পল দূত রামের বাণ পড়ে করিলাম মজবুত।
রামের বাণ বৃথা না যায় যথা খাটে বলীবাণ তথা ঘাটে যায়।
শতেক ভারবাণ মারিলাম বলে বাণের মুখে ব্রহ্মা আগুন জ্বলে।
বাণ খেয়ে দেবী সাগরে দিলেন ঝাঁপ এলেন তিন তিরিক্ষে রথ
ডান যোগিনী প্রেত ভূত বাও বাতাস দানব দূত
যক্ষ আদি ডাকিনী যোগিনী পীর পৈরী কেটে করি খান খান।
কার আজ্ঞে—দোহাই ধর্মের আজ্ঞে অমুকার কণ্ঠের ভার বান কুজ্ঞান
বাও বাতাস উপসর্গ কেটে করি খানখান।।
—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটি জায়গা পোঁচ দেবার পর জলপূর্ণ কাঁসার ঘটি বসিয়ে দেওয়া হয়। গুণিন পূর্ব মুখো উবু হয়ে বসে লোহার ছুরি অথবা পোড়া-কাঠ নিয়ে উক্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে তিন বার মন্ত্র পাঠ করে ফুঁ দেন। পরে সেই জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দেন, খেতে দেন। এই জল মাটিতে পড়া নিষেধ, বিড়াল মাড়ান নিষেধ।

মন্ত্র : ৩ উপসর্গের জ্বালান বাণ :

জ্বালান বাণ প্রয়োগ করার সময় গুণিন কুলকাঠে কাপড় জড়িয়ে ধুনা-গোগ্গুল-সরিষার তেল দিয়ে মশাল বানান। তার উপরে অবস্থান করার কাঁচা হলুদ। আগুন এবং ধোঁয়া ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হলে গুণিন মন্ত্র পাঠ করেন।

তুই লেপ্টা মুই লেপ্টা লেপ্টা নিরঞ্জন চন্দ্রসূর্য লেপ্টা লেপ্টা শ্রীমধুসূদন।
আকাশের তারা বন্দম পাতালের বালী আমার শত্রুর চোখ বন্দম দেহাই মা কালী।
জ্বালান জ্বালিলাম অমুকার দেহে পড়িল জ্বালান বাণ শত্রুর বুকে।
ছটফট করে শত্রু পালায় বহু দূর আঁও বাঁও নদী-দীঘি সাত সমুন্দুর।
কার আজ্ঞে—দোহাই মাকালী শিঘ্র শিঘ্র বাণ লাগগে।
আমার এই মন্ত্রে অনুকার কণ্ঠের ভূত-প্রেত ডাকিনী-যোগিনী দানব দূত
যে করিবি ঘা কামরূপ কামাক্ষ্যার আজ্ঞায় জ্বলে
যাবে তারগা।।

মন্ত্র : ৪. হলুদবাণ :

হলুদ হলুদ হলুদ মূল উজ্জ্বল বরণ কতই যে উপকৃত নর তোমার কারণ
মক্কার পীর আদি ঈশ্বর মহাদেব গুরু গোঁসাই ব্রহ্মা বিষ্ণু সহদেব।
অমুকার ভূত যদি না নড়িল চড়িল হলুদ বাণে করি তোরে নির্বিষ।
ছোটবড় আদিঅন্ত যত হলুদ আছে তাহার গন্ধেতে ভূত না আসে কাছে।
হিন্দুর মন্দির এই মুসলমানের মসজিদ মান রাখিতে শিঘ্র চাড় না করিস জিদ।।
অমুকার অঙ্গের ভূত উঠিয়া পালায় হাজার সেলাম আমার গুরু ওস্তাদের পায়।
হলুদ বাণেতে ভূত পালাইয়া যায় কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামাক্ষার আজ্ঞে
নরসিংহ ধর্মের দোহাই শিঘ্র করে লাগগে।।—মহাদেব মণ্ডল

কাঁচা হলুদ নিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, মন্ত্রে পবিত্র করার পর গুণিন উক্ত পোড়া হলুদ রোগীর দুই নাকে ধরেন।

মন্ত্র : ৫. সরিষা বাণ :

সরিষা সরিষা শ্বেত-পীত-কালো সরিষা সরিষা চলিস ফিরিয়া ভালো।
সরিষার বাণের চোটে গগন ফাটে ঈশ্বর মহাদেবের জটা কাটে
ডাকিনী যোগিনী পালায় পালায় দানব দূত সরিষার বাণে পালায় যত প্রেত ভূত।
মন্ত্রের মান্য যদি রাখিবারে চাও যথা হইতে আসিয়াছিলে তথা চলি যাও
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামাক্ষ্যার আজ্ঞে হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।—ঐ

সরিষা অভিমন্ত্রিত করে, তাওয়ায় গরম করে, ঝাঁটার কাঠির দ্বারা রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে গুণিন ভূত ঝাড়ান। এই রকম করলে ভূত চলে যায়।

মন্ত্র : ৬. জলে ডোবা উপসর্গ ঝাড়ান :

ব্রহ্মারূপে ভেসেছিলেন নিরঞ্জন তখন ছিলি কোথা। শক্তিতে পয়দা তোর নাম ভগবতী। দুই কানে দুলছিল কার্তিক গণপতি। কার্তিক গণপতি রেখে মর্ত্তে দিল পা।
শিঘ্র

শিঘ্র চলে আয় চাঁড়ের কালকে চণ্ডী মা। (৩) মন্দ ফরাসী বার জাতি
মড়ার' মাথায় জ্বেলে বাতি রোগীর মাথায় দিয়ে পা
শিঘ্র (৩) চলে আয চাঁড়ের কালকে চণ্ডীমা। (৩)

জলে জলকুমারী ভূত-প্রেত ডান-ডাকিনী বাও বাতাস অমুকের কণ্ঠ হতে শিঘ্র শিঘ্র করে
ছাড়। আল্লার কুরাণ-মন্দের জবান। সঙ্গের সঙ্গিনী নারী ছেড়ে যারে ঘর।
জনম উদ্ধার করিছিলি মা জনক নন্দিনী সীতারে। অমনি উদ্ধার কর মা তোমার এই
অধমেরে। ফতেমার কথা পড়ে গেল মনে। রামের হাতের ত্রিশূল কাঁপে থরথর। হাজারী
কাঁপে ভূত-প্রেতের সাথে। আল্লার হাতের কড়া বাণে বধ করি তোরে। মা কালীর
স্মরণে তোরে পাঠাই যমের ঘরে। তোর শিব কালীর দোহাই লাগে। শিঘ্র শিঘ্র
ছাড়।— দোহাই মাকালী (৩)।। —নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

জলে পড়ে বা ডুবে গেলে রোগীর বাবা মা বাদ দিয়ে অন্যের দ্বারা তুলিয়ে, জলে দাঁড়িয়েই গুণিন এই মন্ত্র পাঠ করেন। অবশ্য, তার পূর্বে আপন বন্ধ 'ঘাটবন্দ' এবং পরবর্তী স্তরে অন্যান্য উপসর্গীয় মন্ত্র পড়েন ও শিবের, শ্মশানকালীর মানত ব্যবস্থা দেন।

মন্ত্র : ৭. দৈত্য-দানা ঝাড়ন :

দেবীর যখন গর্ভবতী দুর্গার তখন সাধ সেইকালে কুপিলেন প্রভু নারিকেলের গাছ।
অমৃত নারিকেলের ফল ভিতরে তার পানি তাহার ভিতরে শাস জগৎ বাখানি।
কে-কার বার মুটি বার বেতের বাঁধন কে কার বাড়ি যায় কোথায় গমন।
চোবার মুখে মারি বাটির বাড়ি পিঠে দিয়ে পা আমার ফুঁকে অমুকার কণ্ঠ থেকে দৈত্য-দানা
স্থানান্তরে যা। দোহাই (৩) হুকুম আল্লার দোহাই হুকুম খোদারব অমুকির কণ্ঠে
থাকবিনি কো আর। (৩)

হরিহরি বলি আমি মন করি স্থির বাটুলি চালিলাম আমি নরসিংহ পীড়।
এক-দুই-তিন দানব-দানবী জেরবার পালায়-পালায় আমার হস্তে দেখে হাড়
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই ধনুক ধরিল ডান-দৈত্যের সব মুণ্ড কেটে গেল।
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যায় কাঁউয়ের কামাক্ষার হাড়ির ঝি
চণ্ডীর আজ্ঞায়
দোহাই তোমার ধর্মের।।—ঐ

একুশ বার পাঠ করে গুণিন রোগীকে চটেপাঘাত করেন।

মন্ত্র : ৮. ডাইনী খেকো জলপড়া :

আনিলাম পানি জুড়িলাম বাণ পানি দেখে উড়িল প্রাণ।
যদি পানি পিড়ে গড়ে ডান যোগিনী পুড়ে পরে।
পৃথিবী থাকিলে পানি মরলে পায় ঠাঁই অশান্ত জীয়ান্ত দেবী মরলে পায় ঠাঁই।
ঢেঁকীর চামর বাও বাতাস মোকাম কুণ্ডলী—এ পানীতে কি কি পুড়ে মরে।
নয় ভূত পুড়ে মরে। ভূত পড়ে ভূত্নী পড়ে
ডাকিনী পড়ে যোগিনী পড়ে বাও পড়ে বাতাস পড়ে
৫০০ যোগিনী দানব ডাকিনী কাঁদে—হাত মাথায় সবার
এ-বিদ্যে ছাড়-এ বিদ্যে ছাড় কার আজ্ঞে সীতা শ্রীরামের পঞ্চবাণ
আমার এই জলপড়ায় অমুকের ৬৪ডান ভস্ম হয়ে যা। কোন কোন ডান
হোজা ডান গোজা ডান আনাচে কানাচে ডান মেছ্ ডান গেছো ডান রক্তে ডান সঞ্চে ডান
চোঁচা ডান দুধে ডান বাতাসে ডান খুদে ডান দৃষ্টি ডান জ্বলো ডান ৬৪ ডান
সব জল পড়ায় ভস্ম হয়ে যা। মা শ্মশান কালীর আজ্ঞায়।।—ঐ

পিতলের কলসি করে নদীর জোয়ার লাগা ভাঁটির জল তুলে আনতে হবে। কলসিটি বসাতে হবে এমন গোবর পোঁচ দেওয়া জায়গায় যেখানে গুণিন বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখের সাহায্যে ক্রশ চিহ্ন আঁকেন। উক্ত জলে ছুরি বা কাস্তে ডুবিয়ে অথবা কুল-গরাণ কাঠ জ্বালিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। জল থাকবে তামা-তুলসী-সোনা-রূপো-ফুল ও গঙ্গাজল। ডাইনী পাওয়া বা 'গাঁটুলি' করা রোগীকে শনি-মঙ্গলবারে কোনও নির্জন তিন রাস্তার সঙ্গমস্থলে পূর্বমুখে বসিয়ে উক্ত মন্ত্রপূতঃ জলে স্নান করাতে হবে। রোগী তিন দিনের মধ্যে সে দিকে যাবে না। বিছানা-পত্র ফেলে আসতে হবে। স্নানের দিনে রোগীর জামা-কাপড় অন্যে কাচবে। রোগী জলের ঘাটে যাবে না, অন্য জলেও স্নান করবে না। ১৫ দিন অন্তর অন্তর তিন শনি-মঙ্গল বার রোগী স্নান করালে ডাইনী ভূত ছেড়ে যায় বলে বিশ্বাস।

ভূত ঝাড়াবার সময় গুণিনেরা যে সমস্ত বিধিবিধান প্রয়োগ করেন তা হলো :

ক. ভূত ঝাড়াবার জন্য বার-ক্ষণ-দিন-তিথি-নক্ষত্র দেখা হয়।

খ. রোগীর বাড়ির কাছাকাছি এসে গুণিন উচ্চশব্দে ডাক দেন।

গ. রোগীকে থুথু ফেলার সুযোগ দেন না বা সেই থুথু চেটে নিবার সুযোগ দেন না।

ঘ. গুণিন ভূতের কাছেই জিজ্ঞাসা করে জেনে নেন—সে কেন, কখন, কোথায় কিভাবে কতদিনের জন্য রোগীকে ভর করেছে ; ছাড়াবে কেমন করে বা তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য তাকে কি কি দিতে হবে ; কখন কিভাবে যাবে, রোগীর সঙ্গে কি সম্পর্ক ইত্যাদি। স্বাভাবিক কারণে সে প্রথমে বলতে চায় না। তখন গুণিন হলুদ বাণ, সরষে বাণ ইত্যাদি প্রয়োগ করেন।

ঙ. ভূত আক্রান্ত-ব্যক্তিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিনা তার প্রমাণ স্বরূপ গুণিনের নির্দেশ অনুযায়ী অথবা তার ইচ্ছা অনুযায়ী জুতা, ঝাঁটা, জলের কলসি মুখে করে নিয়ে যায় বা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে যায়। ভূত চালকের সময় কেউ চালের বাতা ধরে থাকবে না।

ছ. গুণিন কাছা খুলে থাকবেন না, লাঠি-আলো অথবা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি ব্যতিরেকে একলা রাত্তিরে গমনাগমন করতে পারবেন না।

জ. ভূত রোগীর দেহ ছেড়ে চলে গেলে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তখন তাকে শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়। ঠাণ্ডা পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

ঝ. ভূত বা উপসর্গ যাতে ক্ষতি না করতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে জড়ি-বুটি সহ মাদুলি-কবচ দেওয়া হয়। শরীরে কোনও গাছ ঢুকিয়ে রাখলে তা মৃত্যুর পরে না বের করা পর্যন্ত দাহ নিষেধ।

চ. অসুখ-বিসুখ :

শরীর ধারণের অনিবার্য পরিণাম হলো জরা-ব্যাধি-মৃত্যু। কিন্তু কেবলমাত্র জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিতেই জরা বা ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করে তা নয়, অনেক সময় রোগ-ব্যাধির পশ্চাতে অভিশাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। কাউকে ক্ষতি করবার বা মারবার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করা হয়, তারই অলৌকিক অশুভকর ক্ষমতাই হল অভিশাপ। অভিশাপ নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন :

ক. শত্রুপ্রদত্ত অভিশাপ।

খ. মহিলা আত্মীয়া প্রদত্ত অভিশাপ।

গ. ক্রোধ বশত ব্রাহ্মণের উচ্চারিত অভিশাপ ইত্যাদি।

অভিশাপ মানুষের জীবন, ধন সম্পত্তি, সন্তান সন্ততিকেও স্পর্শ করে। মানুষের কর্ম-জনিত পাপ-প্রক্রিয়াও রোগ-ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাপ-পাপ অথবা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিতে যেভাবেই রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হোক না কেন, ব্যাধির ক্লেশকর পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য, শাপ-পাপকে জীবন হতে মুছে ফেলার জন্য মানুষ মন্ত্রের সৃষ্টি করেছে, রোগ ও রোগের আক্রমণকে প্রতিহত করছে সেই আদিম কাল থেকেই। রোগের বিভিন্নতা অনুসারে মন্ত্রেরও বিভিন্ন নাম পরিদৃষ্ট হয়। যেমন : কচাব্যথা, থুনকুড়ি, সান্নিপাত, গলায় কাঁটাবেঁধা, পিলে কাটান, পেঁচোঝাড়ান, ফক ব্যথা, নালি ঘা ঝাড়ান, নুন পড়া, ঘি পড়া, চাল পড়া, ঘা-এর জলপড়া, পানপড়া, গলাফুলো, বাণকাটা, জলসার, আগুনভারা, শিশুর দুধ তোলা, কামনা, চোখে পাজা পাড়া, কানে ব্যথা ইত্যাদি। শুধু মন্ত্র নয়, মন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা পদার্থ প্রয়োগ করে মানুষ বহু কঠিন অসুখ-বিসুখও প্রতিহত করেছে।

খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ, জীবন যাত্রার মান, নিত্য দারিদ্র্য, সংস্কার-প্রিয়তা এসবও রোগ-ব্যাধির অন্যতম কারণ। অথচ এই সমস্ত বিষয়গুলিই আমাদের জীবনকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে। গ্রামময় ভারতবর্ষের শতকরা ৯৫ শতাংশ গ্রামে পাশকরা ডাক্তার নেই, ঔষধের দোকান নেই, নেই নাগরিক জীবনের সুলভ আনুষঙ্গিকতা। তবুও গ্রাম-ঘরের মানুষের অসুখ হয়, আবার সারেও এবং তা মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, ওঝা-গুণিন, জড়ি-বুটির দ্বারা। ডাক্তারদের কাছে এই সমস্ত টোটকা চিকিৎসা বা হাতুড়ে বদ্যি অনেকাংশেই ব্রাত্য। অথচ ভাবতে গেলে বিস্ময়েরও বিপ্লব ঘটে যায় যে, এঁরাই গ্রামীণ স্বাস্থ্যকে আজও

টিকিয়ে রেখেছেন। শুধু গ্রামীণ স্বাস্থ্যই বা বলি কেন, সমাজের একটা বৃহত্তর অংশকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা কয়েকটি মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হব।

মন্ত্র : ১. চোখে ছানি বা পাজা পড়লে :

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ চল্ল বনে
দক্ষিণে সাগর কূল
রাম বলে—লক্ষ্মণভাই বসে কর কি
কাঁটা খোঁচা ছেনে আসি চল।
কাঁটারুল (রক্তছানি) অমুকের ডান (বাম) চোখে
ভস্ম হয়ে যা।
কার আজ্ঞে—রাম লক্ষ্মণের আজ্ঞে।
তাতে জন্মে চক্ষুশূল
অমুকের চোখের রক্তছানি, গোঁজা—গুজি
কার আজ্ঞে—শ্রীরামলক্ষ্মণের আজ্ঞে
শিঘ্র শিঘ্র চোখ ভালো হয়ে থাকগে।। (৩)[১]

কাঁসার এক ঘটি জল নিয়ে, তাতে হাত বুলিয়ে গুণিন তিন বার মন্ত্রপাঠ করেন। এই জলে রোগী চোখ ঝাপটা মেরে ধুলে নিরাময় হবে।

মন্ত্র : ২. থুনকুড়ি জ্বর বা ব্যথা :

থুনকুড়ি থুনকুড়ি কর কি
থুনকুড়ি থুনকুড়ি রামের ঝি
চালতে গাছে দিয়ে পা
অমুকের স্তনের থুনকুড়ি ভস্ম হয়ে যা।
শ্রীরামের আজ্ঞে—শিঘ্রশিঘ্র করে ছাড়গে
থুনকুড়ি থুনকুড়ি রামের ঝি।
পথে বসে কর কি।
খুদ খাও কোন্ বাচ।
কার আজ্ঞে—সীতাসাথীর আজ্ঞে
অমুকের থুনকুড়ি ব্যথা ভস্ম হয়ে যাক্ গে।।

—অজিতকুমার মিস্ত্রী

থুনকুড়ি হল স্তন প্রদাহ। যে স্তনে থুনকুড়ির ব্যথা হয় গুণিন ঠিক তার বিপরীতে নিজের স্তনে বা বুকে হাত রেখে মন্ত্র পাঠ করেন।

মন্ত্র : ৩. কচা ব্যথা :

সরিষার তেল অথবা পুরোনো ঘি লবণ গুঁড়োর সঙ্গে হাতে মাখিয়ে, আগুনে সেঁকে অথবা শাবল পুড়িয়ে আগুন ছেনে গুণিন রোগীর ব্যথা ঝাড়ান। কচার ব্যথা হলো আঘাত জনিত কোনো ব্যথা।

পিতৃ সত্য পালনেতে রাম গিয়ে বন
মৃগয়া করিতে যায় সীতা রাখি ঘরে
রথে করে নিয়ে যায় রাবণ বহু দূর
তুই নারী করিলি চুরি
ল্যাজ উবো করি বীর পবন নন্দন
এস বাছা হনুমান কহ সত্যবানী
কেমন আছেন আমার দেবর লক্ষ্মণ।
রামকুলে প্রদীপ জ্বলে রাবণ কুলে আন্ধার।
রাম-লক্ষ্মণ সীতাদেবী এই তিন জন।
শূন্য ঘর পেয়ে সীতায় রাবণে।
পথে জটায়ু পক্ষী বলেন—চোরের ব্যাটা চোর
আমার হাতে পড়ে তুই যাবি যমপুরী।
শংকায় এসে সীতায় শুধাল তখন।
কেমন আছেন আমার রাম রঘুমণি,
না কান্দো না কান্দো মাগো রাবণ মারি করিবেন উদ্ধার
যেমন বয়ে যায় গো কূলের ধারা

অমুকের অঙ্গের ৬৪ ব্যথা শূল্যে, ফাঁপ শূলো
হাড় কচা
হাড় না ফোটে
অমুকের আজারের ব্যথা কবজার ব্যথা
কার আজ্ঞে—শ্রীরামের আজ্ঞ
ফাঁপ শূলো কেটে করি খান খান।
মাস কচা
মাস না ফোটে
ভস্ম হয়ে যায়।
শিঘ্র করে ছাড়গে।।—ঐ

মন্ত্র : ৪. শিশুর সর্দিজ্বর :

ওরে ভাই জ্বরা সরা কাঁকাল দক মাথা ব্যথা
নাক জ্বলে কান জ্বলে বড় বড় বীর সব জ্বলে পড়ে
কোন কোন জ্বর—হাঁফ জ্বর কাপ জ্বর
বাই জ্বর সমস্ত জ্বর আপ্তঘাতি শ্লেষ্মা জ্বর
উমুকির স্কন্দ থেকে সাতসমুন্দুর লংকা পারে চলে যা
দোহাই বাবা বড় বীর নাশিন দেওয়া
ভার না দেওয়া ভার কার আজ্ঞে বাম পা
খালে হাড়ির ঝি জয় চণ্ডী মা কালীর আজ্ঞে
শিঘ্র করে ছাড়।।—মহাদেবচন্দ্র মণ্ডল (মাদাই)

ইঁদুরের মাটি পড়ে দেন গুণিন। উক্ত মাটি শিশুর মাথায় দেওয়া হয় এবং নেকড়ায় করে হাতে অথবা কোমরেব ঘুঁনসিতে বেঁধে দেওয়া হয়।

মন্ত্র : ৫ আধকপালে ঝাড়ান :

পূর্ব দিকে উঠিল ভানু বক্ত বরণ হয়ে
আধক পালে মাথা ব্যথা তুমি বড় বীর
কার আজ্ঞে—বাবা চন্দ্র সূর্যদেবের আজ্ঞে।
আধ কপালে মাথা ব্যথা করহ নিবারণ।
তোমার জ্বালায় মানুষ গরু হয় গো অস্থির।
এখান থেকে আধক পালে মাথাব্যথা সেরে যাক জ্ঞে।।—ঐ

তিন দিন সকাল-সন্ধ্যা ঝাড়াতে হবে।

মন্ত্র : ৬. সান্নিপাত ঝাড়ান :

ঢাক বাজে কাঁশি বাজে বেজে গেল কাড়া
৬৪ সান্নিপাতের পড়ে গেল সাড়া
আগুড়ে নাগুড়ে হেজমাতা খিমুড়ে
হাড়ে থাক হাড়ে ছাড়
কণ্ঠে ছেড়ে বৈকুণ্ঠে যা।
অমুকির কণ্ঠের ৬৪ সান্নিপাত শিঘ্র শিঘ্র ছাড়ঙ্গে
তাল গাছে উঠে শকুন দেয় পাক ঝাড়া।
কোন কোন সান্নিপাতে পড়ে গেল সাড়া
অমুকির কণ্ঠে থাক কণ্ঠে ছাড়
অমুকের কণ্ঠে ৩২ সান্নিপাত
কার আজ্ঞে—কানা বোজরাজের আজ্ঞে
দোহাই তোমার (৩)।।

—ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

মন্ত্র : ৭ . স্বর ব্যথা ঝাড়ান :

স্ববা বলে স্বরীলে গায়ের কুলে কি করিল্পে আই স্বর বাই স্বর ফাঁপ স্বর ফুলো স্বর
ভুলো স্বর ভুলি স্বর পেঁচা স্বর পেচি স্বর অমুকির কণ্ঠে থাক কণ্ঠে ছাড়
হাড়ে থাক হাড়ে ছাড় অমুকির ৩২ কণ্ঠের স্বর ব্যথা শিঘ্র শিঘ্র ছাড়ঙ্গে
দোহাই তোমার (৩)।।—ঐ

মন্ত্র : ৮. আঁচুলি পড়া বা পাঁচা-পাচার মন্ত্র :

কি কর বল বাবা ঠাকুর বসি বট মূলে না আসিয়া একবার শিশুকে দেখিলে।
ওরে চুয় পেঁচো কুয়ো পেঁচো ওরে ও পচা ছাড়িয়া শিশুর স্কন্দ আপন প্রাণ বাঁচা।
দোহাই আলী দোহাই কালী তোমার মুখে মারি রামের তিন তালি।
আমার এই কথা যদি নড়ে বা চড়ে মহাদেবের জটা কেটে পদ তলে পড়ে।
কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামিক্ষা মায়ের আজ্ঞে শিঘ্রশিঘ্র অমুকির স্বন্দে গিয়ে লাগ্‌গে।।
রোহিনী শঙ্করী আমার মা সাতদিনের মধ্যে যে করিবে ঘা
তাকে ধরে ধরে খা (৩)।। —মহাদেবমণ্ডল (মাদাই)

সরিষা অথবা কামাক্ষ্যা মাটি বা ইঁদুরেব উল্কি মন্ত্রপুত করে, তা নেঙরায় বেঁধে, মেয়েদের বাম হাতে ও ছেলেদের ডান হাতে পরিয়ে দেন গুণিন। এর ফলে পেঁচোর রোগ-যাকে বলা হয় 'তড়কা' তা ভালো হয়ে যায়।

মন্ত্র : ৯. চুন পড়া :

চুন চুন চুন শামুকের চুন চুন চুন চুন ঘুঙুরির চুন
চুন চুন চুন ঝিনুকের চুন চুন চুন চুন পাথরের চুন
চুন চুন চুন শিলেটের চুন হাড়ের ঘর মাংসের কুঁড়ে
মর বিষ তুই চুনে পুড়ে নাই বিষ হরির আজ্ঞায়
নির্বিষ হয়ে যায় মহাদেবের আজ্ঞায়।।—ঐ

গেড়ি-গুগলি-শামুক হতে চুন বার করে নিয়ে মন্ত্রপুত করে পাতলা ভাবে ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিতে হয়। ২/৩ দিন এই রকম দিলে শরীরে কোন 'এড়াবিষ' থাকলে নিরাময় হয়ে যাবে।

মন্ত্র : ১০. গলাফুলোর খড়পড়া :

৯ গাছা খড় নিয়ে গুণিন তিন ভাগ করে বিনুনি পাকান আর মন্ত্র পড়েন। বিনুনি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে একটি মালাা মত হয়। সেটি রোগীর গলায় তিন দিন ধারণ করে রাখলে টনশিল বা গলা ব্যথা ভালো হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

রাম চক্র বাণ রামের হাতের বাণ অমুকির কণ্ঠের ব্যথা শূল ফাঁক শূল
উপরী ঝুপরী বাও বাতাস সীতার বরে মরে এই কথা জেনে যে না কয়
তার স্ববংশ বিনাশ হয় কার আজ্ঞে—রাজা শ্রীরামের আজ্ঞে

অমুকার কণ্ঠের ফাঁপ ফুলো ব্যথা শূলা খড় পাড়ায় ভস্ম হয়ে যা।।

—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

মন্ত্র : ১১. রক্ত আমাশয়ের জলপড়া :

পিতলেব গেলাসে এক গেলাস জল নিয়ে তিন বার মন্ত্র পাঠ করার পব রক্তামাশয রোগীকে খাওযাইযে দেন গুণিন।

ক্ষিরোদ সাগরে উপজীল জল ওরে রক্ত আমাশয় কোথা তোর স্থল
গব্যঘৃত তুমি কত ধর গুণ মুনি গণ জানিত সব নির্গুণ
অমুকির খুচি নাচি উপজয়ে যাহা নরসিংহের বরে না রহিবে তাহা
নাই রোগ অমুকের অঙ্গে আর নাই কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামাক্ষা মায়ের আজ্ঞে।
অমুকির রক্ত আমাশয় শিঘ্র শিঘ্র ভাল হয়ে যাকগে।। —ঐ

মন্ত্র : ১২. প্লীহা কাটান :

ভীমকে চাইতে অর্জুন মহাবীর রামের তেশিরা বানে অমুকের
পিলুই কাটিয়া করম চৌচির
কার আজ্ঞা—রাজা রামের আজ্ঞা। কান কোটারি রিকট নারী নয় নয়
মানুষে খায়
ডাহিনে কর্পূর বাঁয়ে যায় দূরে থেকে অঙ্গের নমস্কার করম
ভাঁড়িয়া পাড়ম পা বখম বস্যে পাড়ম বাড়ি রাখন মুয়ে পাড়ম ঘর রাখম
কালীতে সহস্র মুখে লাগুক ভাঁতি আম্বরেখ্যে পরের খামকার আজ্ঞা
কাঙুরের কামিক্ষা মা হাড়ির ঝির আজ্ঞা চণ্ডীর পায়।। —ঐ

এই মন্ত্র পাঠ করার সময় গুণিন তিন বার তালি মারেন।

ছ. সম্মোহন-বশীকরণ :

প্রকৃতির রাজ্যে কিংবা মানুষের অন্তরতম গহন প্রদেশে প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা চিরকালের। নারীর প্রতি পুরুষের বা পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণও চিরন্তন। এই কারণে, স্বাভাবিকভাবে পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে কামনা করেছে। যেখানে সে একে অপরকে পেয়েছে, সেখানে হয়েছে সার্থক বা সুখী, কিন্তু যেখানে পায়নি, সেখানে না পাবার বেদনায় তার প্রবৃত্তি হয়েছে উদ্দাম। এই উদ্দাম প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় সৃষ্টি হয়েছে মন্ত্র। সেই আদিমতম কাল থেকে মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে—শারীরিক বল অতি সীমিত, এর দ্বারা সব সময় সমস্ত রকম কার্যোদ্ধার সম্ভব নয়। অথচ এমন কিছু কলা-কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, যার সাহায্যে ঈপ্সিত বিষয় নিজের অনুকূলে আসবে, কিংবা কারর প্রসন্নতা আদায় করা যাবে, কিন্তু সে জানতে পারবে না, কারুর সন্দেহ উদ্রেক হবে না। এই কলা-কৌশলই হলো সম্মোহন বা বশীকরণ বিদ্যা। এর সাহায্যে কোনো গৃহভৃত্য তার দুর্দান্ত মনিবকে জয় করতে চেয়েছে, দৌর্দণ্ড প্রতাপ হাকিমকে কেউ বশ করতে চেয়েছে—মামলায় জয়লাভের আশায়, কেউ করতে চেয়েছে বিপথগামী স্বামীকে বশীভূত

করতে। শাশুড়ী বধূকে, বধূ শাশুড়ীকে বশীভূত করতে চেয়েছে, কেউ বা সপত্নী-সমস্যায় স্বামীর কাছে নিজেকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছে ইত্যাদি।

বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ যথাযথ নাহলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থেকে যায় বলে যথেষ্ট সাবধানতর সঙ্গে পালন করতে হয়। এর প্রভাবে পাগল হয়ে যাওয়া কিংবা মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য নয়।

কাউকে বশীভূত করতে হলে বা কারো উপর প্রভাব বিস্তার করতে গেলে তা করা যায় দুই রকমভাবে : ক. প্রত্যক্ষ ভাবে, খ. পরোক্ষ ভাবে।

প্রত্যক্ষ প্রয়োগ—ঈপ্সিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে হলে তার মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ, চামড়া, পায়ের ধুলো, বিবাহ-উপনয়ন, রজঃপ্লুত কাপড়ের আঁচল, নাভির ময়লা ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা। সাধারণত এইসব জিনিস সংগ্রহ করা হয় নাপিতের সাহায্যে। অন্য যে কেউও সংগ্রহ করতে পারে ; তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পরোক্ষ প্রয়োগ—মিষ্টি বা শেকড়-লতা-পাতা খাইয়ে, আয়না-ফুল দেখিয়ে, সিঁদুর কাজল কিংবা কাপড় মন্ত্রিত করে বিনিয়োগ করা। এই প্রয়োগ বিধি বহুল প্রচলিত। এই সব জিনিস নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে চালান যায়, এমনকি পূজার প্রসাদ বলে সহজে বিশ্বাস করানো যায়।

প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ যেভাবেই বশীভূত করা যাক না কেন বশীকরণ মন্ত্র বিভিন্ন প্রকারের আছে। যেমন ঃ পুরুষ মোহিনী, কাপড় মন্ত্রণা, ফুলপড়া, সিন্দুর পড়া, চন্দনপড়া, কাজলপড়া, পানপড়া, দর্পণপড়া, মিঠাইপড়া, তুলসী বশীকরণ, আকর্ষণ, মোহন, তেলপড়া, অগ্নি স্তম্ভন ইত্যাদি।

মন্ত্র : ১. মুড়কিপড়া :

শুনরে মুড়কি শুনরে উখড়া কহি যাহা
মন দিয়া ধর
আমুকির চঞ্চল মন স্থির কর।
নরসিংহের বিদ্যের মুড়কি এই মত করে।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে

নরসিংহ গুরুৰ আজ্ঞে যা বলি তাই কর।
দেখলে পাগল না দেখলে মরে
কার আজ্ঞে—কাঁউরে কামাক্ষার মায়ের আজ্ঞে
শিঘ্র শিঘ্র লাগগে।।—মহাদেব মণ্ডল

মন্ত্র : ২. বিছানাপড়া :

ফুলে হাট ফুলে বাজার।
ফুলের বাণ মদন রাজার।।
ফুলের রতি এলে শুতি।
বাঁধিলে দিয়ে আপন পতি।
মনে মনে মিল। লেগে গেল খিল।
কার আজ্ঞে—রতি কামের আজ্ঞে
দম্পতি প্রণয় শিঘ্র শিঘ্র লাগ্‌গে।।

বৃহস্পতিবারে স্ত্রী বিছানায় ফুল সাজিয়ে, অভিমন্ত্রিত করে স্বামীকে নিয়ে শুলে পুরুষ বশীকরণ হবে বলে গুণিনরা বিধান দিয়ে থাকেন।

মন্ত্র : ৩. তেলপড়া :

প্রদীপ রহিল তৈল ঝিকি ঝিকি করে জ্বলিতে অগ্নি পটি মিটি মিটি করে।।
জ্বলুক অগ্নিরমত জ্যোতির রূপেতে আমার নারীর মন পড়ুক ঐ তেলেতে।
চঞ্চল মন তাব ছেড়ে স্থিব হক। আমাকে ভজনা করে জীবন কাটাক।।
আমার এই তেলপড়া চিরকাল থাক। কার আজ্ঞে—কাঁউরের কামুক্ষ্যের আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে।।—ঐ

একটি নতুন মাটির প্রদীপে সরিষার তেল পূর্ণ করে, তুলার পলতে দিয়ে জ্বেলে দিতে হবে। অতঃপর এক শতবার উক্ত মন্ত্র পাঠ করে নারীর গায়ে ছিটিয়ে দিলে নারী বশীভূত হবে।

মন্ত্র : ৪. সিন্দুর মন্ত্রণা :

সিন্দুর সিন্দুর সিন্দুর পাতি। কামুক্ষা পর্বতে তোমার উৎপত্তি।।
সিন্দুর সিন্দুর সিন্দুর কপাট। কালীর বদন রক্তে হয় দোপাটি।।
হৃদয়ের সিন্দুর এই কপালে পরি। শিব দুর্গা আর রতি কামের স্মরণ করি।।
আমার এই সিন্দুর পড়া অমুকের কপালে আমার তরেতে তার মন করে ব্যথা
দিল ফোঁটা
আমার এই সিন্দুর পড়া অমুকাকে শিঘ্র লাগ।। কার আজ্ঞে—ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে
দোহাই তোমার ধর্মের।।—ফণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

মেটে সিঁন্দুর তিন বার মন্ত্রিত করে কাম্য ব্যক্তিকে কৌশলে পরাতে হবে। তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মন্ত্র : ৫. পানপড়া :

পান তোমার ক্ষেতে জন্ম জানি। রাম লক্ষ্মণ করে টানা টানি
সাত সমুদ্রের পারে যায়। পান গুয়া ধরে লইয়া আয়।।
অমুকে মোরে না দেয় থানা। গুয়া করে আনাগোনা।।
পান অমুকির অঙ্গে কর ভর শিব সঙ্গমের কামুকের বর।।
পান পান ওলা পড়া। খেলে খেলে লাগে জোড়া।।
পান পান মহা পান পান জ্বলে। জীয়ে তো রাম মহে তো মশান টলে।।
কার আজ্ঞে—মহম্মদ খোদার আল্লা দোহাই আল্লা (৩) দোহাই তোমার ধর্মের।।
—নগেন্দ্রনাথ বর্মণ

৮টি পান ও ৫টি গোটা সুপারি শনিবার দিন সন্ধ্যার সময় বউনি বেলা এক দরে কিনে ৭বার মন্ত্র পাঠ করেন গুণিন। অতঃপর উক্ত পান-সুপারি খেতে দেওয়া হয়।

'মন্ত্র বিশ্বাসের সীমা' প্রসঙ্গে, বিশেষ শ্রেণীভুক্ত কয়েকটি মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে ঃ

ক. ওঝা বা গুণিন তাঁর অধিত বিদ্যা বিনিয়োগ করার সময় সমস্ত মন্ত্রের সঙ্গেই গাছ-গাছড়া, তাবিজ-মাদুলি কিংবা অন্যান্য বস্তু ও পদার্থ খেতে বা ধারণ করতে বলেন না। এমন কতকগুলি মন্ত্র আছে, যার সঙ্গে খাওয়া বা ধারণ বিধির সংস্রব নেই। এই রকম ক্ষেত্রে মন্ত্র একলাই নিজের কাজ সমাধা করতে পারে। অবশ্য এই ধরনের মন্ত্রের সংখ্যা খুবই কম। যেমন পেট কামড়ান, পেটের ব্যথা, খেলতে-খেলতে ব্যথা লাগা, মাছ ধরতে গিয়ে শিঙ্গি মাছের কাঁটা ফোঁটা, ভেল্কিবাজী দেখাতে গিয়ে কিংবা প্রার্থনার মন্ত্র ইত্যাদিতে কোন কিছুই লাগে না। কিন্তু অবস্থা ঘোরাল হলে বা আশঙ্কা জনক হলে, শক্তিশালী মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। সেই রকম ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিধির অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে। চিকিৎসা শাস্ত্রে 'ফাস্ট এড' জাতীয় একটা বিষয় আছে। আমাদের আলোচ্য মন্ত্রগুলি ঠিক এই ধরনের। 'ফাস্ট এড' জাতীয় মন্ত্র ব্যবহার করার পরও যদি নিরাময়ের সম্ভাবনা কম থাকে, তখন লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন গুণিন। সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে যারা মাছ-মধু-কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যান, এবং জঙ্গলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের মুখোমুখি হয়ে নিজেদেরকে যে সমস্ত মন্ত্রের সাহায্যে নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট হন, তার অধিকাংশ মন্ত্রেরই কোনো প্রয়োগ বা ধারণ বিধি নেই—বিশেষ করে সরকারি নাম, হুকুম মন্ত্র, ফকিরের নাম, মাল বন্দ, খিলেন, আলসে মন্ত্রের। এই সমস্ত মন্ত্রগুলি বাওলে হয় মৃদুস্বরে পাঠ করেন অথবা উচ্চস্বরে পাঠ করেন।

খ. ঝাড়াবার রীতি পদ্ধতিও নানা প্রকার। যেমন কাটিঘা, কুকুর-বিড়াল-বানর বা অন্যান্য জীবজন্তু কামড়ালে, অথবা বিষাক্ত পোকা-মাকড় কামড়ালে শরীরের বিষ ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য গুণিন রোগীকে বসিয়ে ঝাড়ান ; কখনই শুতে দেন না। কারণ—এখানে জলের গতিধর্মের সঙ্গে বিষের গতি ধর্মের একটা অন্তর্লীন মিল আছে। জল যেমন স্বাভাবিক গতিতে উপর থেকে নিম্নে নামে, ঠিক তেমনই গুণিনগণ বিষ ঘা-মুখে আনার চেষ্টা করেন। কাটিঘা-রোগী হলে স্নায়বিক যন্ত্রের অবসাদ ঘটিয়ে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করে বা মৃত্যুও ঘটায়। কিন্তু রোগী বসিয়ে রাখলে একটু বিলম্ব হয়। আবার বসিয়ে ঝাড়ালে, বিষ উপর থেকে নিম্নে নামাবার ঢের সুবিধা থাকে। শিথিল গ্রন্থিগুলো উন্মুক্ত হয়, শরীরের আনাচে-কানাচে বিষ আটকে থাকতে পারে না।

জঙ্গলে গিয়ে গুণিনেরা যে সমস্ত মন্ত্র ব্যবহার করেন, তা পাঠ করার সময় হয় উবু হয়ে বসেন, না হয় হাঁটু ভেঙে বসেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে। কিছু মন্ত্র আবার দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে-হাঁটতে পাঠ বা প্রয়োগ করেন। আবার এমন অনেক মন্ত্র আছে বিশেষ করে কাটি ঘা, ভূত ঝাড়ান, মারণ-উচাটন-অভিচার-অনুষ্ঠান করতে যাবার সময় গুণিন যখন আত্মসাধন করেন, রাস্তা বন্দ বা বাড়ি বন্ধ করেন তখনও হাঁটতে হাঁটতে মন্ত্র পাঠ করেন। তবে ভূত গ্রস্ত রোগী ঝাড়াবার সময়, ভূত চালান, বাণ কাটার সময় গুণিন রোগীকে বসিয়ে রাখেন ; জান-কয়েদ করতে হলে রোগীতে শুইয়ে রাখেন। মচকা ব্যথা, পেটে ব্যথা, সান্নিপাত প্রভৃতি ঝাড়াবার সময় রোগীকে বসিয়ে অথবা শুইয়ে ঝাড়ন।

গ. রোগী ঝাড়াবার সময় ওঝা-গুণিন সাধারণত চামর, নিম-হেন্নার ডাল ব্যবহার করেন বা হাতে রাখেন। বসানো বা শোয়ানো যে অবস্থাতেই হোক রোগীকে তিনি মাথার দিক থেকে ঝাড়িয়ে পায়ের দিকে আনেন ; অর্থাৎ উপর থেকে নিম্নে। কিন্তু কখনই পায়ের দিক

থেকে ঝাড়িয়ে উপরের দিকে নিয়ে যান না। আপাতবাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, গুণিন এমনিই ঝাড়াচ্ছেন বা উল্টো-পাল্টা চামর-নিম ডাল নাড়ছেন। কিন্তু তা নয়। এর কারণ হিসেবে মনে করা হয়—মাথার দিক অর্থাৎ উপর হল ব্রহ্ম = পিতা, এবং নিম্নের দিক অর্থাৎ, পায়ের দিক হল বসু মাতা = মা। মা যেমন সর্বসংহা ধরিত্রীর মত সন্তানের সমস্ত রকম শ্রদ্ধা-স্নেহ, দোষ-ত্রুটি, পাপ-শোক ক্ষমা সুন্দর কল্যাণ স্পর্শে শুধরে নেন, সহ্য করেন, ধারণ কবেন, তেমনি গুণিন রোগীর শরীর-মন-আত্মা থেকে সমস্ত রোগ-ব্যাধি-বালাই ঝাড়িয়ে পায়ের দিকে অর্থাৎ নিম্নের দিকে নামিয়ে আনেন, পৃথিবী মাতাও তা সমস্ত জীব ও প্রাণীর মা হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো নিজের বক্ষে গ্রহণ করে সন্তানকে সুস্থ ও তৃপ্ত করেন।

অধিকাংশ মন্ত্র উপর থেকে নিম্নের দিকে ঝাড়িয়ে নামানো হলেও এমন বেশ কিছু মন্ত্র আছে যেমন উপসর্গ-ব্যথা ঝাড়ান, বাণ কাটা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে ঝাড়িয়ে আনেন গুণিন। আমাদের দৈনন্দিন কাজ অধিকাংশই দক্ষিণ দিকের দায়িত্বে পরিচালিত হয় বলে বিশ্বাস করেন গুণিনেরা। এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে ঝাড়ান শুরু করেন এবং ঝাড়িয়ে বাম দিকে আনেন। তারপর আবার চামর-হেন্না তুলে দক্ষিণ দিকে নিয়ে মন্ত্র পাঠ ও ঝাড়ান শুরু করেন। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গেও একটি পৌরাণিক বিশ্বাস প্রযুক্ত হয়েছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ বা বিষ্ণুকে নিয়ে। বিষ্ণুর দক্ষিণ হাতে থাকে যথাক্রমে চক্র ও পদ্ম এবং বাম হাতে থাকে শঙ্খ ও গদা। দক্ষিণ এবং বামদিকের এই প্রহরণ-এর সঙ্গে গুণিনেরা মন্ত্র ঝাড়াবার একটি অর্ন্তগূঢ় যোগ সূত্র বর্তমান। নারায়ণের দক্ষিণ দিকে যে হাতে পদ্ম শোভা পায়, সেই হাত অনেক সময় পদ্মের পরিবর্তে বরা ভয় বা আশীর্বাদ সূচক চিত্রিত হতে দেখা যায়। নারায়ণের এই আশীর্বাদ বা অভয় বাণী গুণিনেরা চামর-নিম-হেন্নার মাধ্যমে রোগী ও যজমানের শিরে বর্ষিত হয়। বাম হাতের শঙ্খ-শক্তি সাহস ও সাধনের সূচক। গদা শাসন দণ্ড। আর দক্ষিণ হাতের চক্রও নিদান কালের প্রতিরোধ প্রতিহতের মহা অস্ত্র—যা দিয়ে অনায়াসে শত্রু ধ্বংস করা যায়। সমস্ত বিষয়টি পরিচালিত হয় একে অপরের বিপরীত প্রতীক সূচকের মাধ্যমে। বিষয়টি একটি চিত্রের সাহায্যে বুঝা যেতে পারে।
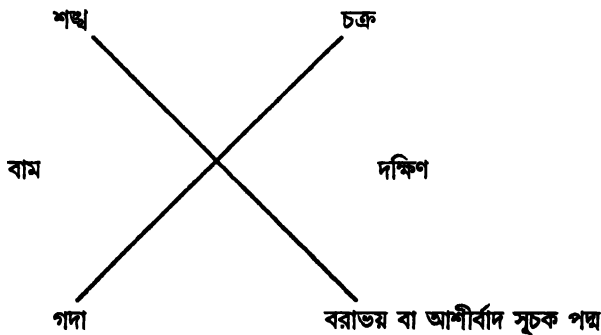
গুণিনদের ঝাড়াবার পদ্ধতিতে দক্ষিণ থেকে বামে চামর দুলিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যে এই বিপ্রতীপ প্রতীক সূচক ক্রিয়াশীল থাকে।

অপর দিকে রোগীর গায়ে মালিশ করতে করতে মন্ত্র পাঠ করার পদ্ধতিও একই। এক্ষেত্রে গুণিন কখনই উল্টো-পাল্টাভাবে মালিশ টানেন না—হয় উপর থেকে নিম্নে না হয় দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে মালিশ টানেন।

ঘ. গুণিন মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁরা সীমানা নির্দিষ্ট করে দেন যথাক্রমে 'স্বর্গ', 'মর্ত্য' এবং 'পাতাল' এই ত্রিশব্দ বা ত্রিলোকের দ্বারা। এর বাইরে তাঁর মন্ত্রে ক্রিয়াত্মক অভিব্যক্তি অথবা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। গুণিন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এবং এরই অন্তর্ভুক্ত জল-স্থল-অন্তরীক্ষ এই শব্দ ত্রয়েক মাধ্যমে ত্রিলোকের মধ্যে একটি কাল্পনিক রেখা টেনে, গণ্ডী এঁকে নেন। এরই মধ্যে তাঁর অবাধ বিচরণ সম্ভব দাপটে কিংবা আদেশ-উপরোধ-অনুরোধে উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন। যদিও তিনি প্রথম কাজ শুরু করেন মর্ত্ত্য অর্থাৎ পৃথিবী থেকেই। বিষয়টি একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাবো।
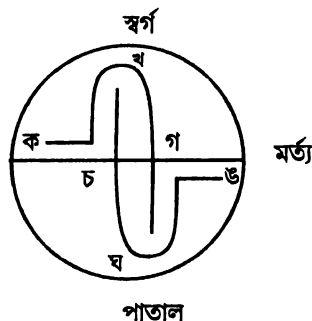
'ক' থেকে শুরু করে 'খ' স্বর্গের দিকে প্রবাহিত, অতঃপর এই গতিতে 'গ' মর্ত্যের দিকে আগমন এবং সেখান থেকে 'ঘ' পাতাল প্রবেশ। বিপরীত ভাবে 'ঙ' থেকে শুরু করে 'ঘ' পাতালে নামার পর 'চ' পৃথিবীতে এসে পুনরায় 'খ'-এ স্বর্গে গমন করেন। গুণিন ইচ্ছে করলে এই ত্রি লোকের মধ্যে যে কোন একটি লোক অথবা দুটি লোক বেছে নিতে পারেন। এর মধ্যে তিনি নিজে যেমন গমনাগমন করতে পারেন, তেমনি মন্ত্রের দ্বারা যে কোন শক্তির প্রতীক তা সে দেব-দানব-ভূত-প্রেত, শত্রু, জীব-জন্তুও অন্যান্য প্রাণী যাই-হোক-না-কেন কার্য সিদ্ধির জন্য আহ্বান করেন অথবা বিতাড়ন করতে সচেষ্ট হন।

তথ্যসূত্র

১. শচীন্দ্রনাথ বসু। প্রাগৈতিহাসের মানুষ। ১৯৮৪

২. 'সুন্দরবনের জঙ্গলা ভাষা'—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : যশোহর খুলনার ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড। সতীশচন্দ্র মিত্র। ১২০—১২৬ পৃষ্ঠা। ১৯৬৩। 'সুন্দরবনের শিকারী ভাষা' : সুভাষ মিস্ত্রী 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা' ৩ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ১৩৯৬। আমাদের ভাষা : সুন্দরবনের শব্দ ভাণ্ডার। ঐ। সমাজ শিক্ষা। ১০-১১ সংখ্যা ৩২ বর্ষ। ১৯৮৯।

৩. সম্ভবত 'মহাল' থেকে 'মউলে' বা 'মউল' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। বর্তমানে যারা মধু সংগ্রহ করতে বনে যান তাঁরাই 'মউলে' বা 'মউল' নামে পরিচিত।

৪. বারের কামাই = ছুটির দিন। জঙ্গলে সপ্তাহে একদিন করে ছুটির দিন থাকে। এই দিনে কেউ কাঠ-মাছ-মধু বা গোলপাতা, লতা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন না। কোন্ দিনটি যে তাঁরা ছুটির দিন হিসেবে পালন করবেন তা নির্ধারিত হয় বাওলের ওপর—তিনি হুকুমের না গুণের? তাছাড়া, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, গ্রহণের দিনও ছুটির দিন বলে বিবেচ্য। এই সমস্ত দিনে তাঁরা মন্ত্র-তন্ত্র ঝালাই করেন, সাধন-ভজন করেন কিংবা প্রয়োজনে বাড়িতে খবর পাঠাতে চেষ্টা করেন।

৫. শশীভূষণ পাল। 'ডাকিনী মন্ত্র', ১৩৪১

৬. সুভাষ মিস্ত্রী, "কি দিয়া বান্ধিব তাগা" ; অরিত্র। চতুর্থ বর্ষ—১৯৮২।

৭. ভূত চতুর্দশী, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। পুরোহিত দর্পণ। ৩৬৯ পৃষ্ঠা ১৩৮১।

৮. ঐ। ৩৩—৩৪ পৃষ্ঠা। ভূত এবং—ঃ সুভাষ মিস্ত্রী। লোকশ্রুতি, ১৩। ১৯৯৭।

৯. অজিতকুমার মিস্ত্রী। বাবা মৃত বিহারীলাল মিস্ত্রী। বয়স—৫১।

গ্রাম : রাধানগর ; ডাকঘর—পশ্চিম রাধানগর, থানা—গোসাবা, জেলা—দঃ ২৪ পরগণা। পেশা কৃষি ও ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ। হিন্দু তপসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত (পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়) কাশ্যপ গোত্র। মাসে শ-সাতেক টাকা আয় করেন। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। ১-৭-১৯৮২ সালে তাঁর কাছ থেকে আমরা মন্ত্র সংগ্রহ করি।

৪ : ৪. মন্ত্র ও আধুনিক সমাজ

কোন এক সুদূর অতীতে মানুষেরই প্রয়োজনে সমাজে গুণিনের মন্ত্রের উদ্ভব হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন সামাজিক পারিবারিক আচার-ব্যবহার-সংস্কার-বিশ্বাসের সঙ্গে এমনকি বিরুদ্ধ শক্তির প্রভাব দূর করা থেকে শুরু করে উপকারক বস্তু, ভবিষ্যৎ কথন সর্বত্রই মন্ত্র সন্নিষ্ট। অবশই কালের পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্র ব্যবহারের ধরন ধারণেরও হের ফের হয়েছে। তবু বলা যায়--অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্র একক ভাবে কাজ করতে পারেনি। কোন একটা কিছুকেই সে অবলম্বন করেছে। এতে মন্ত্রের নিজস্ব গুরুত্ব যাই হোক-না-কেন গুণিন মন্ত্র বিনিযোগ করেন যথাক্রমে জাদু, ভেষজ ও যাগযজ্ঞে-র মাধ্যমে। এদের মধ্যে আবার কোনটায় অধিকতর ফলপ্রদ, তার কোনো সীমা রেখা নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁদের নির্দেশিত বিধি-বিধানও অগুণতি। মন্ত্র, বস্তু ও পদার্থ, ক্রিয়ানুষ্ঠান, বিধি-বিধান সব মিলিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের ইঙ্গিত মিললেও তা সামগ্রিক ভাবে নয়। আসলে সুন্দরবনের সামাজিক অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে চিন্তা-চেতনার অনগ্রসরতা, অজ্ঞতা কিংবা আধুনিক প্রযুক্তিগত চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিই এর কারণ। অবশ্যই ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা লক্ষ্য করেছি, যুগ বদলের সঙ্গেসঙ্গে মানুষের মনেরও বদল হয়েছে। ঐতিহ্য ভেঙে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্য। যুক্তি-বিচার-বিবেচনা দিয়ে মানুষ এখন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে চান। এ কারণেই মন্ত্রের প্রতি আদ্দিকালের বিশ্বাস অতটা নেই। মানুষ তার নিজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেন, সাপের ওঝাকে সাপের মন্ত্র বাঁচাতে পারে নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূতের হাতে মরে ভূতের রোজা, আর জঙ্গলের আইন-কানুনের মূলাধার বাউলে বা মউলেরাই আগে মারা যান বাঘ-কুমিরের হাতে—জঙ্গলের মন্ত্র কালামের সাজন তাঁদেরকেও বাঁচাতে পারে না। বরং, নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী মনসা-কালী-হরি-বনবিবি-শিব প্রভৃতি-দেব-দেবীর নামে জলপড়া, তাঁদের থানের মাটি খেয়ে, গায়ে মাথায় মেখে নিজের ভাগ্য সম্পর্কে ঈশ্বরের দোহাই দেন। একদা ডাক সাইটে গুণিনদের মধ্যে যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন তাঁদের অধিকাংশই মন্ত্র নিয়ে খুব একটা নাড়া-চাড়া করেন না বা অবসর নিয়েছেন। তাবড় তাবড় গুণিনেরাও স্বীকার করেছেন—শুধুমাত্র মন্ত্রে কোনো কাজ হয় না। মন্ত্র একটা হাতিয়ার বা অস্ত্র স্বরূপ যা অবলম্বন করে নিজের অসহায় মুহূর্তে একটু দাঁড়ান সম্ভব। মন্ত্র গুরু এবং শিষ্য ব্যতিরেকে তৃতীয় কাউকে না দিয়ে বা ফাঁস না করে গোপনে শিক্ষা বা চর্চা করে, ঐন্দ্রজালিক কিছু ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করে গুণিন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া অনুযায়ী খুশি করার চেষ্টা করেন। খুব কম খরচে, খুব কম সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান ও সাফল্য নির্ণয়ের মাধ্যম স্বরূপ মন্ত্র এবং মন্ত্রের অধিকারী গুণিনকে ডাকেন--যদিও তাঁরা বাস্তব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বুঝতে পারেন গুণিনের মন্ত্র মাহাত্ম্যের দ্বারা নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি আচ্ছন্ন। বলা চলে—গুণিনের প্রতি আগ্রহ, ঝোঁক বা বিশ্বাস লৌকিক ধর্মানুভূতি থেকেই এসেছে। মন্ত্রের আধারে যে অধ্যাত্ম চিন্তা আবহমানকাল ধরে প্রবহমান

তা ব্রহ্মের প্রতীকে বিভিন্ন দেব-দেবীর নামকরণের মধ্য দিয়ে একাধারে মানুষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি তথা আর্থসামাজিক জীবন ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জীবিকা অন্বেষণের সীমাবদ্ধতা সুন্দরবনের মানুষকে 'জঙ্গল করা'র উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। জাঙ্গলিক জীবিকার অনিবার্য পরিণতিতেই সাপ-বাঘ-কুমির ও ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব ইত্যাদি কল্পিত ভয় এবং সেই সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনে নানা সমস্যা তাঁদেরকে পঙ্গু করে রেখেছে। এই সামাজিক পরিস্থিতির উৎপন্ন শ্রেণী হলেন গুণিনেরা। তাই এই সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামো যত দিন না পরিবর্তন হচ্ছে, তাঁদের প্রভাব সংকুচিত হতে থাকলেও বজায় থাকবে এই অঞ্চলে। এই অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামো যদি বদলে ফেলা যায়, প্রতিষ্ঠা করা যায় আধুনিক বিজ্ঞান ঋদ্ধ উচ্চতর নৈতিক আদর্শ ও শৃঙ্খলা, তাহলেই সাধারণ মানুষের মন থেকে গুণিন ও তাঁদের মন্ত্র সম্পর্কে আদিমকাল সুলভ ভয় ও প্রত্যয়ের সংস্কার কাটিয়ে তোলা সম্ভব হবে—বর্তমান গবেষণার অভিপ্সা হলো এই কথাটির নির্দেশ করা।

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা :

ইসলাম, মযহারুল	:	ফোক্‌লোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ১৯৮২
কবিরাজ, গোপীনাথ	:	'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত'-১ম, ১৩৭৬
কবিরাজ, গোপীনাথ		তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগদর্শন-১ম, ১৯৬৩।
কবিরাজ, গোপীনাথ		ভারতীয় সাধনার ধারা, ১৯৭৫
গোস্বামী, নৃপেন্দ্রনাথ	:	বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি-১ম,, ১৩৭৫
ঘোষ, বিনয়	:	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-৩য়, ১৯৮০
ঘোষ, প্রভাতকুমার	:	গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি, ১৯৮৮
চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ	:	লোকায়ত দর্শন, ১৩৬০
চট্টোপাধ্যায়, সুধাকর	:	ধর্ম ও কুসংস্কার, ১৯৭৩
চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন	:	তন্ত্রের কথা, ১৯৭৮
চট্টোপাধ্যায়, রসিকমোহন (সম্পা)	:	বৃহৎ তন্ত্রসার, ১৩৮৯
চট্টোপাধ্যায়, সাধন	:	গহিন গাতা, ১৯৮০
চট্টোপাধ্যায়, তুষার	:	লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, ১৯৮৫
চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ	:	হিন্দুর আচার, অনুষ্ঠান, ১৩৭৭
চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ	:	তন্ত্রকথা, ১৩৬২
চক্রবর্তী, কল্যাণ	:	মানুষ ও বাঘ, ১৯৮৮
চক্রবর্তী, শোভারাণী	:	বর্তমান বঙ্গসমাজে জাদু বিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা, ১৯৭৬
চক্রবর্তী, বরুণকুমার	:	লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, ১৪০১
চৌধুরী, কমল	:	দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, ১৯৮৭
চৌধুরী, কমল	:	উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, ১৯৮৭
চৌধুরী, দুলাল	:	বাংলার লোকউৎসব, ১৯৮৭
জালীল, আবদুল এ, এফ, এম	:	সুন্দরবনের ইতিহাস, ১৩৭৬
ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ	:	বাংলার ব্রত, ১৯৭৬
দাস, শিশির কুমার	:	শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা, ১৯৮৬
দাস, গিরীন্দ্র নাথ	:	বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, ১৯৭৬
দাশগুপ্ত, শশিভূষণ	:	ভারতীয় সাধনায় ঐক্য, ১৩৫২
বর্গী, রতনাংশু	:	সুন্দরবন, ১৯৮৪
বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ	:	বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১৯৬৭
বসু, শচীন্দ্রনাথ	:	সভ্যতার আগে, ১৯৮০
বসু, শচীন্দ্রনাথ	:	প্রাগৈতিহাসের মানুষ, ১৯৮৪
বসু, সমরেশ	:	গঙ্গা, ১৩৬৫
বসু, গোগেন্দ্র কৃষ্ণ	:	বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৭৮

ভট্টাচার্য, শিবচন্দ্র বিদ্যার্নব : তন্ত্রতত্ত্ব, ১৩৮৯
ভট্টাচার্য, নারায়ণ চন্দ্র : অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি, ১৩৭০
ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলার লোকসাহিত্য--১ম, ১৯৭৩
ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ১৯৭৬
ভট্টাচার্য, কালীপদ : মহাপ্রাণ স্যার জ্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন, ১৯৫৫
ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রমোহন : পুরোহিত দর্পণ, ১৩৮১
ভৌমিক, প্রবোধকুমার : প্রত্যন্ত বাংলার গুপ্তবিদ্যা, ১৯৯৪
ভৌমিক্, কানাই, বসুরায় চৌধুরী : সুন্দরবন অর্থনৈতিক সমাজ ধারাপাত : সমীক্ষায় একটা দিক, ১৯৭৭
মজুমদার, অতীন্দ্র : চর্যাপদ, ১৩৭১
মজুমদার, রমেশচন্দ্র : বাংলাদেশের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭
মজুমদার, সত্যেন্দ্রনারায়ণ : মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি. ১৩৮৬
মজুমদার, তুলিকা (সম্পাঃ) : বাংলার বনদেবতা, ১৯৮৭
মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাঃ) : পুঁথি পরিচয়, ১ম, ১৩৫৮
মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাঃ) : ২য়, ১৩৬৪
মণ্ডল, পঞ্চানন (সম্পাঃ) : ৩য়, ১৩৬৯
মার্কস ও এঙ্গেলস : ধর্ম-প্রসঙ্গে (অনুবাদ), ১৯৮১
মিত্র, সতীশচন্দ্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস ১ম ১৯৬৩
২য় ১৯৬৫
মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাঃ) : বাঘ ও সংস্কৃতি, ১৯৮০
রায়, নীহাররঞ্জন : কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি, ১৯৭৯
রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙালীর ইতিহাস, ১৩৫৬
রায়, কামিনীকুমার : বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার, ১৩৮৭
সরকার, দীনেন্দ্রকুমার : মানবসভ্যতায় কুমারীবলি, ১৩৯০
সাত্তার, আবদুস : অরণ্য সংস্কৃতি, ১৯৭৭
সিদ্দিকী, আশরফ : লোকায়ত বাংলা, ১৯৭৮
সিদ্দিকী, আশরফ : লোকসাহিত্য ১ম, ১৯৭৭
সুর, অতুল : বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ১৯৮৬
সুর, সুজিত : বনবিবির উৎস সন্ধানে, ১৩৮৮
সেন, দীনেশচন্দ্র : বৃহৎবঙ্গ, ১৩৪১
সেনগুপ্ত, পল্লব : পূজা-পার্বণের উৎসকথা, ১৯৯০
সেনগুপ্ত, পল্লব : লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, ১৯৯৫
হাফিজ, আবদুল : বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য, ১৯৭৫
হাফিজ, আবদুল : লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, ১৯৭৫
হাফিজ, আবদুল : লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ, ১৯৭৮

পত্র-পত্রিকা :

অরিত্র	: সম্পাদক—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ বর্ষ, ১৯৮২-৮৩
আজকাল	: সম্পাদক—গৌরকিশোর ঘোষ, ২৫শে জুলাই (রবিবার) ১৯৮২
উত্তরবঙ্গ সংবাদ	: ১৬ই পৌষ (রবিবারের পাতা) ১৩৯০
উত্তরবঙ্গ লোকযান	: সম্পাদক—শিশির মজুমদার, লোকনাট্য সংখ্যা—২, ১৯৮৫
ঐক্যতান	: সম্পাদক—শেখর বসু, শারদ সংকলন, ১৯৭৯
প্রবাসী	: ফাল্গুন [শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ; সুন্দরবন কি কখন জনপদ ছিল]
ভারতী	: মাঘ [কৈলাস চন্দ্র সিং : লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন], ১২৮৯
ভারতবর্ষ	: আশ্বিন, ১৩শ বর্ষ, ১ম ৪র্থ সংখ্যা [কালিদাস দত্ত, সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস], ১৩৩২ মাঘ, ১৫শ বর্ষ ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা [চন্দ্রকুমার দে : শাব্দিক কবি ও শব্দ মন্ত্র] ১৩৩৪, আষাঢ় ৩০শ বর্ষ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা [মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মধু ও মোম] ১৩৪৯
মধুপর্ণী	: সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৩৮৪
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা	: ডিসেম্বর [ড. পল্লব সেনগুপ্ত ; লোক কাহিনীর বিশ্লেষণ : উৎপাদনে, আঙ্গিক ও উপলব্ধি] ১৯৮১
সন্ধিৎসা	: সম্পা : সুশীল মণ্ডল ও মনোজ বৈদ্য, শারদ সংখ্যা, ১৯৯০

English

Bowra, C. M	: Primitive Song, 1962
Blockman, M	: Geography and History of Bengal, 1873
Bhowmik, P. K	: Occultism in Frienge Bengal, 1978
Curtis, S. J	: Working plan for the Forests of Sundarbans, 1931-51.
Chottopadhyay Debi prasad	: Lokayata, 1976
De, Rathindranath	: The Sundarbans, 1990
Das, A. K , Mukherjee	: A focns on Sundarbans, 1981.

S. N., Chowdhury M. K.

Frazar, F. J. : The Golden Biugh [Papermac. Ed], 1967

Firth, Rayymind . Human Types, 1958

Hastings, J. [Ed.] : Encyclopeadia of Religion & Ethvcs, vol. 1-13, 1959-61

Leach. Maria [Ed.] : Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legend, vol - 1-2, 1949

Levi-Stauss, cloude : Structural Anthropology vol-1-2 1977. 1980.

Maronda, E. K. & P : Strucural Models in Folk lore & Tranformational Essays, 1978

Malinowaki, B : Magie, Science & Religion, 1948

Oman John Combell : Cults, Customs & Superstitions of India, First [Indian Reprient] 1972

O Mally, L. S. S. : Gazetter 24 parganas–1974

Pargiter, F. F. : Revenue History of Sundarban, 1989

Jhomson, G : Religion, 1950

Tylor, Edward Burnett : Religion in primitive Culture. 1959